শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-স্মারক গ্রন্থ

সাহিত্য-সমালোচনা

জিজ্ঞাসা

কলিকাতা ৯ ॥ কলিকাতা ২৯

SRIKUMAR BANDYOPADHYAY-SMARAK GRANTHA

SAHITYA SAMALOCHANA

প্রথম প্রকাশ : শ্রীশ্রীশিবচতুর্দশী তিথি
৮ ফাল্গুন, ১৩৪৪

প্রকাশক : শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড
জি জ্ঞা সা
১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ২৯
১এ ও ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর : শ্রীসুনীলকৃষ্ণ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পুণ্যস্মৃতিতে—

সূচীপত্র

প্রকাশকের নিবেদন

বঙ্গীয় শিক্ষাজগতে এবং বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সুখ্যাত ও সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে শ্রীকুমার-অনুরাগী সাহিত্যসেবীদের বাসনা হয় যে একটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ-সংগ্রহের প্রকাশনার ব্যবস্থা করা হউক। তদনুযায়ী বর্তমান গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পরিকল্পিত ও প্রস্তুত হয়।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন সাহিত্যপ্রাণ ব্যক্তি। ইংরাজি ও বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে বিগত অর্ধ শতাব্দীর ছাত্রসমাজে তিনি একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের ধারায় তাঁহার দান নিঃসন্দেহে মৌলিক ও অমূল্য, বস্তুতঃ তাঁহার সমালোচনা-রীতি বঙ্গ সাহিত্যে নূতন স্বাদ আনিয়া দিয়াছে। য়ুরোপীয় ও ভারতীয় সাহিত্যে তিনি ছিলেন সুপারঙ্গম, যথার্থ রসজ্ঞ। সাহিত্য-সমালোচনার বিভিন্ন দিকের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এবং সাহিত্যসমালোচনায় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণে রাখিয়াই বর্তমান গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থখানিতে সাতটি প্রবন্ধ আছে—একটি সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল্যায়ন-সম্পর্কিত, বাকি ছয়টি য়ুরোপীয় ও ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বমূলক।

গ্রন্থখানির প্রকাশক হিসাবে আমরা শ্রীকুমার-স্মৃতিতর্পণের আয়োজনে অংশ গ্রহণের সুযোগ পাইয়া কৃতার্থ বোধ করিতেছি।

এই গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে আমরা নানাজনের নিকট ঋণী। যাঁহার অকৃপণ সহায়তা ব্যতিরেকে গ্রন্থখানি কোনক্রমেই বর্তমান রূপে প্রকাশিত হইতে পারিত না, তিনি হইতেছেন ডক্টর শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়। তাঁহাকে আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করি। এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি-প্রণয়নে ও অন্যান্য ব্যাপারে শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শ্রীপ্রতিভাকান্ত মৈত্র, অধ্যাপিকা শ্রীমতী সতী চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যান্য সুধী ব্যক্তি সহায়তা করিয়াছেন—সকলকেই আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বিনীত

শ্রীশকুমার কুণ্ড

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-স্মারক গ্রন্থ

সা হি ত্য - স মা লো চ না

সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

পাশ্চাত্য চিন্তাধারার উপর Aristotle-এর মৌলিক প্রভাব লক্ষ্য করিয়া Dante তাঁহাকে 'the master of those who know' অর্থাৎ বিদ্বৎকুলের পরমগুরু বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। Dante-র ভাষার অনুসরণ করিয়া যদি আমরা স্বর্গত অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে আধুনিক কালে বঙ্গদেশে সাহিত্যালোচনার পরম-গুরু বলিয়া অভিহিত করি, তবে সম্ভবতঃ ভুল হইবে না। বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তনে তিনি চল্লিশ বৎসরেরও অধিক কাল অধ্যাপনা করিয়াছেন, এবং প্রবন্ধ, গ্রন্থ, ও বক্তৃতার মাধ্যমে ইংরাজী ও বাংলা সাহিত্যের সমালোচনা করিয়াছেন। ছাত্র ও শ্রোতা সকলেই তাঁহার সমালোচনার মধ্যে এক অতুলনীয় প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছেন। এই প্রতিভা শুধু নবনবোন্মেষশালিনী প্রজ্ঞা নহে, সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে ইহা কেবল নব দিগন্তের সন্ধানই দেয় না। তীব্র রসানুভূতির সহিত সূক্ষ্ম বিচারশক্তির, মর্মগ্রাহিতার সহিত মননশীলতার, ভাবোল্লাসের সহিত স্থির বুদ্ধির যে অসামান্য সহযোগ তাঁহার সমালোচনায় দেখা যায়, তাহা মনস্বিতার শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। 'মনে হয় কি একটি শেষ কথা আছে / সেইটি হইলে বলা সব বলা হয়'—প্রত্যেকটি আলোচ্য বিষয়ে তিনি যেন সেই শেষ কথাটাই বলিয়া গিয়াছেন। সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি করিয়া নির্ভুল বিচারের শক্তিতে তিনি, অন্ততঃ বঙ্গদেশে, অতুলনীয়।

দুই

সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে প্রথমে তাঁহার মানসিক বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা প্রয়োজন। তাঁহার মানসিকতার মধ্যে সাধারণতার সহিত অসাধারণতার এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল। তাঁহার জীবনযাত্রায়, ব্যক্তিগত ব্যবহারে ও আলাপে, কিম্বা তাঁহার আকৃতি ও প্রকৃতিতে অসাধারণতার কোন চিহ্ন ছিল বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে মনে হইত না। সর্বস্তরের লোকের সহিত তিনি অবাধে মিশিতে পারিতেন এবং সমানভাবে তাহাদের সহিত সকল বিষয়ে, এমন কি তাহাদের নিজ নিজ পরিধিগত বিষয়েও, আলাপ আলোচনা এবং তর্কও করিতে পারিতেন। শ্রেণীগত সংস্কার বা মর্যাদাবোধ তাঁহার চারিদিকে কোন বেষ্টনী রচনা করিয়া রাখিত না। অথচ, তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও মানসিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রত্যেকের

কাছে এবং সর্বক্ষেত্রে প্রতিপন্ন হইত। Burke সম্বন্ধে Dr. Johnson বলিয়াছিলেন যে Burke-এর অপরিচিত কোন ব্যক্তি যদি বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষার জন্য কোন তোরণের নীচে আশ্রয় লইতে গিয়া স্বল্পক্ষণের জন্য Burke-এর সঙ্গে আলাপ করে তবে অবিলম্বে Burke-এর মানসিক শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় পাইয়া সে বিস্মিত হইবে। এই উক্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে Coleridge বলিয়াছেন যে Burke নিশ্চয়ই তখন কোন দুরূহ তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন না। সম্ভবতঃ বিষয়টা হইত অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু Burke-এর আলাপের মধ্যে নিশ্চয় এমন একটা সুসঙ্গতি ও দূরদর্শিতার পরিচয় থাকিত যাহাতে তাঁহার মানসিক উৎকর্ষ অবিলম্বে প্রতীত হইত। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্বন্ধেও সে কথা বলা যায়। সাধারণ কথাবার্তায় অনাবশ্যক ও অপ্রাসঙ্গিক তাত্ত্বিকতা তিনি সম্পূর্ণ পরিহার করিয়া চলিলেও তুচ্ছ বা গুরুতর প্রত্যেকটি বিষয়ে তাঁহার সাময়িক মন্তব্যে সুস্পষ্ট ও ব্যাপক দৃষ্টির এবং মানসিক তৎপরতার পরিচয় থাকিত। উত্তর-প্রত্যুত্তরের মাধ্যমে প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই তিনি নূতন আলোকপাত করিতেন, পরিহাসবিজল্পিত হওয়াতে তাঁহার তীক্ষ্ণ মন্তব্যও স্বাদিষ্ঠ হইত। সামান্য আলাপেও তাঁহার অসামান্য ধীশক্তির পরিচয় থাকিত। সীমার মধ্যে অসীমের উপলব্ধির কথা অনেক কবি ও দার্শনিক বলিয়াছেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত যাঁহারা কখনও কোন সাধারণ বিষয়েও আলাপ করিয়াছেন, তাঁহারা সামান্যের মধ্যে অসামান্যের পরিচয় পাইয়াছেন।

তাঁহার এই মানসিকতার পরিচয় তাঁহার সাহিত্য-সমালোচনাতেও পাওয়া যায়। শ্রেষ্ঠ সমালোচকের গুণাবলী—স্বভাবসিদ্ধ রসগ্রাহিতা, অন্তর্দৃষ্টি, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের উপযোগী প্রতিভা, অভ্রান্ত বিচারশক্তি, রসানুভবকে বুদ্ধিগ্রাহ্য করিয়া তাহার সাধারণীকরণের ক্ষমতা ইত্যাদি সমস্তই তাঁহার ছিল। কিন্তু ইহার সহিত সর্বজনিক বোধের যে সমন্বয় ও সমীকরণ তাঁহার চিন্তায় ও সমালোচনায় দেখা যায় তাহাই অসাধারণ। প্রতিভার সহিত ব্যবহারিক জীবনে অযোগ্যতা ও অসাংসারিকতার সম্পর্ক আবশ্যিক—এই ধারণা শুধু তাঁহার জীবন ও চরিত্রে নহে, তাঁহার সমালোচনাতেও খণ্ডিত হইয়াছে। বস্তুতঃ সাধারণ বোধের সহিত অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টির সমন্বয়ই তাঁহার সমালোচনার বিশিষ্ট লক্ষণ।

তিন

সমালোচক হিসাবে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কোনও বিশিষ্ট মতবাদের অনুসরণ করিতেন বলিয়া মনে হয় না। য়ুরোপীয় ও ভারতীয় সাহিত্যশাস্ত্রে তাঁহার

গভীর জ্ঞান ছিল, কিন্তু সাহিত্যশাস্ত্রীর ও সমালোচকের ভূমিকা এক বলিয়া তিনি মনে করিতেন না। 'পণ্ডিতের লেখা সমালোচনার তত্ত্ব' সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে বিশেষ প্রভাবিত করিয়াছিল এইরূপ ধারণার কোনও সঙ্গত কারণ নাই।

'সৌন্দর্য্য কাহাকে বলে—আছে কী কী বীজ
কবিত্বকলায় ; শেলী, গেটে, কোল্‌রীজ
কার কোন্ শ্রেণী'

—ইত্যাদি জল্পনা সমালোচন-কর্মের পক্ষে অত্যাবশ্যক বা বিশেষ সহায়ক বলিয়া তিনি মনে করিতেন না। এই জন্য শাস্ত্রনিষ্ঠ সাহিত্যাচার্যগণ তাঁহার সমালোচনার নানা গুণ সত্ত্বেও তাঁহাকে শৌখীন (amateur) সমালোচক বলিয়া যদি অভিহিত করেন তবে হয়ত বিশেষ আপত্তির কারণ নাই। শুধু এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে কোন কোন শৌখীন অভিনেতা পেশাদার অভিনেতা অপেক্ষা পারদর্শী, এবং Chatham-এর ন্যায় অপেশাদার রণমন্ত্রী পেশাদার সেনাপতি অপেক্ষা কৌশলী।

সমালোচক হিসাবে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্ভবতঃ মনে করিতেন যে ধর্মে যেমন 'যত মত তত পথ' এবং আসলে যথার্থ ধর্মের সহিত কোন বিশেষ মত বা পথের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক নাই, তেমনি সাহিত্যক্ষেত্রে 'যত পথ তত মত'—যত রকম রীতি, তত রকম মতবাদ। সমালোচকের কর্তব্য বিশেষ কোনও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে পাঠকের রসবোধ উদ্দীপ্ত করা, কোনও মতের দৃষ্টিকোণ হইতে তাহার মূল্যায়ন নহে। সাহিত্যের প্রত্যেকটি সৃষ্টিই একদিক দিয়া অদ্বিতীয়, প্রত্যেকটির প্রেরণা ও শিল্পরীতি অনুপম। সুতরাং কোনও ধ্রুব মান অনুসারে তাহার সুপরিচয় দেওয়া যায় না।

এই প্রসঙ্গে সাহিত্যশাস্ত্রের উপযোগিতা সম্বন্ধে দুই একটা প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইতে পারে। য়ুরোপে সাহিত্যশাস্ত্রের জনক Aristotle। তিনি ছিলেন মুখ্যতঃ বৈজ্ঞানিক ; জীববিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি নানাবিষয়ে তিনি পথিকৃৎ। তিনি সাহিত্যকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়া দেখিয়াই তাহার সূত্র নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই জাতীয় আলোচনার ফলে সাহিত্যের দেহ বা বহিরঙ্গ সম্পর্কে অনেক নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হইলেও সাহিত্যের আত্মা সম্পর্কে কোন উপলব্ধি হয় কিনা সন্দেহের বিষয়। Aristotle যে সমস্ত সাহিত্যকর্মের সহিত পরিচিত ছিলেন, তাহারই অবলম্বনে আরোহী পদ্ধতিতে কয়েকটি সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করেন, কিন্তু তাঁহার সূত্র উপেক্ষা করিয়াও অনেকে সাহিত্যিক কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন। বস্তুতঃ রসবোধের সহিত বৈজ্ঞানিক বিচারের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ নাই। গীতিধর্মী (Lyric) কাব্যের

রস Aristotle-এর সূত্রে ধরা পড়ে না। Shakespeare-এর 'Take, O, take those lips away' অথবা রবীন্দ্রনাথের 'বহু যুগের ওপার হতে আষাঢ় এল' ইত্যাদি কেন আমাদের অন্তরাত্মার গভীরে সাড়া জাগায়, তাহা Aristotle-এর কোন যুক্তি দিয়া প্রমাণ করা যায় না। Dr. Johnson তথাকথিত neo-classic মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু তিনিও বলিয়াছেন, '...every new genius produces some innovation, which when invented and approved, subverts the rules which the practice of the foregoing authors had established'। যখনই তিনি সাহিত্যিক মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত না হইয়া নিজস্ব উপলব্ধির কথা বলিয়াছেন তখনই তাঁহার সমালোচনা উচ্চতর গ্রামে উন্নীত হইয়াছে। Shakespeare-এর Macbeth আলোচনা করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন, 'He that peruses Shakespeare looks round alarmed and starts to find himself alone'। ইহাতে সাহিত্যশাস্ত্রের বা কোনও মতবাদের প্রভাব নাই, তাঁহার রসানুভূতি এখানে সার্থক ভাষায় প্রকট হইয়াছে।

চার [ক]

অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রোম্যান্টিক গোষ্ঠীর সমালোচক ছিলেন—এই প্রচলিত ধারণা মোটামুটি সত্য হইলেও সর্বাংশে সত্য নহে। রোম্যান্টিক সমালোচকদের ন্যায় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও কোন বাহ্য মানদণ্ডে কাব্যের বিচার করিতেন না। বাহির হইতে দেখিলে যেমন কবিকে বুঝিতে পারা যায় না, তেমনই বহিরঙ্গ দেখিয়া কাব্যের রস গ্রহণ করা যায় না। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রীতির উৎকর্ষ, শ্রেণীগত লক্ষণ ও গুণ, এমন কি কাব্যের কোন চরম আদর্শ অনুসারে কাব্যবিচার করিতেন না। কাব্যের অবয়বের মধ্যে তাহার আত্মা অনুস্যূত রহিয়াছে—ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন এবং সেই কাব্যাত্মারই অনুসন্ধান করিতেন। আপাতদৃষ্টিতে আলোচ্য কাব্যের যে যে লক্ষণ পরস্পর বিরোধী বলিয়া মনে হয় তাহা যে এক বৃহৎ ঐক্যেরই অংশীভূত ইহাও তিনি অনুভব করিতেন।

রোম্যান্টিক সমালোচনার এই সমস্ত সাধারণ নীতি তিনি গ্রহণ করিলেও এই জাতীয় সমালোচনার ভিত্তিস্থানীয় কোনও দার্শনিক মত তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। তিনটি মতের এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথম মতে, কবির সৃষ্টি কাব্যাতিরিক্ত এক ঐশ্বরিক চেতনা ও শক্তির শিল্পায়িত প্রকাশ। দ্বিতীয় মতে, ঊর্ণনাভের মত কবি 'অন্তর হ'তে আহরি বচন' একটা অলৌকিক 'আনন্দলোক'

বিরচন করেন। তৃতীয় মতে, কবি 'ঝর্ঝর সংগীতে' মুখর 'অতিদুর্গম সৃষ্টিশিখর' হইতে তাঁহার গীতিধারা টানিয়া লন। এই সমস্ত সাহিত্যবাদের কোনটির সহিত সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পূর্ণ মতৈক্য ছিল না বলিয়াই মনে হয়। কারণ, প্রথমতঃ, তিনি কাব্যের রসগ্রাহী ছিলেন, কাব্যের দার্শনিক তত্ত্বের জিজ্ঞাসু ছিলেন না। দ্বিতীয়তঃ, এই সমস্ত দার্শনিক মতে কাব্যের দেহ ও আত্মার মধ্যে যে পার্থক্য সূচিত হইয়াছে সে পার্থক্যে তিনি সম্ভবতঃ বিশ্বাস করিতেন না। সম্ভবতঃ তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে কাব্য একটা অখণ্ড সৃষ্টি ; রসাত্মক বাক্যই কাব্য, কিন্তু রস বাক্যের বহির্ভূত কোন সত্তা নহে। 'শব্দসমর্পমান' না হওয়া পর্যন্ত রসের অর্থাৎ কাব্যের আত্মার কোন অস্তিত্ব নাই। কাব্যের উপাদান সমূহের বিশেষ কোন প্রকার পারস্পরিক সংযোগের ফলেই রসনিস্পত্তি হয়। সেই সংযোগের সহিত রাসায়নিক সংযোগের তুলনা করা যায়। কাব্যের রস একটা আবির্ভাব নহে, ইহা একটা স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি। যদি কোন একটা দার্শনিক নাম দিতেই হয়, তবে এই ধরনের মতকে সাহিত্যিক সর্বেশ্বরবাদ (pantheism) বলা যাইতে পারে। বোধ হয় কাব্যের আত্মা না বলিয়া কাব্যের প্রাণ বলিলেই শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপলব্ধি সুস্পষ্টভাবে সূচিত হয়। কাব্যের 'অন্তঃপ্রকৃতি, মূলগত ভাবপ্রেরণা ও কাব্যাভিপ্রায়' সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না হইলে এই প্রাণশক্তি উপলব্ধ হয় না। প্রত্যেক কাব্যের একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে, এবং তাহার 'শিরায় শিরায় যে প্রাণ-তরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়' তাহারই পরিচয় তিনি সমালোচনার মাধ্যমে দিয়াছেন।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমালোচনায় যে সাহিত্যবাদের ইঙ্গিত রহিয়াছে তাহার সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদের সামঞ্জস্য আছে কিনা এবং থাকিলেও কতটা আছে তাহা বিবেচ্য। 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে জগৎ ব্রহ্মেরই শক্তি। উভয়ের ভেদ বা অভেদ কোনটিই অস্বীকার করা যায় না, অথচ পরস্পরবিরোধী উভয়ের যুগপৎ অবস্থান কোনও যুক্তিতর্ক দ্বারা প্রমাণ করা যায় না। এইজন্য এই সম্বন্ধটিকে অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ বলা হয়।' 'জগৎ' শব্দের বদলে 'কাব্যের দেহ' ও 'ব্রহ্ম' শব্দের বদলে 'কাব্যের আত্মা'—এই দুইটি পদ প্রয়োগ করিলেই পূর্বোল্লিখিত সামঞ্জস্য-প্রতীত হইবে।

[খ]

ইংরাজ রোম্যান্টিক গোষ্ঠীর বিখ্যাত সমালোচকদের মধ্যে সমালোচনার পদ্ধতি ও ফলশ্রুতির দিক দিয়া কিছু কিছু অনৈক্য আছে। ইঁহাদের মধ্যে Coleridge অনেক হিসাবে শ্রেষ্ঠ। সূক্ষ্ম সাহিত্যবোধ ছাড়াও তাঁহার মধ্যে সমালোচকোচিত

দুইটি প্রধান গুণের সমাবেশ দেখা যায়। প্রথমতঃ, কাব্যের সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে তাঁহার নিজস্ব উপলব্ধি ; দ্বিতীয়তঃ, সেই রহস্যের অনুধাবনের ফলে সাহিত্যতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার দার্শনিক উপপত্তি। তাঁহার মতে 'The ultimate end of criticism is much more to establish the principles of writing, than to furnish rules how to pass judgement on what has been written by others.' তাঁহার ও অনুগামী রোম্যান্টিক সমালোচকগণের মতে Imagination বা সঞ্জীবনী কল্পনাই প্রজাপতির ন্যায় কাব্য সৃষ্টি করে ; সহায়ক বৃত্তি Fancy বা অলঙ্করণী কল্পনার সহিত ইহার মৌলিক পার্থক্য আছে।

মনস্তত্ত্ব ও দর্শনের বিচারে Coleridge-এর এই মতের মূল্য যাহাই হউক না কেন, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় Coleridge-এর কাব্যের অনুরক্ত হইলেও এই মতবাদ বা দৃষ্টি গ্রহণ করেন নাই। সাহিত্যকর্মের বিচারের জন্য সূত্র নির্ধারণ বা সাহিত্যতত্ত্ব নিরূপণ—কোনটাই তাঁহার সমালোচনার লক্ষ্য ছিল না। Imagination কিংবা Fancy আসলে কি এবং সাহিত্যসৃষ্টিতে তাহার ক্রিয়া কি—এ সমস্ত প্রশ্নের তাত্ত্বিক বিচারে তিনি প্রবৃত্ত হন নাই।

Coleridge-এর বিখ্যাত সমসাময়িক Lamb-এর ন্যায় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রসান্বেষী সমালোচক হইলেও তাঁহার সহিত Lamb-এর পার্থক্য আছে। Lamb ছিলেন যাহাকে বলে 'Impressionist'। কাব্যাস্বাদনের ফলে তাঁহার মনে যে প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ যে রসানুভূতির সঞ্চার হইত তাহাই অভিব্যক্ত হইত তাঁহার সমালোচনায়। কাব্যের বস্তুর ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ, সামগ্রিকভাবে তাহার বিচার বা স্বরূপ-নির্ধারণের প্রয়াস এই জাতীয় সমালোচনায় তেমন পরিলক্ষিত হয় না। Lamb-এর রসানুভূতির মূলে ছিল তাঁহার অসাধারণ সহৃদয়তা ও উদারতা, নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও তাঁহার নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভা। সেই কারণে সমালোচনা-ক্ষেত্রে তিনি অনেক সময়ে নব নব অনুভবের সন্ধান দিতে পারিতেন। King Lear এবং Restoration Comedy সম্পর্কে তাঁহার সমালোচনায় তাঁহার এই প্রবণতা প্রকট হইয়াছে, এবং এই প্রবণতা রোম্যান্টিক মানসের অন্যতম নিদর্শন। কিন্তু Lamb-এর সমালোচনায় রসোদ্রেক হইলেও তাহা অনেক সময়েই কাব্যের বস্তুকে অতিক্রম করিয়া যায়, তাহার কোন কোন দিক উপেক্ষা করে, এবং পাঠকের কাব্যজিজ্ঞাসাকে বিভ্রান্ত করে।

[গ]

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমালোচনা রোম্যান্টিক ভাবে ভাবিত হইলেও

তাহা পূর্বোল্লিখিত ত্রুটি হইতে মুক্ত। রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে যেমন দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী বলিয়া দুইটি প্রান্তিক দল আছে, তেমনই সমালোচনার ক্ষেত্রে 'ধ্রুপদী' ও 'খেয়ালী' —এই দুই প্রান্তিক গোষ্ঠী আছে বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এই দুইটি গোষ্ঠীকে মোটামুটিভাবে Classicist ও Romanticist বলা হইয়া থাকে, যদিও এই দুইটি সংজ্ঞা খুব সুনির্দিষ্ট নহে। চরম রোম্যান্টিক সাহিত্যিক ও সমালোচকগণের প্রেরণার মূল উৎস 'খেয়াল' অর্থাৎ তাঁহাদের স্বচ্ছন্দ রুচি ও প্রবণতা, Classicist-এর ন্যায় তাঁহাদের সাহিত্যকর্ম কোনও ধ্রুব আদর্শ বা নীতির দ্বারা নিয়মিত নহে। খেয়ালী সমালোচকবৃন্দের মধ্যে Hazlitt উল্লেখযোগ্য। তাঁহার রসবোধের মধ্যে তীক্ষ্ণতা থাকিলেও তাহার পরিধি ছিল অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ। তাঁহার ব্যক্তিগত রুচি দ্বারাই তাহা নিয়ন্ত্রিত হইত, এবং তাঁহার সমালোচনার মধ্যে যে পরিমাণে তাঁহার সহৃদয়তা ও রসোল্লাসের পরিচয় থাকিত, সে পরিমাণে বিচারশক্তির ধীরতার ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় থাকিত না।

রাষ্ট্রচিন্তার ন্যায় সমালোচনার ক্ষেত্রেও centrist বা মধ্যস্থের স্থান আছে। প্রান্তিকতার একদেশদর্শিতা হইতে তিনি মুক্ত ; অথচ উভয় প্রান্তিক গোষ্ঠীর গুণাবলী সম্পর্কে তিনি সচেতন। আপোসে নিষ্পত্তির স্পৃহা নহে, উচ্চতর গ্রাম হইতে বিষয়ের নিরীক্ষণ হইতেই এই মীমাংসার উদ্ভব। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমালোচনায় এই মীমাংসা সম্ভব হইয়াছিল কয়েকটি কারণে।

প্রথমতঃ, তিনি ছিলেন একান্ত বস্তুনিষ্ঠ। কাব্যের বস্তুকে তিনি কখনও লঙ্ঘন করেন নাই, কিংবা তাহার কোন অংশ বা কোন দিক্ তিনি উপেক্ষা করেন নাই। কাব্যবস্তুর পরিধি ও তাঁহার সমালোচনার ভিত্তি সমপ্রস্থ।

দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার রসবোধের সহিত সাধারণ বা সর্বজনিক অনুভবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। 'সাধারণীকৃতিঃ' যদি কাব্যের উদ্দিষ্ট হয়, তবে সহৃদয় সাধারণের চিত্তে সেই কৃতির যে আবেদন তাহাই শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনার আলম্বন। স্বকীয় উপলব্ধি তাঁহার সমালোচনার ভিত্তি হইলেও তিনি যাহাকে বলে impressionist বা স্বানুভববিহারী সমালোচক তাহা ছিলেন না। এই কারণেই Lamb, Hazlitt প্রভৃতি রোম্যান্টিক সমালোচকের ত্রুটি তাঁহার সমালোচনায় দেখা যায় না। 'চকিত অভাবনীয়ের' দীপ্তি তাঁহার সমালোচনায় নাই, আছে পরিস্ফুট দর্শনের ঔজ্জ্বল্য। যাহা সাধারণের মনোমুকুরে প্রতিফলিত হইয়াও অস্ফুট থাকিয়া যায়, যাহা অতি ক্ষীণভাবে সাধারণের হৃদয়ে অনুরণিত হইয়াও অব্যক্ত থাকিয়া যায়, তাহাই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমালোচনায় ব্যক্ত ও রূপায়িত হয়।

পাঠকের ধারণা হয়, যে-কথা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন তাহা 'আমারো ছিল মনে'; বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কি ভাবে যেন তাহা জানিতে পারিয়া তাহাকে সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। আমাদের উপলব্ধির 'জীবনে যা চিরদিন রয়ে গেছে আভাসে', বুদ্ধির 'আলোকে যা ফোটে নাই প্রকাশে', তাহাই তিনি 'কথা' দ্বারা 'শেষ করিয়া' বাঁধিয়াছেন।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমালোচনার এতদ্ভিন্ন আরও বিশিষ্ট গুণ আছে। তাঁহার দৃষ্টি সামগ্রিক। তাঁহার সমালোচনায় কেবল যে সামগ্রিকভাবে অখণ্ড কাব্যসত্তার উপলব্ধির পরিচয় আছে তাহা নহে; সেই সমালোচনা মানবসত্তা ও মানবজীবন সম্বন্ধে একটা সামগ্রিক উপলব্ধির অংশীভূত। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিচ্ছিন্নভাবে খণ্ড খণ্ড কাব্যের ও বিশেষ বিশেষ লেখকের সাহিত্যপ্রতিভার বিচার করিয়াছেন বলিয়া আপাততঃ মনে হইলেও সেই বিচার যে তাঁহার 'সামগ্রিক জীবনবোধ'-এর অংশীভূত সে প্রতীতি সহজেই হয়। সাহিত্যশাস্ত্র নহে, সাহিত্যের মূলীভূত জীবন-দর্শনই তাঁহার সমালোচনার ভিত্তি। এইখানেই তাঁহার সহিত অনেক খ্যাতনামা রোম্যাণ্টিক সমালোচকের পার্থক্য। তিনি 'খেয়ালী' সমালোচক নহেন।

বস্তুতঃ রোম্যাণ্টিক হইলেও আত্মকেন্দ্রিকতার দোষ হইতে তিনি মুক্ত। তীব্র সংবেদনশীলতার সহিত তীক্ষ্ণ মননশীলতার সমাহারের জন্যই তাঁহার পক্ষে রোম্যাণ্টিক উৎকেন্দ্রিকতা পরিহার করা সম্ভব হইয়াছে। মননের সাধক—বুদ্ধি—নৈর্ব্যক্তিক ও সর্বজনীন। রসানুভূতিকে বুদ্ধিগ্রাহ্য ও যুক্তিসম্মত করিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সমালোচনাকে রোম্যাণ্টিকতার উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই কারণেই তাঁহার সমালোচনায় একটা সুস্থ স্থিরমস্তিষ্কতার ও অভ্রান্ত বিচারক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। রসানুভবের উন্মাদনায় তিনি কখনও কক্ষচ্যুত হন নাই বা দৃষ্টিসাম্য হারাইয়া ফেলেন নাই। এই হিসাবে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমালোচনায় romanticist ও classicist উভয় শ্রেণীর সমালোচকের একটা অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে। ধীরললিত নহে, ধীরোদাত্ত শ্রেণীরই তিনি সমালোচক।

পাঁচ [ক]

আধুনিক কালে যাঁহারা চিরপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যের নব মূল্যায়ন করিতেছেন, তাঁহাদের অনেকেই কয়েকটি অতি-আধুনিক সামাজিক ও সাহিত্যিক মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যের নানা ত্রুটি ও ভান সন্ধানে রত আছেন। সূর্য ও চন্দ্রের কলঙ্ক আবিষ্কারই ইঁহাদের ব্রত। ইঁহাদিগকে অনেক সময় disintegrator বা

সাহিত্যিক কালাপাহাড় বলা হয়। বিশেষ কোন সাহিত্যকর্মে কি নাই—ইহা বিচারের ভিত্তি হইতে পারে না, কি আছে তাহাই বিবেচ্য—সমালোচনার এই মূলসূত্র ইঁহারা অনুধাবন করেন কিনা সন্দেহ। বস্তুতঃ পূর্বকালে যে judicial বা বিধানগত সমালোচনা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, ইহা তাহারই নব্য সংস্করণ। প্রত্যেকটি সাহিত্যকর্ম যে একটা বিশিষ্ট প্রেরণা ও উপলব্ধির মূর্তরূপ এবং একটা বিশিষ্ট রীতি যে সেই রূপায়ণের মধ্যে পরিস্ফুট হয়,—এই তত্ত্বটি রোম্যাণ্টিক যুগ হইতে স্বীকৃত হইলেও ইঁহারা বিস্মৃত হইয়াছেন। সহৃদয়তার অপ্রতুলতা, সংস্কারবশতা ও একজাতীয় সাহিত্যিক তিমিরান্ধতা ইঁহাদের তথাকথিত বিপ্লবী সিদ্ধান্তের কারক।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই শ্রেণীর সমালোচনার প্রতি একান্ত বিমুখ ছিলেন। এই গোষ্ঠীর একজন সুপরিচিত সমালোচকের একটি গ্রন্থের তিন পৃষ্ঠা পড়িয়া তিনি এত বিরক্ত হইয়াছিলেন যে আর তিনি সে গ্রন্থপাঠে অগ্রসর হন নাই। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি-ই ছিল অন্যরূপ। উলট্‌-পুরাণ লিখিয়া তিনি চমক সৃষ্টি করিতেন না। সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে নানা লোক-স্বীকৃত ধারণার মধ্যে অসঙ্গতি পরিহার করিয়া সকল-হৃদয়সংবাদী অনুভবকে উদার সহৃদয়তা ও যুক্তির সাহায্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং অসামান্য অন্তর্দৃষ্টির বলে আলোচ্য সাহিত্যকর্মের প্রাণধর্ম আবিষ্কার ও তাহার রসস্বরূপ ব্যক্ত করা, এবং সামগ্রিক দৃষ্টি দিয়া তাহার মূল্যায়ন ও মানবজীবনের সহিত তাহার সংযোগ প্রদর্শন করা—ইহাই ছিল সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্ম।

[খ]

এই প্রসঙ্গে তাঁহার সমালোচনা সম্পর্কে আর একটি বিষয়ের অবতারণা করা যাইতে পারে। তাঁহার তরুণ বয়সে কোন্ কোন্ সমালোচক তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা আলোচনার বিষয়। মনে রাখিতে হইবে যে সর্বক্ষেত্রেই মৌলিক প্রতিভা বিকাশের সময় স্বকীয় প্রবণতার অনুসরণে নানা প্রভাব স্বাঙ্গীভূত করে।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শেষজীবনে নিষ্ঠার সহিত ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্র চর্চা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সমালোচন-প্রতিভার উন্মেষে কোনও আলঙ্কারিক মতবাদ সহায়তা করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। রোম্যাণ্টিক সমালোচকগণের তিনি সমগোত্রীয়, তাঁহাদের সমালোচনপদ্ধতির সহিত তিনি বাল্যাবধি সুপরিচিত ছিলেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য প্রভাবও সম্ভবতঃ ছিল। তিনি অধ্যাপক Percival-এর অনুরক্ত ছিলেন, সম্ভবতঃ তাঁহারই প্রভাবে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কাব্যজিজ্ঞাসায় প্রত্যেকটি শব্দের গূঢ় তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনার গুরুত্ব প্রণিধান-পূর্বক বিচার করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু আর একজন বিখ্যাত ইংরাজ সমালোচক Dr. Johnson-ও

বোধ হয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমালোচনার উপর অল্পাধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। Dr. Johnson সম্বন্ধে আজকাল অনেকের ধারণা প্রতিকূল। Dr. Johnson-এর সাহিত্যচিন্তার মধ্যে দোষত্রুটি থাকিলেও এবং তাঁহার সাহিত্যিক আদর্শ বর্তমান যুগোপযোগী না হইলেও তাঁহার যে যথার্থ রসবোধ ও সূক্ষ্ম সাহিত্যদৃষ্টি ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সাহিত্যিক মতবাদ উপেক্ষা করিয়া যখন তিনি কাব্যবিচার করিতেন, তখন তাঁহার সমালোচনায় সংস্কারমুক্ত রসগ্রাহিতার সহিত যে তীক্ষ্ণ বোধ ও বিচক্ষণতার সমন্বয় ঘটিত তাহারই অনুবৃত্তি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমালোচনায় দেখা যায়। এই সব ক্ষেত্রে সাহিত্যবিচার তীব্র সংবেদনশীল মানসিকতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া। দ্বিতীয়তঃ, যে ভাবে মাঝে মাঝে Dr. Johnson বিশেষ কোন দৃষ্টান্তের আলোচনা করিতে করিতে সহসা প্রতিভা-বলে সাহিত্যের একটি সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করিতেন, যুক্তিবিজ্ঞানের আরোহ পদ্ধতির সর্বথা অনুসরণ না করিয়াও বিশেষ হইতে সামান্যের নভোন্তরে আরোহণ করিতেন, তাহাও বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমালোচনায় দেখা যায়। 'That cannot be unpoetical with which all are pleased'—ইহা Dr. Johnson ও বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উভয়েরই অভিমত। একটা classicist অন্তর্ধারা শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমালোচনায় যে ছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

ছয় [ক]

রোম্যান্টিক-পন্থী সমালোচক হইলেও রোম্যান্টিক চিন্তাধারার অন্যতম চরম মতবাদ—Art for art's sake অর্থাৎ কলা-কৈবল্য-বাদে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আস্থা ছিল না। ইংলণ্ডে এই মতবাদ প্রচারের সহিত যাঁহার নাম বিশেষ রূপে জড়িত সেই Walter Pater-এর সমালোচনশক্তির গুণগ্রাহী হইলেও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় Pater-এর রুচিনিষ্ঠ স্বানন্দ-বাদ সমর্থন করেন নাই। 'Art comes to you, proposing frankly to give nothing but the highest quality to your moments as they pass, and simply for those moments' sake'—এই দৃষ্টির সহিত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দৃষ্টির মৌলিক বিভেদ ছিল। তাঁহার মতে সাহিত্যকর্ম জীবনধর্মেরই অন্যতম প্রকাশ, উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিলে তাহা উভয়ের পক্ষে ক্ষতিকর। জীবনধারা হইতে প্রাণরস সতত আহরণ না করিলে সাহিত্য মৃৎপাত্রে সযত্নরোপিত লতার ন্যায় ক্ষীণ ও স্বল্পপ্রসূ হইয়া থাকে। যে রোম্যান্টিক বৃত্তি কেবল প্রগাঢ় স্বানন্দানুভবের সন্ধান করে,

তাহা স্পর্শকাতর চারুতা-বিলাস মাত্র ; সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় যে এই চারুতা-বিলাস সাহিত্যক্ষেত্রে ক্রমিক অধঃপতনের পূর্বরঙ্গ। যাহারা জীবনের বৃহৎ সত্যকে ও চরম শিবকে উপেক্ষা করিয়া শুধু সুন্দরের পূজাই একমাত্র ধর্ম বলিয়া মনে করে তাহারা ধরণীতে 'স্বর্গ-খেলেনা' গড়িবার প্রয়াস করিয়া আপাতমধুর জীবন যাপন করিতে পারে, কিন্তু এই জীবনযাত্রা ব্যর্থতারই রূপভেদ মাত্র।

[খ]

এই প্রসঙ্গে Matthew Arnold-এর সাহিত্যবাদের সহিত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতের তুলনা করা যাইতে পারে। 'The end and aim of all literature is a criticism of life', 'Poetry is at bottom a criticism of life'—সাহিত্যের চরম উদ্দেশ্য জীবনের সমালোচনা, কাব্য মূলতঃ জীবনের সমালোচনা ইত্যাদি সূক্তি সাহিত্যশাস্ত্রের মূল সূত্র বলিয়া অনেকস্থলে পরিগৃহীত হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে জীবন ও সাহিত্যের ঘনিষ্ঠতা সম্বন্ধে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত Matthew Arnold-এর অনুবর্তী, কিন্তু প্রণিধানপূর্বক উভয়ের মত তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে উভয়ের মতের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ব্যবহারিক জীবনে রোম্যান্টিক প্রবণতার ফলে যে অসংযম, উৎকেন্দ্রিকতা, নীতিহীনতা ইত্যাদি দোষ দেখা দেয়, Arnold তাহার একান্ত বিরোধী ছিলেন। তাঁহার বাল্যশিক্ষা ও সংস্কারের প্রভাবই ছিল ইহার কারণ। এ বিষয়ে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও Arnold-এর সহিত সম্ভবতঃ একমত ছিলেন, কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনাদর্শের ভিত্তি ছিল সংস্কার নহে, দৃষ্টির প্রসার ও সুস্থ মানসিকতা। Arnold তাঁহার সঙ্কীর্ণ নীতিজ্ঞানের উপরই সাহিত্যবিচারের প্রতিষ্ঠা করিয়া যে সাহিত্যিক প্রমাদে পতিত হইয়াছিলেন, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহা পরিহার করিতে পারিয়াছিলেন। সাহিত্যের ধর্ম ও সাংসারিক ধর্ম এই উভয়ের সূত্র যে এক হইতে পারে না তাহা তিনি জানিতেন। ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' ও অবধূতের 'উদ্ধারণপুরের ঘাট' প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনাপ্রসঙ্গে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে উদার সাহিত্যবোধের পরিচয় দিয়াছেন তাহা Arnold-এর সাহিত্যদৃষ্টির পরিধি অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। Shelley সম্পর্কে Arnold-এর সুপরিচিত নির্ণয় হইতেই Arnold-এর সীমিত সাহিত্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। Arnold-এর মতে Shelley-র ত্রুটি দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, তাঁহার বিহার শূন্যমার্গে (void) ; Arnold-এর মতে সাহিত্যের বিষয় হইবে 'Truth' অর্থাৎ বাস্তব জীবনের সত্য। কিন্তু বাস্তবাতিরিক্ত অনেক অনুভব যে মানবিক, সুতরাং সাহিত্যিক, সত্য তাহা তিনি বুঝিতেন না। দ্বিতীয়তঃ,

Shelley-র কাব্য 'ineffectual', অর্থাৎ নীতি হিসাবে তাহা ব্যর্থ। Arnold-এর মতে উৎকৃষ্ট সাহিত্যের গুণ 'high seriousness' অর্থাৎ উচ্চ গ্রামের গাম্ভীর্য। এই মতবাদের অনুসরণ করার ফলে Arnold গীতিধর্মী কাব্যের ও Chaucer প্রভৃতি কবির রচনার রস গ্রহণ করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ Arnold-এর ত্রুটি ছিল যে তিনি স্বীয় সংস্কারের অনুবর্তন করিয়া পূর্বকল্পিত মানের তুলাদণ্ডে সাহিত্যের বিচার করিতেন। অতীতকালে ধর্ম যে ভাবে অন্তঃকরণে প্রজ্ঞার দীপ জ্বালাইয়া মানবের মনোবৃত্তি ও আচরণকে সুপথে পরিচালিত করিত, বর্তমানে সাহিত্যেরও তাহাই কর্তব্য। কিয়ৎ পরিমাণে সীমিত হইলেও সাহিত্যিক গুণ সম্পর্কে Arnold-এর বোধ যে তীক্ষ্ণ ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সাহিত্যের বিষয় (subject) ও সাংসারিক ফলশ্রুতিকে প্রাধান্য দিয়াই তিনি প্রমাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনায় এই সংকীর্ণতা দেখা যায় না।

সাত

Arnold-এর ন্যায় সাহিত্যরসিক ও বহুদর্শী সমালোচকের বিভ্রান্তি যে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিহার করিতে পারিয়াছিলেন তাহার অন্যতম প্রধান কারণ হইল সাহিত্যকর্মে যুগমানসের প্রভাব সম্বন্ধে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সচেতনতা। এই সচেতনতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁহার 'অষ্টাদশ শতকে আধুনিকতার পূর্বলক্ষণ' শীর্ষক সুচিন্তিত প্রবন্ধে। লোকশিক্ষা, লোকরঞ্জন বা অন্য কোনও সাধু উদ্দেশ্য লইয়া কোনও মহৎবিষয়ে ঐতিহ্যসম্মত বা মহাকবিদর্শিত রীতির অনুসরণ করিয়া কোনও যথার্থ সাহিত্যের সৃষ্টি হয় না। সাহিত্যসৃষ্টি 'Grand Style' ইত্যাদি কোনও কলাকৌশলের প্রয়োগমাত্র নহে, কাহারও নির্দেশক্রমে বা অনুকরণে ইহার নির্মাণ করা যায় না। Sophocles অবশ্যই মহৎসাহিত্যের স্রষ্টা ; তিনি 'saw life steadily and saw it whole'—ধীর দৃষ্টিতে সমগ্র মানবজীবনের সত্য দর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া Merope-র ন্যায় একটা যান্ত্রিক পদার্থ নির্মাণ করা যায়, কিন্তু তাহাতে প্রাণসঞ্চার করা যায় না। যথার্থ সাহিত্য মাত্রই রচয়িতার গূঢ় উপলব্ধির প্রকাশ। 'The Kingdom of God is within you'—রচয়িতার নিজস্ব উপলব্ধির সাগর মন্থনের ফলেই কাব্যের উদ্ভব হয়, তাহা কোনও আদর্শনিষ্ঠ কৌশলী শিল্পীর নির্মিতি নহে।

সাহিত্যিকের উপলব্ধির সহিত যুগমানসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। Sophocles-এর সামাজিক পরিবেশ ও যুগচেতনা আমাদের থাকিতে পারে না। যে মানসিকতা ও

অভিজ্ঞতার উপাদান হইতে তাঁহার নাটকের বস্তু অর্থাৎ বিচিত্র ভাব ও ভাষার বিশিষ্ট সমাহার সঙ্কলিত, তাহা Sophocles-এর নিজস্ব। আমাদের পক্ষে তাহার অনুকরণ 'পরের সোনা কানে দেওয়ার' মত ব্যর্থ ও করুণ প্রয়াস। তবে এই বস্তুগত বৈশিষ্ট্য কেবল সাহিত্যস্রষ্টার ব্যক্তিগত নিরপেক্ষ গুণাবলীর পরিচায়ক নহে, এবং সেই সমস্ত গুণের সমাবেশ কোনও আকস্মিক ব্যাপার নহে। বহুল পরিমাণে তাহা যুগমানসের বৃত্তির দ্বারা নির্দিষ্ট ও রূপায়িত হয়। এইজন্য সমকালীন লেখকদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গী ও রীতির যথেষ্ট ঐক্য লক্ষিত হয়। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ সমসাময়িক ছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে তাঁহাদের মধ্যে দুস্তর পার্থক্য থাকিলেও উভয়েই যুগমানসের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন, এবং অষ্টাদশ শতকের নবজাত চেতনা কি ভাবে বিভিন্ন রুচির এই দুই লেখকের রচনাকে প্রভাবিত করিয়াছিল, তাহা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে অতি নৈপুণ্য সহকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যথার্থ সাহিত্যকর্মের উপর যুগমানসের প্রভাব সম্পর্কে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সচেতন ছিলেন বলিয়া তিনি কখনও M. Arnold-এর উপদেশের অনুবর্তন করিয়া কোনও লেখককে প্রাচীন সাহিত্যের অনুসরণ করিতে বলেন নাই।

আট

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমালোচনপদ্ধতি তাঁহার শিক্ষণপদ্ধতিরই অনুরূপ; প্রায় অর্ধশতাব্দী-ব্যাপী অধ্যাপনার অভিজ্ঞতাই এই সাদৃশ্যের হেতু। স্বীকার করিতে হইবে যে এই কারণেই তাঁহার সমালোচনায় শিক্ষকসুলভ প্রবৃত্তি কিছু কিছু দেখা যায়। বিষয়ব্যাখ্যান, বস্তুবিশ্লেষণ, অতিকথন ইত্যাদি যে সমস্ত লক্ষণ তাঁহার সমালোচনায় দেখা যায় তাহা তাঁহার শিক্ষকজীবনের অভ্যাসের পরিচয় দেয়। অনেক সাহিত্যরসিক শ্রেষ্ঠ সমালোচনার আদর্শ বিবেচনা করিয়া এই সমস্ত লক্ষণকে ত্রুটি মনে করেন। কারণ রসচর্বণের ফলে সত্ত্বোদ্রেকই শ্রেষ্ঠ সমালোচনার উদ্দিষ্ট, বস্তুর বিশ্লেষণে সে উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। এই অভিমতের মধ্যে যাথার্থ্য আছে; তবে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমালোচনার মধ্যে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ছাড়া আরও কিছুর পরিচয় আছে, তাহার জন্যই তাঁহার সমালোচনা মূল্যবান্।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ছাত্রেরা তাঁহার অধ্যাপনপদ্ধতির সহিত সুপরিচিত। তাঁহার সমসাময়িক নানা প্রখ্যাত অধ্যাপকের শিক্ষণপদ্ধতির সহিত ইহার পার্থক্য আছে। তিনি আবৃত্তির ইন্দ্রজাল বা নাটকীয়তার মায়া সৃষ্টি করিয়া ছাত্রদের রসবোধ উদ্দীপ্ত করিতেন না। এমন কি আলোচ্য সাহিত্যকর্মের দার্শনিক

তত্ত্বের বিচারও যথাসাধ্য পরিহার করিয়া চলিতেন। যে পদ্ধতি তিনি পাঠকক্ষের বাহিরেও সাহিত্যসমালোচনায় প্রয়োগ করিয়াছেন Coleridge তাহার নাম দিয়াছেন argumentative analysis বা যুক্তিসম্মত বিশ্লেষণ।

প্রথমতঃ, যে বিশিষ্ট অনুভব কাব্যবিশেষের মধ্যে মূর্ত হইয়াছে ও যে মানবসত্যের তাহা প্রকাশ, কবির অন্তর্জীবনের যে রহস্য তাহার মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছে, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিশদভাবে তাহার পরিচয় দিতেন। প্রত্যেকটি কাব্য তাঁহার কাছে ছিল 'a soul in making' অর্থাৎ এক একটি মানবাত্মার সৃষ্টির ইতিহাসের একটি অধ্যায়। বিশিষ্ট ও বিচিত্র অনুভূতিতে স্পন্দিত ও উন্মুখ এক একটি মানবাত্মা-ই ছিল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে মূল সত্য ও তাহারই ক্রমবিকাশ তিনি ব্যাখ্যানের মাধ্যমে ব্যক্ত করিবার প্রয়াস করিতেন। আবশ্যকমত তিনি আলোচ্য কাব্যের কেন্দ্রীয় উপলব্ধির সহিত সমগোত্রীয় অন্যান্য কাব্যের উপলব্ধিরও তুলনামূলক আলোচনা করিতেন। কবিকল্পনার মধ্যে যে সর্বকালীন ও সকলহৃদয়সংবাদী তাৎপর্য্য রহিয়াছে, যে ব্যঞ্জনায় কাব্য প্রাণবন্ত হইয়াছে, তাহারও তিনি নির্দেশ দিতেন।

কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এইভাবে কাব্যরসের পরিচয় দিয়াই ব্যাখ্যান শেষ করিতেন না। ব্যাখ্যানের দ্বিতীয় ক্রমে তিনি কাব্যের বাচ্যার্থের বিশ্লেষণ এবং প্রত্যেকটি শব্দের ঔচিত্য ও সূক্ষ্ম ধ্বনির বিচার করিতেন, এবং কবির অনুভবের সহিত রচনার বাচ্যের, রীতির, সংগঠনকৌশলের ও প্রত্যেকটি অলঙ্কারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নিরূপণ করিয়া আলোচ্য কাব্যের তাৎপর্য্য ও তাহার অখণ্ড সত্তার স্বরূপ প্রকট করিতেন। আধুনিক কালে এই প্রকার বিশ্লেষণ ও বিচার অন্য কোনও অধ্যাপক তাঁহার মত কৃতিত্ব সহকারে করিয়াছেন কিনা সন্দেহ।

কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিভার ভাস্বরতা সর্বাধিক প্রকট হইত তাঁহার ব্যাখ্যানের তৃতীয় ক্রমে বা পরিশেষে। সেই সময় পূর্বোক্ত বিচার ও বিশ্লেষণের সার-সঙ্কলন উপলক্ষে তিনি সহসা সমালোচনার ঊর্ধ্বলোকে আরোহণ করিয়া যেন 'সূরী' বা পরাজ্ঞানীর ন্যায় দ্যুলোকে আতত বা দিব্য দৃষ্টি দিয়া সমগ্র কাব্যের স্বরূপ নিরীক্ষণ করিতেন। তখন তিনি তাহার প্রাণধর্ম আবিষ্কার করিতেন এবং সামগ্রিক ভাবে তাহা আমাদের রসবোধ ও চৈতন্যকে কি ভাবে প্রবুদ্ধ করে তাহার ইঙ্গিত দিতেন। প্রত্যেকটি মন্তব্যই কিন্তু পূর্বোক্ত বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইত, অবাধ ভাববিলাস ও কল্পনা-বিহারের স্থান সেখানে ছিল না। এই তৃতীয় ক্রমে তাঁহার সমালোচনা হইত যথার্থ দার্শনিক। এই 'দর্শন' তর্কমীমাংসার

দর্শন নহে; ভক্ত বৈষ্ণবের শ্রীকৃষ্ণদর্শনের ন্যায় ইহা সাহিত্যরসিকের কাব্যদর্শন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় Aristotle বা Coleridge ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার ছিল যাহাকে Bradley বলেন 'imaginative vision' বা ধ্যানদৃষ্টি, যাহার বলে 'We see into the life of things'। এই অনন্যসাধারণ প্রবণতাই তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত ধর্মসাধনায় প্রণোদিত করিয়াছিল।

নয়

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমালোচনা যে সর্বথা ত্রুটিহীন এমন কথা বলা যায় না। তাঁহার সমালোচনা মুখ্যত প্রশিক্ষণ-ভিত্তিক, এবং এই জাতীয় সমালোচনা অর্থাৎ তরুণ চিত্ত বোধনের জন্য সমালোচনা সর্বত্র উচ্চাঙ্গের হয় না। হইলে, শ্রোতাদের কাছে তাহা দুর্বোধ্য হইয়া পড়ে। 'A poem of any length neither can be, nor ought to be, all poetry' (Coleridge)। যেমন দীর্ঘকাব্যের সমস্ত অংশই রসাত্মক বাক্য হয় না, তেমনই বিস্তারিত সমালোচনার সমস্তটাই রসাস্বাদনের অভিব্যক্তি হইতে পারে না। রস-নিষ্পত্তির উপাদান সমূহের পরিচিতি-ও পূর্ণাঙ্গ সমালোচনার অংশ। তবুও স্বীকার করিতে হয় যে সময়ে সময়ে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমালোচনার বি-রস অংশ দীর্ঘায়িত হইত, উপন্যাসের বস্তু-সংক্ষেপ ও কবিতার গদ্যানুবাদ তাঁহার সমালোচনায় অতিরিক্ত স্থান অধিকার করিত। হয়ত তাঁহার শিক্ষকজীবনের অভ্যাসই ইহার কারণ।

কিন্তু ইহার চেয়ে গুরুতর অভিযোগ কেহ কেহ করিতে পারেন। এক এক স্থানে তাঁহার কোন কোন প্রবণতা 'গুণ' হইয়া 'দোষ' হইয়াছে। Wordsworth-এর কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে Coleridge তাঁহার যে সকল স্খলনের উল্লেখ করিয়াছেন, এই দোষগুলি তাহাদের অনুরূপ। Wordsworth-এর ঐকান্তিক সত্যনিষ্ঠার ফলে তাঁহার কোন কোন কবিতায় যেমন 'matter-of-factness' দোষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, তেমনই শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বস্তুনিষ্ঠার ফলে তাঁহার সমালোচনায় মাঝে মাঝে বাচ্যার্থকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। যেখানে লেখক কেবল কতকগুলি সাধারণ ভাব ও প্রচলিত ধারণা পরিবেশন করিতেছেন, নিজস্ব কোনও উপলব্ধির পরিচয় নাই, সে ক্ষেত্রেও সময়ে সময়ে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাচ্যার্থকে অতিমূল্য দিয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন যে রবীন্দ্রনাথের বালরচনা সম্পর্কে তিনি এই বিভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছেন। অবশ্য এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাচ্যার্থকে কখনই গৌণ মনে করিতেন না। তাঁহার

মতে ব্যঞ্জনা বাচ্যার্থের পরিপূরক হইতে পারে কিন্তু তাহার অনপেক্ষ হইতে পারে না। বাচ্যার্থকে উপলক্ষ্যমাত্র করিয়া সমালোচনার স্বাধীন বিহারে তাঁহার রুচি ছিল না।

দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার সমালোচনায় 'occasional prolixity, repetition, and an eddying, instead of progression, of thought' দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ মাঝে মাঝে অতিকথন, পুনরুক্তি এবং যুক্তির প্রগতির পরিবর্তে যুক্তির ঘূর্ণাচক্র-ই দেখা যায়। মনে হয় ইহাও তাঁহার শিক্ষকজীবনের অভ্যাসেরই ফল; বারংবার একই তত্ত্ব নানাভাবে পরিবেশন না করিলে ছাত্রেরা তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না।

তৃতীয় দোষ. তাঁহার 'mental bombast' বা মানসিক সমারোহ—যাহার তাৎপর্য্য হইল 'disproportion of thought to the circumstance and occasion', অর্থাৎ প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গের অনুপাতে চিন্তার মাত্রাধিক্য। কোন কোন ক্ষেত্রে মনে হইতে পারে যে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আলোচ্য কাব্যের রূপের উপর অতিরঞ্জন করিতেছেন, কবির ঈপ্সিত অর্থের উপর অনভীষ্ট অতিরিক্ত তাৎপর্য্য আরোপ করিতেছেন। ভাবগ্রাহিতার অতিরেক-ই ইহার কারণ। তবে কোথাও কোথাও এই দোষ লক্ষিত হইলেও এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে তিনি যে-কোন বিষয়ের আলোচনাই ধারণার উচ্চতম গ্রামে উপস্থাপন করিতে পারিতেন, এবং ইহাই ছিল তাঁহার স্বাভাবিক প্রবণতা। Coleridge-ও স্বীকার করিয়াছেন যে 'This is a fault of which none but a man of genius is capable' অর্থাৎ কেবল প্রতিভাসম্পন্ন লেখকের রচনাতেই এই দোষ থাকা সম্ভব।

আরও দুই একটি ত্রুটি উল্লেখযোগ্য। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমালোচনা সহজপাঠ্য নহে। কবি Gray-র কোন কোন কবিতা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে Dr. Johnson যাহা বলিয়াছেন—He has a kind of strutting dignity (দৃঢ় মন্থর দৃপ্ত পদক্ষেপের গরিমা তাঁহার রচনায় আছে)—সে কথা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমালোচনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে তাঁহার লেখায় স্বচ্ছতা ও সাবলীলতার অভাব মাঝে মাঝে অনুভূত হয়। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বচ্ছন্দ ভাবে যাহা লিখিতেন বা বলিতেন, পাঠক বা শ্রোতার পক্ষে তাহা গ্রহণ করা সর্বদা সহজসাধ্য হইত না। বিরক্ত হইয়া কোন কোন পাঠক বলিতেন যে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা শুধু বুদ্ধির বপ্রক্রীড়া। আসলে সাধারণ পাঠকের ও বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চিন্তাধারার মধ্যে গতিবেগের যথেষ্ট ব্যবধান ছিল বলিয়াই হয়ত তাঁহাদের এইরূপ বোধ হইত। সম্ভবতঃ তাঁহাদের বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ

সমালোচনার অন্যতম লক্ষণ তাহার সহজ আবেদন। তাহাতে অতিভাষণ বা ব্যাখ্যা-বিস্তার থাকে না; থাকে 'দুই এক বুঁদ' রূপক, উপমা, বক্রোক্তি বা অন্য কোন অলঙ্কার কিংবা অন্যবিধ কোন ইঙ্গিত, যাহার প্রভাবে পাঠকের চিত্তে 'রস উছলিয়া উঠে' ও তাহার চক্ষুরুন্মীলন হয়।

মাঝে মাঝে অপকৃষ্ট সমালোচকের ন্যায় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সমলোচনাসাহিত্যের এমন কয়েকটি অতিপ্রযুক্ত শব্দের ব্যবহার করেন, যাহাদের অনর্থক ব্যবহারের ফলে তাৎপয পাঠকের কাছে বাজারের চালু টাকার ছাপের মত অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। অনন্ত, বিশ্ব, দিব্য, বিচিত্র, অপূর্ব, আধ্যাত্মিক, আনন্দ, চিরন্তন, ভূমা প্রভৃতি শব্দ অনেক সময় অনর্থক ব্যবহৃত হয়। সুদীর্ঘ বাগাড়ম্বরের মধ্যে আলোচ্য বস্তুর কোনও বিশিষ্ট গুণ বা লক্ষণের পরিচয় থাকে না, শুধু 'আমার ভাল লাগিয়াছে' এই কথাটিই নানাভাবে ব্যক্ত করা হয়। কিন্তু যিনি টাঁকশালের সদ্যঃপ্রস্তুত মুদ্রার ন্যায় সমুজ্জ্বল পদ সৃষ্টি করিয়া স্বানুভব রূপায়িত করিতে পারিতেন তাঁহার এইরূপ স্খলন অস্বাভাবিক। হয়ত বীণার তার সবসময়েই চড়া করিয়া বাঁধা যায় না।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহিত্যিক বিচার প্রায়শঃ অভ্রান্ত হইলেও সময়ে সময়ে তাঁহার মূল্যায়ন সম্পর্কে সাধারণ পাঠকের মনে দ্বিধার উদয় হয়। আধুনিক যুগের অপ্রধান ঔপন্যাসিকদের সম্পর্কে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা কি কখন কখন অতিশয়োক্তি হয় নাই? অবশ্য এ বিষয়ে নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা যায় না, হয়ত এই সমস্ত লেখকদের যে গুণ ও সম্ভাবনা তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাহা সাধারণ পাঠকের সীমিত বোধ ও স্থূলদৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। রমেশ দত্তের উপন্যাস সম্পর্কে তাঁহার নির্ণয় কি অতিপ্রশস্তি নহে? এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্পর্কে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে তিনি সাহিত্যবিচারের পরাকাষ্ঠা স্পর্শ করিয়াছেন; কিন্তু রমেশ দত্তের ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্পর্কে তাঁহার নির্ধারণে কি পক্ষপাতিত্ব নাই? Jane Austen-এর উপন্যাসের সহিত রমেশ দত্তের সামাজিক উপন্যাস তুল্যমূল্য, এই অভিমত কি সর্বস্বীকৃত? রমেশ দত্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মত তীক্ষ্ণধী ছিলেন, ভারতীয় ও য়ুরোপীয় সাহিত্যে তাঁহার সুগভীর জ্ঞান ছিল। তাঁহার উপন্যাসে মার্জিত রুচি ও পরিশীলিত সাহিত্যবোধের যে পরিচয় আছে তাহার জন্যই কি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন? সাহিত্যের বুদ্ধিগ্রাহ্য উপাদানের আকর্ষণ যে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট সমধিক ছিল একথা অস্বীকার করা যায় না।

দশ

এই কারণে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহিত্যালোচনা সম্পর্কে কেহ কেহ কটাক্ষ করিতেন। স্বীকার করিতে হইবে যে তাঁহাদের বিরূপ মন্তব্য করার কারণ ছিল, এবং সাহিত্যদৃষ্টির পার্থক্যই সেই কারণ। মনে হয় সেই সমস্ত সমালোচকেরা ভারতীয় ও অনেক য়ুরোপীয় সাহিত্যশাস্ত্রীর ন্যায় চরম রসবাদী ছিলেন, এবং তজ্জন্যই কাব্যের বিশ্লেষণ ও বুদ্ধিগত ব্যাখ্যায় তাঁহাদের আস্থা ছিল না। তাঁহাদের অন্যতম অভিযোগ ছিল যে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কেবল romanticism ইত্যাদি 'ism'-ই সাহিত্যে প্রত্যক্ষ করেন। এই মত শুধু আংশিকভাবেই সত্য। সাহিত্যসৃষ্টির সহিত জীবনদৃষ্টির যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, এবং বিশেষ বিশেষ যুগের সাহিত্যে যে বিশিষ্ট মনোবৃত্তি ও রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়—এই মত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পোষণ করিলেও কাব্যবিচারে তিনি কবির অনুভব ও ব্যক্তিমানসের বিচারের গুরুত্বই স্বীকার করিতেন। বস্তুতঃ তাঁহার সমালোচনায় কোন স্থানেই 'ism'-এর উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়া হয় নাই।

সাহিত্যরস বিষয়ান্তরনিরপেক্ষ এবং রসচর্বণার কোনও ফলশ্রুতি নাই, এই মতবাদ অবশ্য বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার অভিমত ছিল যে সাহিত্যাস্বাদন নির্বিকল্প সমাধির ন্যায় 'বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য'—এই ধারণা রসবিলাসের প্রতি চিত্ত আকর্ষণ করিয়া মানুষের চরিত্রে ক্রমশঃ ক্লৈব্য আনয়ন করে। এই 'ক্লৈব্যে'র মোহ হইতে উদ্ধারের জন্যই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা রচিত হইয়াছিল। সাহিত্যরসের আস্বাদ 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর' বলা হইয়াছে, কারণ 'সত্ত্বোদ্রেক' ব্যতিরেকে রসাস্বাদ সম্ভব হয় না। বিষয়ান্তরনিরপেক্ষতাই (to be an end by itself) যদি ব্রহ্মাস্বাদের বিশিষ্ট লক্ষণ হইত, তবে মদ্যপের পানানন্দও ব্রহ্মাস্বাদসহোদর বলা যাইত। প্রাচীনকালে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ ও আধুনিককালে পরমহংসদেব প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞেরা যে ব্রহ্মাস্বাদের উপদেশ দিয়াছেন তাহা 'বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য' নহে; বরং 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার / ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর'—এই জাতীয় উপদেশই দিয়াছেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সাধকোচিত মানসিকতার অধিকারী ছিলেন; এবং তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে সাহিত্যসাধনা জীবনসাধনারই অঙ্গীভূত, এবং জীবন-সত্যের অনুভবের উপরই তাহা প্রতিষ্ঠিত। না হইলে, সাহিত্য হয় জীবনসত্যের স্পর্শকাতর কল্পনাবিলাস, সৃষ্টি করে পলায়নীবৃত্তির উদ্দিষ্ট মিথ্যা স্বর্গ। কলাকৈবল্যবাদে তাঁহার আস্থা ছিল না; কর্মযোগ বিনা যথার্থ জ্ঞান ও সার্থক ভক্তির উদ্ভব হয় না, ইহাই তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই উপলব্ধি-ই প্রকট হইয়াছে তাঁহার

সাহিত্যবিচারে। জীবনসত্য ও সাহিত্যসৃষ্টি এই উভয়ের অন্যোন্য-সংযোগের সম্যক্ বোধই তাঁহার সাহিত্যবিচারের ভিত্তিস্থানীয়।

এগার [ক]

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমালোচনার বিশিষ্ট রীতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা পূর্বের কোন কোন পরিচ্ছেদে করা হইয়াছে। তাঁহার সমালোচনা প্রণালীবদ্ধ বা কোন সাহিত্যিক মতবাদসম্মত নহে; কোনও গবেষক পরিশ্রম-পূর্বক তাঁহার নানা সন্দর্ভ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া একটা মতবাদ উপস্থাপন করিতে পারিবেন কিনা বলা যায় না। কারণ তাঁহার সমালোচনায় কোনও বিশিষ্ট মতবাদ অপেক্ষা একটা নিজস্ব দৃষ্টি ও অনুভবের পরিচয়ই বিশেষ করিয়া পাওয়া যায়। তীব্র রসবোধের ফলে তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি উদ্দীপিত হইয়া সাহিত্যের ব্যাখ্যা ও বিচারে প্রযুক্ত হইত। সর্বত্রই যে একই মান রক্ষিত হইত বা একই পদ্ধতি অনুসৃত হইত এমন নহে। তবে তাঁহার উপলব্ধিকে তিনি সর্বদাই বুদ্ধিগ্রাহ্য ও যুক্তিসম্মত করিবার চেষ্টা করিতেন।

কিন্তু মনে হয়, যে যুক্তি ও বুদ্ধিগত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের দ্বারা তিনি কাব্যের পরিচয় দিবার প্রয়াস করিতেন, তাহার উপরই তাঁহার অভিমতের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। Iago-র চরিত্রে Coleridge দেখিয়াছিলেন 'motive-hunting of a motiveless malignity', বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমালোচনায় আমরা লক্ষ্য করি তর্কাতীত স্বজ্ঞা-সিদ্ধ রসানুভবের (intuitive realisation) প্রমাণ-সিদ্ধির জন্য যুক্তি-তর্কের সন্ধান। তাঁহার সমালোচনার যে তৃতীয় ক্রমের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে যে পরাদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় তাহা পূর্ববর্তী বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার সহিত সমঞ্জস হইলেও সেই ব্যাখ্যারই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত মাত্র নহে। নিজস্ব অনুভবকে সকল-হৃদয়সংবাদী করিবার ও রসবোধকে যুক্তিসহ করিবার এই দুঃসাধ্য প্রয়াসে তিনি কতটা সফল হইয়াছেন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। মনে হয় যে তিনি হৃদয়ের ও বুদ্ধির অর্থাৎ সাহিত্যিক সংবেদন ও মননের পরিধি সমান বলিয়া বিবেচনা করিলেও বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞানের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর তিনিও ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারেন নাই। সমালোচনার ক্ষেত্রে Goldsmith-এর Village Preacher-এর ন্যায় তিনি 'allured to brighter worlds, and led the way'—তিনি জ্যোতির্লোকের দিকে পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করিতেন, এবং 'আপনি আচরি' সেই জ্যোতিঃ সন্ধানের ধর্ম পরকে শিখাইতেন।

[খ]

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমালোচনার আর একটি লক্ষণ উল্লেখযোগ্য। কোনও অভিমতের বা নির্ধারণের যাথার্থ্যের জন্যই যে ইহার মূল্য, তাহা নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস বা রবীন্দ্রনাথের কাব্যের যে সমালোচনা তিনি তাঁহার দীর্ঘতর গ্রন্থে করিয়াছেন, তাহারই সংক্ষিপ্তসার তাঁহার অন্য কয়েকটি গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। কিন্তু বক্তব্য উভয়ত্র এক হইলেও বস্তুসংক্ষেপের মধ্যে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমালোচনার বিশিষ্ট গুণ বা তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় না। Hamlet বা King Lear নাটকের কাহিনী কিংবা সংক্ষেপিত সংস্করণ হইতে Shakespeare-এর প্রতিভার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় না। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমালোচনায় বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের সহিত তাঁহার তীক্ষ্ণ রসানুভবের, তাঁহার দিব্যদৃষ্টির, সামগ্রিক উপলব্ধির এবং অভ্রান্ত বিচারশক্তির পারস্পরিক সহযোগের যে পরিচয় আছে, তাহার জন্যই ইহার মূল্য। শ্রেষ্ঠ কাব্য যেমন অখণ্ড, স্বপ্রকাশ ও আনন্দচিন্ময়, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমালোচনাও তদ্রূপ। রূপে রসে আবেদনে ইহা স্বয়ংসম্পূর্ণ। কোনও বস্তুসংক্ষেপের পরিধির মধ্যে ইহার সারসংকলন করা যায় না।

[গ]

এই প্রসঙ্গে আরও দুই একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিরাট্ পরিকল্পনার ভিত্তিতে দুইখানি বৃহৎ সমালোচন-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' ও 'রবীন্দ্রসৃষ্টি-সমীক্ষা' (অসম্পূর্ণ)। দুইখানি গ্রন্থই বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের চিরস্থায়ী সম্পদ্ বলিয়া সর্বত্র স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু অনেক সাহিত্যরসিকের কাছে যেমন রঘুবংশাদি মহাকাব্য অপেক্ষা মেঘদূত প্রভৃতি খণ্ডকাব্য রুচিকর, তেমনই শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সুপরিকল্পিত সুপরিসর সমালোচন গ্রন্থে তাঁহার ব্যাপকতর দৃষ্টির পরিচয় থাকিলেও তাঁহার বহুতর সাময়িক ভাষণ ও সন্দর্ভ তাঁহার অনেক অনুরাগীর কাছে তাঁহার প্রতিভা-নির্ণয়ের পক্ষে অধিকতর সহায়ক। উদাহরণস্বরূপ কৃষ্ণদাস কবিরাজ সম্পর্কে তাঁহার ভাষণ এবং 'জীবনরসিক বিভূতিভূষণ' (মুখোপাধ্যায়) সম্বন্ধে তাঁহার সন্দর্ভের উল্লেখ করা যাইতে পারে। উপলক্ষ্য হয়ত সামান্য,—পল্লীগ্রামের কোন সমাবেশে তাঁহার উপস্থিতি অথবা কোন ছাত্র বা প্রকাশকের সনির্বন্ধ অনুরোধ। কিন্তু এই সব ক্ষেত্রেই—যেখানে কোনও ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, ব্যাপক নিরীক্ষা বা মত-প্রতিষ্ঠার অবসর কিংবা প্রয়োজন নাই, যেখানে তিনি প্রশিক্ষণ ও ব্যাখ্যানের দায় হইতে মুক্ত—সেইখানেই তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত রসবোধের, আত্মিক উপলব্ধির ও সংস্কৃতিপরায়ণতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া

যায়। অধ্যাপক শ্রীকুমার নহে, মানুষ শ্রীকুমারের পরিচয় এই সব স্থলে সুস্পষ্ট। যে দৃষ্টি দিয়া তিনি জীবন দর্শন করিয়াছেন, যেভাবে তিনি সাহিত্য ও জীবনের সম্পর্ক উপলব্ধি করিয়াছেন, কোনও মতবাদের অপেক্ষা না করিয়া যে ভাবে তিনি সাহিত্যেরস উপভোগ করিয়াছেন, তাহা এই সমস্ত সাময়িক রচনায় পরিস্ফুট। সাহিত্য, সংস্কৃতি ও মানবজীবন সম্পর্কে তাঁহার নানা মন্তব্য এই সব রচনায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। দুই একটি দৃষ্টান্ত মাত্র এখানে দেওয়া যাইতে পারে। যথা—

(১) 'অনেক জল জমিয়া যে এক টুকরা স্ফটিকস্বচ্ছ বরফ আমাদের পিপাসা-তৃপ্তি ঘটায়—এই নিগূঢ় জীবনসত্যটি ছোটগল্পে বিধৃত।'

(২) 'ভাব-যমুনাকে দার্শনিকতার দৃঢ় তটভূমির মধ্যে আবদ্ধ করিতে পারিলে উহার প্রবাহকে চিরন্তন করা যায়।'

(৩) 'ভগবানের দ্বৈতবিলাস-রহস্য কি কেবল ভক্তির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকিবে, কাব্যক্ষেত্রে কি উহা প্রসারিত হইবে না?'

এই প্রকার বিবিধ মন্তব্য গ্রথিত করিয়া কোনও বিশিষ্ট মতবাদ তিনি গঠন করিবার চেষ্টা করেন নাই, এক একটি মন্তব্য নির্দোষ মুক্তার ন্যায় ভাস্বর সৌন্দর্যে শোভা পাইতেছে। বস্তুতঃ সাহিত্যশাস্ত্রী নহে, তীক্ষ্নদৃষ্টি রসবোদ্ধা হিসাবেই শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্রেষ্ঠত্ব।

বাব

ব্যাপক অর্থে সমালোচনা বলিতে যাহা বুঝায় তাহাতে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্মগত অধিকার ছিল, এবং সেই সমালোচন-দৃষ্টির পরিচয় সর্বক্ষেত্রেই পাওয়া যাইত। কিন্তু এই দৃষ্টি কোন নিশ্চয়তার গণ্ডীর মধ্যে চিরদিন আবদ্ধ ছিল না; ক্রমেই ইহা ব্যাপকতর হইয়াছে, তাঁহার মর্মগ্রাহিতা পরিবর্ধিত হইয়াছে। ইংরাজ রোম্যান্টিক কবিকুলের চর্চাতেই তাঁহার শিক্ষকজীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়াছে, কিন্তু সেই সকল কবিগণের মূল্যায়নের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রেও তাঁহার সমালোচন-শক্তির ক্রমবিবর্ধন লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার অন্যতম প্রিয় কবি Coleridge-এর Kubla Khan-এর শেষ কয়েকটি চরণ সম্পর্কে তিনি প্রথমতঃ বলিয়াছিলেন— '...in the picture of the poet, frenzied in the joy of creation, he brings us back to a homelier form of mystery—the subtle working of the poetic imagination—and at the same time delicately suggests the reasons for his inability to finish the poem'. অনেক বৎসর পরে ঐ

কয়েকটি চরণের সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'The poet thus becomes a new wizard,······weaving round him a magic circle······, a being of an alien world hedged round by an unapproachable awe—a sort of spiritualised Kubla Khan building over again that equivocal, enigmatical pleasure-dome and transmuting his innate savagery of soul into a creative force unfathomable in its origin and workings.'

এই দুইটি মন্তব্য তুলনা করিলে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপলব্ধির বিকাশের সূত্র লক্ষ্য করা যায়। কবিমানসের প্রগতি সম্ভবতঃ হয় 'অজানা হইতে অজানায়'। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মত সমালোচকের মানস সেই 'অজানা' রহস্যের স্বরূপ নির্ধারণের প্রয়াস করে, এবং বিচারবুদ্ধির তীক্ষ্ণ সন্ধানী আলোকপাতে তাহার রূপরেখা অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণেও আমাদের বুদ্ধিগোচর করে। আলোক যত তীক্ষ্ণ হইতে তীক্ষ্ণতর হয়, আমাদের উপলব্ধিও তত স্পষ্ট হয়। মানসিক প্রগতির স্বাভাবিক নিয়মেই কাব্যের সৌন্দর্য ও আবেদন ক্রমশঃ আরও স্পষ্টতর রূপে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মানসে প্রতিভাত হইত ; ইহার প্রমাণ তাঁহার বিভিন্ন সময়ে রচিত রবীন্দ্রসমালোচনা-প্রবন্ধগুলি তুলনা করিলেও বোঝা যায়। 'রবীন্দ্রসৃষ্টি-সমীক্ষা' তিনি যদি সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারিতেন, তবে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবির ও শ্রেষ্ঠ সমালোচকের চূড়ান্ত পরিচয় বোধ হয় যুগপৎ পাওয়া যাইত।

তের [ক]

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচনা-রীতির (style) বৈশিষ্ট্য আছে। ইংরাজী সাহিত্যে তিনি বিশারদ হইলেও ইংরাজী গদ্যের প্রচলিত রীতির অর্থাৎ স্বচ্ছ, সরল, মিতবাক্, স্বল্পালঙ্কার রচনা-রীতির অনুসরণ তিনি করেন নাই। এই রীতি বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক আলোচনা-পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাকে 'বৈদর্ভী' রীতির অনুরূপ বলা যাইতে পারে ; সময়ে সময়ে ইহাকে 'ভদ্ররীতি'ও (gentleman's style) বলা হইয়া থাকে। অষ্টাদশ শতক হইতে ইহা আদর্শরীতি হিসাবে ইংরাজী সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কিন্তু ইহার অনুবর্তন করেন নাই, এমন কি বাংলা সাহিত্যে গদ্যরচনায় পূর্বাচার্যগণ যে যে রীতির অনুসরণ করিয়াছিলেন তিনি তাহার কোনটিরই অনুকরণ করেন নাই। কেন করেন নাই—এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর 'the style is the man'—রচনা-রীতি রচয়িতার

মানসিকতারই পরিচায়ক। যেখানে কোন পূর্বনির্দিষ্ট পদ্ধতির অনুসরণ করা হইয়া থাকে, সেখানে রচনা অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে কৃত্রিমতা-দুষ্ট হইয়া পড়ে; তাহাতে আড়ষ্টতা, অনুপযোগিতা প্রভৃতি ত্রুটি দেখা যায়। অবশ্য যদি রচয়িতার স্বকীয় মনোবৃত্তির সহিত ঐ পদ্ধতির ভাবগত ঐক্য থাকে তবে অন্য কথা। অষ্টাদশ শতক হইতে সুপ্রতিষ্ঠিত তথাকথিত 'ভদ্র' রীতি ঊনবিংশ শতকের অনেক শ্রেষ্ঠ লেখকও গ্রহণ করেন নাই। এই প্রসঙ্গে Carlyle প্রভৃতি অনেকের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রখ্যাত গদ্যশিল্পী Pater শব্দচয়ন ও শব্দবিন্যাসে ভাবৌচিত্যের উপরই গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন; প্রতিটি শব্দের অর্থ ও ব্যঞ্জনা, শব্দবিন্যাসের পারম্পর্য ও ধ্বনিগুণ যেন রচয়িতার নিজস্ব উপলব্ধিকে রূপায়িত করিতে পারে—ইহাই ছিল তাঁহার গদ্যরচনার নীতি। তিনিও 'ভদ্ররীতি' বা অন্য কোন রীতিকে প্রকৃষ্ট বলেন নাই।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচনারীতিকে 'গৌড়ী' রীতি বলিয়া কেহ কেহ অভিহিত করিতে পারেন। গৌড়ীরীতিতে দুরূহ শব্দের আধিক্য, সমাস-বহুলতা, অলঙ্কার-প্রাচুর্য ইত্যাদি যে সমস্ত লক্ষণ আছে তাহা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচনাতেও দেখা যায়। কিন্তু বস্তুতঃ তিনি কোনও রীতির অনুবর্তন করেন নাই। তাঁহার নিজস্ব মানসিকতাই তাঁহার রচনারীতিতে প্রতিফলিত হইয়াছে। Milton-এর কাব্যের, এমন কি তাঁহার গদ্যরচনারও, রস কেবল Milton-এর নিজস্ব রীতিতেই পরিবেশিত হইতে পারে; সমসাময়িক অন্যান্য লেখকদের রীতির পাত্রে Milton-এর উচ্ছল রস পরিবেশন করা যায় না। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বক্তব্যও কেবল তাঁহার নিজস্ব ভাষা ও রীতিতেই ব্যক্ত হইতে পারে, তাহার ভাষান্তর করা যায় না।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচনায় বাক্যগুলি প্রায়ই দীর্ঘায়ত হইত, কারণ তাঁহার সমালোচনার আলম্বন ছিল বিচিত্রভাবে পরস্পরবিজড়িত নানা অনুভবের সমবায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যে রচনা করিলে সেই সমস্ত অনুভবের সংযোগসূত্র রক্ষা করা যাইত না, তাঁহার উপলব্ধির জাল ছিন্ন হইয়া যাইত। এই কারণে তাঁহার এক একটি বাক্য হইত a winding bout/ Of linked sweetness long drawn out. তাহার উপাদান ছিল এক একটি সুরের ন্যায় রসানুভবের এক একটি পরদা। কাব্যাস্বাদনের ফলে তাঁহার চিত্তের গভীর গহন হইতে নানা রসাত্মকভাব ও প্রত্যয়ের উদয় হইত, অলক্ষিত এক যাদুদণ্ডের নির্দেশে তাহারা উপযুক্ত স্থান গ্রহণ করিয়া Abt Vogler-এর সহসা-সৃষ্ট সুরসঙ্গীতির ন্যায় এক রসোজ্জ্বল রূপে প্রতিভাত হইত। ইহাই ছিল তাঁহার সমালোচনার স্বরূপ। শুধু যুক্তি বা সিদ্ধান্তের ব্যক্তীকরণ নহে, নিজস্ব উপলব্ধিকে বুদ্ধি-গ্রাহ্য করিয়া শ্রোতা বা পাঠকের চিত্তে সংক্রমণ করাই ছিল সেই সমালোচনার উদ্দিষ্ট।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাষায় অযথা আড়ম্বর বা বাগ্‌বাহুল্য নাই। বরং তাহাতে অতিসংক্ষেপনের ত্রুটি আছে, একথা বলা চলিতে পারে। সারগর্ভ হওয়াতে তাঁহার ভাষার গতি ছিল ধীর-মন্থর। তাঁহার সমালোচনা অনুধাবন করিতে হইলে ধীরভাবে প্রত্যেকটি শব্দ বা শব্দগুচ্ছের তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনা এবং তাহার সার্থকতা উপলব্ধি করা আবশ্যক। কি ভাবে তিনি কাব্যের দূর-প্রসারিত ধ্বনি ও কাব্যরূপের এক একটি পলের আভার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন তাহাও হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। নতুবা তাঁহার সমালোচনার ফলশ্রুতি হইতে আমরা বঞ্চিত হইব।

[খ]

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাষার সম্পর্কে একটা অভিযোগ—ইহার অলঙ্কার-বাহুল্য। কুরূপার পক্ষে অলঙ্কার-বাহুল্য হাস্যকর হইতে পারে, কিন্তু সুরূপার পক্ষে তাহা নহে। বরং 'রূপধারা যাহাতে উপচাইয়া পড়িয়া নষ্ট না হয় সেইজন্যই এই সমস্ত অলঙ্কার-বন্ধনের প্রয়োজন'। ইহার তাৎপর্য এই যে অলঙ্কারের সহযোগে সৌন্দর্য আরও পরিস্ফুট হয় এবং তাহার আবেদনও বর্ধিত ও ব্যাপকতর হয়। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচনায় অলঙ্কার এই উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হইয়াছে।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উপমা ও রূপক এই দুইটি সাদৃশ্যালঙ্কারের বহুল প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহাদের ব্যবহারের মূলে আছে বিভিন্ন জাতীয় দুইটি পদার্থ বা প্রত্যয়ের মধ্যে সাধর্ম্যের বোধ। এই বোধের সহিত আলোচ্য বস্তুর সারাংশের উপলব্ধি সংশ্লিষ্ট। সেই উপলব্ধির সুপ্রকাশের জন্য লেখকের কবিমানস সমধর্মী বিভিন্ন জাতীয় পদার্থের অন্বেষণ করে, একের উপর অন্যের আরোপ করে, যাহার ফলে বস্তুর স্বরূপ আরও পরিস্ফুট হয়। সাদৃশ্যালঙ্কারের প্রয়োগ মূলতঃ এক প্রকারের কবিকর্ম। সেই কর্মের উপযোগী চিত্তবৃত্তি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ছিল।

সাদৃশ্যালঙ্কারের বহুল প্রয়োগ মহাকবি মাত্রেই করিয়াছেন। 'উপমা কালিদাসস্য' জগদ্বিখ্যাত। অবশ্য উপমা বলিতে এখানে রূপককেও ধরিতে হইবে, কারণ রূপক (metaphor) স্পষ্ট উপমার (simile-র) সংক্ষিপ্ত রূপ। Shakespeare-এর রচনায় ছত্রে ছত্রে সাদৃশ্যালঙ্কারের স্পষ্ট বা গূঢ় প্রয়োগ আছে। এই জাতীয় অলঙ্কার ব্যবহারের নানা পদ্ধতি আছে, এবং প্রত্যেকটি পদ্ধতিতে রসনিষ্পত্তির একটা বিশেষ উদ্দিষ্ট আছে। সাদৃশ্যালঙ্কার ব্যবহারের যে পদ্ধতিটি সর্বপ্রসিদ্ধ তাহাকে য়ুরোপীয় আলঙ্কারিকরা বলেন expansive বা বিস্তারধর্মী। ইহার বিখ্যাত উদাহরণ কালিদাসের—

বৈদেহি পশ্যামলয়াদ্ বিভক্তং
মৎসেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিং।
ছায়াপথেনেব শরৎপ্রসন্ন-
মাকাশমাবিষ্কৃতচারুতারম্ ॥

এই জাতীয় উপমায় "each term opens a wide vista to the imagination and each term strongly modifies the other ; the 'interaction' and 'interpenetration' which, according to modern poetic theory, are central forms of poetic action occur most richly in the expansive metaphor." এই বিস্তারধর্মী উপমা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচনায় যথেষ্ট আছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ সম্পর্কে তাঁহার ভাষণ হইতে এই জাতীয় উপমার একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।— 'তাঁহার (কৃষ্ণদাস কবিরাজের) অজস্র-প্রবাহিত ভাবধারার শাখানদীসমূহ নীলাচল-প্রান্তবর্তী মহাসমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে বিলীন হইয়াছে।'

উপমার আর একটি প্রধান গুণ—অনেক সময় ইহা দুর্জ্ঞেয়কে বুদ্ধিগ্রাহ্য করিয়া তুলে। এই জাতীয় উপমা দুর্লভ, ইহার উদ্দেশ্য অলঙ্করণ নহে, গূঢ় সত্যের প্রকটন। এই প্রকার উপমা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচনায় অনেক আছে। যথা—'সুর ও তালের মধ্যে যে সম্বন্ধ, দার্শনিকতা ও কাব্যরসের মধ্যেও সেই সম্বন্ধ।' কোনও ব্যাখ্যার দ্বারা এই দুর্বোধ সম্বন্ধ বোধহয় এত স্পষ্ট রূপে নির্দেশ করা যাইত না।

অন্যান্য শ্রেণীর উপমাও বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রয়োগ করিয়াছেন। 'অবিমিশ্র হাসির চাট্নি ক্লান্ত মনোরসনায় নূতন স্বাদ আনে, কিন্তু ইহাতে পরিপূর্ণ ভোজনের তৃপ্তি আসে না।' এখানে উপমানের পরিবেশ কাব্যোচিত নহে, ইহাতে 'radical image' ব্যবহৃত হইয়াছে। 'হাস্যরসিকের তির্যক্ দৃষ্টিতে জীবনের সত্যরূপ প্রতিভাত হয় না'—এখানে 'sunken image' প্রযুক্ত হইয়াছে। 'উপমা শ্রীকুমারস্য' বিশেষ গবেষণার বিষয়, এই পরিচ্ছেদে তাহার সমুচিত আলোচনা সম্ভব নহে।

চৌদ্দ

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ সমালোচক কি না—এ বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে। যে শ্রেষ্ঠ সমালোচনার অমৃতস্পর্শ যেন যাদুবলে আমাদের রসদৃষ্টি খুলিয়া দেয় এবং কাব্যের প্রাণস্পন্দন সহসা আমাদের শ্রুতিগোচর করে, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমালোচনায় তাহার ধারা কখন কখন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মরুবালিরাশির মধ্যে হারাইয়া যায়, একথা অস্বীকার করা যায় না।

তবে সমালোচনার অর্থ যদি সম্যক্ আলোচনা হয়, তাহা হইলে কেহই তাঁহার সমকক্ষ নহেন। সাহিত্যতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনা তিনি করেন নাই। কিন্তু বহু সাহিত্যিক ও তাঁহাদের সৃষ্ট সাহিত্য সম্বন্ধে যেরূপ সূক্ষ্ম ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তিনি বিচার করিয়াছেন, গভীর অন্তর্দৃষ্টির সহিত তীব্র রসানুভবের যে পরিচয় দিযাছেন, জীবনবোধের সহিত সাহিত্যিক প্রেরণার সম্পর্ক যে ভাবে নির্ধারণ করিযাছেন, যেরূপ সামগ্রিক দৃষ্টি দিয়া তিনি যুগচেতনার সহিত সাহিত্যসাধনার, সাহিত্যের রূপের সহিত তাহার প্রাণশক্তির সম্বন্ধ নির্ণয করিযাছেন, বিশেষতঃ যে ভাবে উপলব্ধিকে বুদ্ধিগ্রাহ্য করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সমালোচনা constructive criticism বা গঠনমূলক সমালোচনার অভিধার সম্পূর্ণ যোগ্য হইযাছে। এইপ্রকার সমালোচনা কেবল রস-বোধের উদ্দীপন করে না, ইহা পাঠকের সাহিত্যদৃষ্টিকে স্বচ্ছ ও সুদূরপ্রসারী করিযা তুলে, তাহার বিচারশক্তিকে সুস্থ এবং রসোপলব্ধিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। পাঠকের চিত্ত নূতন করিযা গঠনের ক্ষমতা আছে বলিযাই ইহাকে গঠনমূলক বলা যায। কেবল এই ভিত্তির উপরই নির্ভুল সাহিত্যিক মত সংস্থাপিত হইতে পারে। যেমন বলা হয 'মাঘে সন্তি ত্রযো গুণাঃ' তেমনই বন্দ্যোপাধ্যায মহাশযের রচনায অন্যান্য সমালোচকদের সমস্ত বিশিষ্ট গুণই বর্তমান।

পনের

সমালোচনা ক্ষেত্রে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায মহাশযের অবদানের মূল্য নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমেই অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে বাংলা সমালোচনায তিনি যুগান্তর আনয়ন করিযাছেন। এমন সম্যক্ ভাবে কেহই পূর্বে সাহিত্যের আলোচনা করেন নাই। ভবিষ্যতে বঙ্গদেশে সকল সমালোচককেই তাঁহার পথ অনুসরণ করিতে হইবে, কাব্যবস্তুর সুপরিসর আলোচনা ও সুযুক্তির উপর মত প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, কেবল বীরবলী রীতিতে রসাল টিপ্পনী বা মন্তব্য করিযা দাযিত্ব সমাপন করা চলিবে না। সাহিত্যরসিকদের চিত্তে এখন নবজিজ্ঞাসা জাগ্রত হইযাছে।

দ্বিতীয়তঃ, তিনি নূতন করিযা বঙ্গসাহিত্যের ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্য সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করিয়াছেন এবং বিশ্বসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাহার যথার্থ মূল্যায়ন করিয়াছেন। তাঁহার সমালোচনা অনুধাবন করিলে আমাদের আত্মোপলব্ধি ও আত্মবিচার সুগম হয়। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একদল আছেন যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, 'আ। মরি বাংলা ভাষা' ইহাই তাঁহাদের মনোভাব। আর একদল আছেন যাঁহারা বাংলা সাহিত্যকে একান্ত কৃপার চক্ষে দেখেন, বাংলাদেশে আড়াই খানার বেশী (রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন) লেখক জন্মগ্রহণ করেন নাই—এই মত

পোষণ করেন। এই নানা মুনির নানা মতের সমন্বয় ও বিভেদের অবসান ঘটিয়াছে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনায়। তিনি বিভিন্ন মতের মধ্যে আপোষে একটা মীমাংসা করেন নাই ; বরং একথা বলা যাইতে পারে যে সর্ববিধ সংস্কার ও মতিভ্রমের কুহেলিকা তাঁহার প্রতিভার দীপ্তিতে অপসারিত হইয়াছে, এবং সর্বজনগ্রাহ্য মত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যপ্রতিভার বিশ্লেষণ অপেক্ষা ভারতচন্দ্র ও হেমচন্দ্র প্রভৃতি যে সব কবিদের প্রতিভা ও কৃতি বহু বিতর্কের বিষয় তাহাদের যথার্থ গুণের পরিচিতি ও স্থান-নির্ণয়েই তাঁহার সমালোচন-শক্তির সমধিক প্রমাণ পাওয়া যায়। সংস্কারদুষ্ট ও তির্যকৃদৃষ্টি মতামতের মধ্যে যেটুকু অন্তর্নিহিত সত্য আছে তাহা তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন, লেখকের উপেক্ষিত গুণাবলীর পরিচয় দিয়াছেন, নূতন করিয়া লেখককে সাহিত্যজগতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। রুচিগত ও সংস্কারগত সর্ববিধ সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিয়া কি ভাবে সাহিত্যবিচার করিতে হয় তাহার পথ তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন। সুরেশ সমাজপতি, প্রমথ চৌধুরী, মোহিতলাল মজুমদারের মত সমালোচকদের পথে আর কেহ চলিবে না , চলিলে, সাহিত্যসমাজে অশ্রদ্ধেয় হইতে হইবে।

সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে শেষ কথা—তিনি মাত্র সাহিত্য-সমালোচক ছিলেন না। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে তাঁহার কাছে সাহিত্যসাধনা জীবন-সাধনারই অংশ ছিল, সুতরাং কেবলমাত্র চারুশিল্প হিসাবে সাহিত্যকে তিনি কখনই গ্রহণ করেন নাই। সাহিত্যকে তিনি চিত্ত-সংস্কারের অন্যতম সাধন বলিয়াই দেখিতেন, মহত্তর উপলব্ধির প্রকট রূপ বলিয়াই বিবেচনা করিতেন। 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থ-সঙ্গমে' নাম দিয়া তাঁহার যে প্রবন্ধ-সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার ভূমিকায় তিনি সুস্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন, 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি সুস্থ জাতীয় প্রাণের যুগ্মবিকাশ, উভয়ের যোগসূত্র-ছেদ উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর। আমি এই সংযোগে একান্ত বিশ্বাসী।' এই মৌলিক উপলব্ধি ক্রমেই তাঁহার সমালোচনায় পরিস্ফুট হইয়াছে, এবং তাঁহার সাহিত্য-সমীক্ষা সংস্কৃতি-সমীক্ষার সহিত বিজড়িত হইয়াছে। 'জীবনের বিশৃঙ্খলা' (anarchy) ও 'লক্ষ্যহারা উদ্‌ভ্রান্তি' ('confusion worse than death') হইতে মুক্তির জন্য তিনি 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির গঙ্গা-যমুনাধারা যে পবিত্র তীর্থসঙ্গমে মিশিয়াছে, সেই পুণ্যতীর্থে অবগাহনের আহ্বান' জানাইয়াছেন। এই আহ্বান ক্রমেই তাঁহার সমালোচনায় একটা উদাত্ত অনুরণন আনিয়া দিয়াছে এবং তাহাকে প্রাণবন্ত করিয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে তিনি Matthew Arnold-এর অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার আদর্শ Arnold-এর Culture-আদর্শ অপেক্ষা মহত্তর। যে

সংস্কৃতির কথা তিনি বলিয়াছেন তাহা প্রাচীন গ্রীসের সংস্কৃতির আধুনিক সংস্করণ নহে। 'তমসো মা জ্যোতির্গময়'—ইহাই তাঁহার সমালোচনার মূলমন্ত্র, এবং এই মন্ত্রের উপলব্ধিই তাঁহাকে শেষ জীবনে ধর্মসাধনার পথে লইয়া গিয়াছিল।

ষোল

[ক]

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অবশ্য প্রচলিত অর্থে দেশনায়ক বা প্রচারক ছিলেন না। কিন্তু পরোক্ষভাবে তিনি আধুনিক কালে বঙ্গদেশের মনোজগতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। Bacon সম্বন্ধে যে কথা বলা হইয়াছে—'he moved the intellects which moved the world'—সে কথা সীমিতক্ষেত্রে তাঁহার সম্বন্ধে বলা যায়। চল্লিশ বা উর্দ্ধ বয়সের যে সমস্ত বুদ্ধিজীবী আধুনিক বঙ্গে শিক্ষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্র ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্ম বা চিন্তার পরিচালনা করেন, তাঁহাদের অনেকেরই মনোদীক্ষা হইয়াছিল শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে। অজ্ঞাতসারেই তাঁহারা চিন্তায় ও বিচারে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আদর্শ অনুসরণ করেন।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে মাত্র পণ্ডিত, কৃতী শিক্ষক ও সাহিত্যসমালোচক বলিয়া বিবেচনা করা ঠিক হইবে না। সর্বক্ষেত্রে তিনি ছিলেন যথার্থ সমালোচক অর্থাৎ পূর্ব-সংস্কার ও ব্যক্তিগত অনুরাগ-বিরাগ হইতে মুক্ত থাকিয়া প্রত্যেকটি বিষয়কে উদার সহানুভূতিসহ গ্রহণ করার ও তাহাকে বুদ্ধির আলোকে উদ্ভাসিত করার এবং তাহার প্রাণধর্ম আবিষ্কার করার যোগ্যতা তাঁহার ছিল। সেই আলোক বিজ্ঞানের শুষ্ক আলোক নহে; তাহা কাব্যোচিত কল্পনার রঙে রঙীন, মর্মজ্ঞতায় স্পন্দিত। শুধু রূপ নহে, স্বরূপের সন্ধানেও এই আলোক-রশ্মি ছিল অব্যর্থ।

Carlyle তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'Heroes and Hero Worship'-এ 'The hero as man of letters'—সাহিত্যিক-রূপী মহাপুরুষের কথা বলিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ তিনি Dr. Johnson-এর উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে Dr. Johnson-এর মত সাহিত্যিক-বেশী মহাপুরুষ বলিলে বোধহয় সত্যের অপলাপ হয় না।

[খ]

যদিও বিদ্যায়তনে, এবং শিক্ষা, সাহিত্য বা সংস্কৃতিমূলক যে কোনও অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলেই শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মনীষার পরিচয় পাইয়া নতমস্তক হইত এবং তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া মানিয়া লইত, তবুও মনে হয় তাঁহার

প্রতিভার দান আমাদের দেশে উপযুক্তভাবে গৃহীত হয় নাই। বোধহয়, এ দেশের অনেক মহাপুরুষের অবদান সম্পর্কেও একথা বলা যায়। আমরা স্বভাবতঃ ভাবালু, উচ্ছ্বাসপ্রবণ ; 'সম্যক্ জ্ঞান' বা বিচারবুদ্ধি আমাদের কর্ম বা বাক্য নিয়ন্ত্রিত করে না। অনেক ক্ষেত্রেই রসের প্রতি আমাদের আসক্তি কেবল রসাভাসে পর্যবসিত হয়। যদি আমরা শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিভার দান গ্রহণ করিতে পারিতাম, যদি আমাদের জীবনে রসাসক্তির সহিত নিরাসক্ত বুদ্ধির সহযোগ ঘটিত, তবে হয়ত অনেক বিভ্রান্তি ও ব্যর্থতা হইতে উদ্ধার পাইতাম।

বক্রোক্তি-বিচার

জগন্নাথ চক্রবর্তী

পাশ্চাত্য সাহিত্যসমালোচনার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে এর বিবর্তনকে ঐতিহাসিক ধারার সঙ্গে যুক্ত করা যায় এবং ইতিহাস ও রুচিবদলের সঙ্গে সমন্বিত ব'লে এর একটি সামাজিক তাৎপর্যও সহজেই ধরা পড়ে। পাশ্চাত্য সাহিত্যসৃষ্টির পরম্পরা কোথাও অস্পষ্ট নয় এবং এই প্রবহমান ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই সেখানে সাহিত্যসমালোচনার পদযাত্রা। যেন সৃষ্টির স্বার্থেই সমালোচনা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখি, স্রষ্টারা নিজেরাই সমালোচক। মনে হয়, নিজেদের সৃষ্টিসম্পর্কিত আত্মবিশ্লেষণ থেকেই এই সব সমালোচনার জন্ম। এগুলি অতএব নিছক তাত্ত্বিক, তার্কিক বা নৈয়ায়িক পরিশ্রমজাত নয়। এদের মধ্যে প্রায়শই একটি আন্তরিক জরুরীত্বের আভাস পাওয়া যায়। ফলে, কবিকর্ম ও সমালোচনাকর্ম দুটি একেবারে আলাদা বিষয় ব'লে মনে হয় না। সিডনি, ড্রাইডেন, আরনল্ড, এলিঅট প্রত্যেকের শিল্পবিচার ও সিদ্ধান্ত তাই অনেকটাই ব্যক্তি-গত ঘোষণার দলিল বলে গৃহীত হতে পারে। পক্ষান্তরে, সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র একটি আলাদা শাস্ত্র হিসাবে—বিশেষজ্ঞদের পৃথক চত্বর হিসাবেই—গড়ে উঠেছে। সেখানে দেখা যায় সমকালীনত্বের বদলে চিরকালীনত্বের প্রতি সমালোচকদের বিশেষ ঝোঁক। সমালোচক তাঁর প্রিয় কবি বা নাট্যকারের সমর্থনে শাস্ত্র বা ভাষ্য রচনা করেছেন এমন মনে হয় না। তাঁর সময়ের কোনো বিশেষ সাহিত্য-আন্দোলন বা কাব্যরীতিকে রসিক মহলে পরিচিত করাবার উদ্দেশ্যে তিনি রসশাস্ত্র লিখেছেন এমনও বোধ হয় না। বিবিধ কাব্যরীতির কথা সমালোচকরা বলেননি তা নয়, কিন্তু ঐ সব রীতির প্রতি সমর্থন তার উদ্দেশ্য নয়, নিজেদের সমালোচনারীতির পোষক দৃষ্টান্ত হিসাবেই সেগুলি উল্লিখিত। ঐ রীতিগুলি কোনো বিশেষ কাল, সমাজ বা রুচিবিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত হিসাবে দেখানো হয়নি, সর্বদাই গৃহীত কোনো অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়াল থেকে অবরোহ বা ডিডাকটিভ পদ্ধতিতে নির্মিত হয়েছে।

সংস্কৃতে অলঙ্কারবাদী, রীতিবাদী, ঔচিত্যবাদী সমালোচক আছেন, কিন্তু অলঙ্কার-বাদী, রীতিবাদী বা ঔচিত্যবাদী কাব্য বললে তা হবে অর্থহীন। কারণ, এগুলি ভিন্ন ভিন্ন কাব্যাস্বাদের নাম নয়, একই চিরন্তন স্বাদের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যান মাত্র। এখানে সমালোচনার বৈচিত্র্য ও ধরণধারণ থেকে কাব্যের রীতি, বৈচিত্র্য বা স্টাইলের হিসাব আমরা পাই না। কিন্তু এলিঅট যখন মেটাফিজিক্‌ল পোএট্রির সমর্থনে প্রবন্ধ লেখেন

তখন প্রকৃতপক্ষে তিনি মেটাফিজিক্‌ল রীতির কাব্য এবং তাঁর নিজের ও নিজের সময়কার 'নব্য মেটাফিজিক্‌ল'দের কথা মনে রেখেই তা লেখেন। নব্যক্লাসিক কাব্যের পাশাপাশি ড্রাইডেন, পোপ প্রভৃতির নব্যক্লাসিক সমালোচনা, রোমান্টিক কাব্যের পাশাপাশি ওয়র্ডসওয়র্থ, কোলরিজ প্রভৃতির রোমান্টিক সমালোচনা এবং আধুনিক কাব্যের পাশাপাশি এলিঅট প্রভৃতির আধুনিক সমালোচনা—এইটিই পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে চোখে পড়ে। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এরকমটি দেখা যায় না। সংস্কৃত অলঙ্কার গ্রন্থে বিশেষ কোনো সমালোচকের বিশেষ একটি ধরণের কাব্যের প্রতি পক্ষপাত দেখি না। বরং দেখি ভিন্ন ভিন্ন সমালোচক একই শ্লোক শত শতবার উদ্ধৃত করে যাচ্ছেন। ফলে কুমারসম্ভবের কৃষ্ণসারমৃগ কর্তৃক স্পর্শনিমীলিতাক্ষী মৃগীর গাত্র-কণ্ডূয়ন কোনোদিনই থামতে পারছে না এবং অধোমুখী পার্বতীর লীলাকমলপত্রগণনারও শেষ হচ্ছে না। আলঙ্কারিকদের বহুব্যবহার ও বারংবার উল্লেখের ফলে কোনো কোনো উদ্ধৃতি তো একেবারেই একঘেয়ে হয়ে গেছে, যেন কাব্যের তনুটিই হয়ে দাঁড়িয়েছে 'নিঃশেষচ্যুতচন্দনং স্তনতটং নির্মৃষ্টরাগোঽধরঃ,' এবং মম্মট, অপ্যয়দীক্ষিত, জগন্নাথ সকলেই কাব্যের এই চন্দনচ্যুতি ঘটানোর অপরাধে অপরাধী হয়েছেন।

এইভাবে বিভিন্ন সমালোচক যখন একই শ্লোক উদ্ধৃত করেন তখন মনে হয় সংস্কৃত কাব্যসমালোচকদের ব্যক্তিগত রুচির প্রাধান্য তো নেইই, অস্তিত্ব আছে কিনা তাই সন্দেহ। অথবা বলা যায়, তাঁদের রুচি এতই উদার ও শিক্ষিত যে তাঁরা প্রত্যেকেই সব রকমের রস, সব রকমের আহ্লাদ সমানভাবে উপভোগ করতে পারেন, অনেকটা এযুগের চা-ব্যবসায়ে নিযুক্ত টি-টেইস্টার-য়ের মতো। ফলে রসবেত্তা বা রসিক হিসাবে তাঁদের ব্যক্তিত্ব আমরা খুঁজে পাই না। তাঁদের যেন কোনো বিশেষ পক্ষপাত নেই, তাঁদের যা কিছু ব্যক্তিত্ব তা রস-নৈয়ায়িক হিসাবে। কিন্তু নিপুণ রস-নিষ্কাশক আর নিপুণ রসিক এক নয়। তাই অনেক ক্ষেত্রে আমাদের সন্দেহ থেকে যায় যে নিপুণ রসবিচারকগণ রসের পাত্রটির উপর অণুবীক্ষণযন্ত্র পেতে এমন নিবিষ্টচিত্তে বসে আছেন যে পাত্রটি মুখে তুলে ধরার অবকাশ বোধহয় তাঁদের নেই। অথবা সবগুলি পানপাত্রের প্রতি সমান অনুরাগী হওয়ায় কোনো বিশেষ পানীয়ের প্রতি তাঁরা অনুরক্ত হতে অক্ষম। রসবৈচিত্র্যের কথা তাঁরা বলেন, কিন্তু রুচিবৈচিত্র্য সম্বন্ধে তাঁরা মিতভাষী ; 'বহু স্যাম্' তাঁরা স্বীকার করেন, কিন্তু 'একোঽহম্'-য়ের সাধনায় সিদ্ধিলাভই তাঁদের কাম্য।

ক্লাসিক-রোমান্টিক, প্রাচীন-আধুনিক, রেনেসাঁস-বারোক ইত্যাদি নিয়ে ইয়োরোপিঅ সাহিত্যে ও শিল্পে যতো আলোচনা হয়েছে তার তুল্য সামান্যতম

আলোচনাও ভারতীয় রসশাস্ত্রে বা সমালোচনাগ্রন্থে নেই। তার কারণ বোধ হয় এই যে প্রাচীন ভারতবর্ষের শিল্পদৃষ্টিভঙ্গিটিই চিরন্তনত্বের সঙ্গে বাঁধা। জগৎ, সংসার, সমাজ থেকে উদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্য ও শিল্পকে এসব থেকে উর্ধ্বে অবাঙ্‌গোচরত্বের কাছাকাছি আবদ্ধ রাখার চেষ্টা সেখানে লক্ষণীয়। অথচ গ্রীক সাহিত্যে সামগ্রিক ক্লাসিকতা সত্ত্বেও অয়েসখুলস, সফক্লেস ও ইউরাইপিদেস-য়ের রচনার মধ্যে ক্রমান্বয়ে রোমান্টিক, ক্লাসিক ও আধুনিক দ্রুত বিবর্তিত এই তিনটি ধারারই পরিচয় আমরা পাই। ইউরাইপিদেস যে পূর্বসূরীদের নাট্যধারা থেকে স্বতন্ত্র, এবং সচেতনভাবেই এই স্বাতন্ত্র্য অর্জনে সচেষ্ট, সেবিষয়েও আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারি। সংস্কৃত কাব্যে বা কাব্যসমালোচনায় অনুরূপ কোনো 'বিদ্রোহী' বা 'আধুনিক' ধারা খুঁজে পাওয়া যাবে না। সংস্কৃত কাব্যকে আলঙ্কারিকরা চিরকালের মতো 'সংস্কৃত' বলে জ্ঞান করেন, যেন চরম সংস্কারের পর তার আর সংস্কার সম্ভবই নয়। ফলে তাঁরা কাব্যের চমৎকারিত্ব সম্বন্ধে যতটা, অভিনবত্ব সম্বন্ধে ততটা উৎসাহী নন। তাঁরা মনে করেন রস ও রসের প্রকার চিরদিনের জন্য মানুষের অপরিবর্তনীয় গঠনের মধ্যেই নির্দিষ্ট হয়ে আছে, কবির কাজ শুধু তাদের মধ্যে একটি বা দুটিকে বেছে নেওয়া এবং সমালোচকের কাজ কবির এই নির্বাচনের নাম, গোত্র ও শ্রেণী সনাক্ত করা। কোনো কাব্য রচিত হওয়া মাত্র রসজ্ঞরা চিরন্তন রসবিচারের কষ্টিপাথরে ফেলে দেখবেন রচনাটি উত্তীর্ণ হয়েছে কি হয়নি। কষ্টিপাথরের বিচার লঙ্ঘন করে কোনো কবিই কাব্যের ক্ষেত্রে ছাড়পত্র পাবেন না। বলা হয়ে থাকে 'নিরঙ্কুশা বৈ কবয়ঃ', কিন্তু সংস্কৃত সমালোচকদের কাছে কোনো কবিই নিরঙ্কুশ নন, কোনো কবিকেই তারা নিরঙ্কুশ হতে দেন না। আলঙ্কারিকদের অসহিষ্ণু অঙ্কুশ কাব্য এবং কবি উভয়কেই সন্ত্রস্ত করে রাখে।

কালিদাসের কথাই ধরা যাক। কালিদাসকে সাধুবাদ দেওয়া হয়েছে তাঁর উৎকৃষ্ট অলঙ্কার প্রয়োগের জন্য, পূর্ববর্তীদের তুলনায় তাঁর নতুন দৃষ্টিভঙ্গি বা আধুনিকত্বের জন্য নয়। প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত কাব্যপরিমণ্ডলে রুচিবদলের কোনো সুযোগই রাখা হয়নি। কাব্যরুচি যেন আকাশের চন্দ্রসূর্যের মতো চিরনির্দিষ্ট, চিরপ্রসিদ্ধ। অলঙ্কারশাস্ত্র এই চিরন্তন কাব্যাকাশের মানচিত্র মাত্র। যখন বলা হয় 'উপমা কালিদাসস্য' তখন তার মানে এই যে কালিদাস উপমার জন্য খ্যাত, তাঁর কাব্যে উপমার ছড়াছড়ি, তিনি উপমা-সিদ্ধ। কিন্তু এই উপমাগুলি যে কালিদাসের জন্য খ্যাত এমন দাবী করা হয় না। উপমাগুলির উপর কোনো কালিদাস-চিহ্ন আছে কি নেই, থাকলে তা কী বা তার বৈশিষ্ট্য কী, কালিদাসের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী তা টীকাকারগণ

কোথাও বিচার করেননি। যেন সম্ভাব্য সব উপমার নামরূপ বা চিহ্ন অলঙ্কারগ্রন্থে দেওয়াই আছে এবং তার বাইরে কোনো অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে চিন্তাও করা যায় না। টীকাকারগণ উপমাগুলির উপর বিচারবিবেচনা করেছেন কিন্তু কালিদাসের উপর করেননি। কালিদাসকে নিয়ে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রবন্ধ কেউ রচনা করেননি যদিও কালিদাসের প্রশংসা অনেকেই করেছেন। 'উপমা কালিদাসস্য' অর্থাৎ উপমাই মুখ্য, কালিদাস গৌণ। এই যদি কালিদাস-সমালোচনার নমুনা হয় তবে আমরা নিশ্চয়ই বোলবো ভারতীয় আলঙ্কারিকরা কাব্যসমালোচনা থেকে কবি বা কাব্যকে প্রায় বাদই দিয়েছেন, শুধু বাক্য শ্লোক শ্লোকার্ধ উপমা এবং একটি বা দুটি অলঙ্কার নিয়েই তাঁরা তুষ্ট। কালিদাস ও ভবভূতি উভয়ে যখন একই অলঙ্কার ব্যবহার করেন তখন তাঁদের অলঙ্কার প্রয়োগে যদি কোনো বৈশিষ্ট্য থাকে তবে সেই প্রয়োগের মধ্যে কালিদাসত্ব বা ভবভূতিত্ব অর্থাৎ স্বকীয়ত্ব কী তা বলতে হলে নিশ্চয়ই অলঙ্কারের সাধারণ নামটির উল্লেখই যথেষ্ট নয়, আরো-কিছু বলা দরকার। এই অভিনবত্ব বা 'আরো-কিছু' বরাবরই আলঙ্কারিকদের কাছে উপেক্ষিত হয়ে এসেছে। এই আরো-কিছুকেই আমরা 'বক্রোক্তি' বলতে পারি।

সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের অঙ্কুশের কথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু যদি দেখি কোনো অলঙ্কারশাস্ত্রী নিজেই উদ্যোগী হয়ে অলঙ্কারশাস্ত্রের অঙ্কুশ থেকে কাব্য ও কাব্য-সমালোচনাকে মুক্ত করতে প্রয়াসী, তবে আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি না। 'বক্রোক্তিজীবিত' গ্রন্থের রচয়িতা কুন্তকের সাহসে তাই আমরা চমৎকৃত হই। কখনো স্পষ্ট কখনো অস্পষ্ট ভাবে তিনি কাব্যে কবির স্বকীয়তার উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, বিশেষ একটি কাব্যে যে 'বৈচিত্র্য' বা 'বিচ্ছিত্তি' বা বিশেষ তৃপ্তি আমরা লাভ করি তার মূল হচ্ছে 'কবিপ্রতিভা' বা কবির স্বকীয়তা। বৈচিত্র্য আছে বলেই কাব্যের অলঙ্কারও নির্বিশেষ না হয়ে সবিশেষ হয়ে থাকে। কবিব্যাপার হচ্ছে কবির বিশিষ্ট কল্পনাশক্তি, এই শক্তির বলেই কবি কাব্যে 'বক্রতা' সৃষ্টি করে থাকেন। আমরা জানি, ভাষার ক্ষেত্রে নিরলস সংস্কারসাধন কবিতার অন্যতম ধর্ম। কবির কাজ কথাকে কেটে কেটে তা থেকে হীরকের দ্যুতি বের করা। কথার মধ্যে পরিবর্তন না ঘটিয়ে, পুরাতনকে অতিক্রম না করে, ঐতিহ্য না ভেঙে বা না বদলিয়ে কাব্যের সজীবতা রক্ষা করা যায় না, এই সত্যটি আলঙ্কারিকদের মধ্যে কুন্তকের মতো এমন জোর দিয়ে আর কেউ বলেননি। কুন্তক যেন প্রাচীন সাহিত্যে একজন অপ্রত্যাশিত 'আধুনিক' সমালোচক। তাঁর মতো সমালোচক থাকা সত্ত্বেও সংস্কৃতে কেন 'মেটাফিজিক্যাল' বা 'আধুনিক' ধরনের কাব্য সৃষ্টি হয়নি তা আমরা জানি না। কুন্তক অনন্যসাধারণ

প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। 'আধুনিক কাব্য' ছাড়াই তিনি 'আধুনিক' সমালোচক বা 'আধুনিক' দৃষ্টিভঙ্গির উদ্গাতা, এটি রীতিমতো বিস্ময়কর।

সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রীরা ক্ষুরধার বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় আলঙ্কারিকরা কবির সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব বা কাব্যের সামূহিক রূপ বিচার করেননি। তাঁদের আলোচনায় 'বাক্য'ই কাব্যের স্থান দখল করে বসে আছে। 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্' এই বহূক্ত উক্তির মধ্যে বাক্য কথাটিই বড় হয়ে উঠেছে। কাব্যের ইউনিট বা একক যেন একটি বাক্য মাত্র। সমগ্র কবিতা নয়, কবির সমগ্র রচনা তো নয়ই, একটিমাত্র বাক্য বা শ্লোক এবং তার অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত বিচার—এতেই কাব্য-সমালোচনা সমাপ্ত হয়ে গেছে। মধ্যযুগীয় ইয়োরোপে rhetoric-য়ের যা কাজ ছিল এর কাজও যেন অনেকটা তাই। এতে সম্পূর্ণ কবিতার মধ্যে কবির যে অন্তর্দৃষ্টি বা vision ক্রিয়াশীল, তার কোনো বিচার আমরা পাই না। বিভিন্ন কবিতার মধ্যে ক্রমোদ্ভাসিত কবির সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব বা জীবনদর্শনের বিচারের কথা অতএব ওঠেই না। অনেকে আবার কাব্যের ইউনিটকে 'বাক্য' থেকেও গুটিয়ে 'শব্দে' পর্যবসিত করেছেন, যথা—'রমণীয়ার্থপ্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্।' কাব্যবিচারের এই সঙ্কীর্ণ ঐতিহ্য ও পশ্চাৎপটের কথা মনে রেখেই আমরা কুন্তকের অভিনবত্ব বুঝতে চেষ্টা কোরবো।

কুন্তক যখন কাব্যকে 'বাক্য' না বলে 'উক্তি' বলেন তখন মনে হয় তাঁর এই শব্দ-নির্বাচন নিরর্থক নয়। তিনি বলতে পারতেন, বক্রবাক্যং কাব্যম্। কিন্তু তা তিনি বলেননি। তাঁর মতে একটিমাত্র বাক্যে নয়, সমগ্র উক্তির মধ্যে অর্থাৎ উচ্চারিত সমগ্র কাব্যের মধ্যেই কাব্যত্বের অনুসন্ধান করতে হবে। প্রতি পংক্তি শ্লোক বা পদে যে অলঙ্কার ঝলমল করবেই তা নয়, এবং না করলেই যে কাব্য থেকে খারিজ হয়ে যাবে তাও নয়। সমগ্র উক্তি বা কাব্যটি যদি আমাদের অবাক করে দিতে পারে, আমরা যদি তা থেকে মজা বা আনন্দ পাই, নূতন কিছুর স্বাদ পাই এবং তার চমৎকারিত্বে মুগ্ধ হই, তাহলেই হল।

ধরে নেওয়া যাক 'বাক্যং' কথাটি সুপ্রযুক্ত নয়, কিন্তু 'রসাত্মকং' কথাটি তো বেশ সুন্দর। তাহলে কুন্তক 'রসোক্তি' না বলে 'বক্রোক্তি' কেন বললেন? 'রস' কথাটির মধ্যেই তো চমৎকারিত্ব, অভিনবত্ব সবই ধরা পড়েছে। পড়ছে বটে, কিন্তু 'রস' একটি ব্যাপক কথা। কবিতায় রস আছে বলেই তা কাব্য হয়েছে, আবার কাব্য হয়েছে বলেই রস পাচ্ছি। রস এবং কাব্যত্ব এ দুটি যেন সমার্থক হয়ে উঠছে, কাব্যত্ব আছে বলেই রচনাটি কাব্য—এই ধরনের সমোক্তি বা tautology-তে গিয়ে আমরা পৌঁছাচ্ছি। কাব্যত্ব সৃষ্টি হচ্ছে কিসে? কাব্যের মূলে কী আছে? যদি বলা যায়

রস, তাহলে শুধু রস কেন আরো অনেক অ্যাবসট্রাক্ট ধারণাই এসে পড়বে, যেমন কল্পনা, প্রতিভা, নৈপুণ্য ইত্যাদি। সার্থক কাব্যের মূলে তো এ সবই আছে। রস, কল্পনা, প্রতিভা এগুলি কিছু অনুভবের কিছু আবার অনুমানের ব্যাপার। কাব্যবিচারে এগুলির প্রাধান্য দিলে অবশেষে 'নীরব কবিত্ব'-কেও স্বীকার করতে হয়। কাব্যসৃষ্টি একটি মানসিক প্রক্রিয়া হতে পারে, কিন্তু তা মানসিক স্তরেই যদি সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে কাব্য হয়ে উঠতে পারে না। কাব্যের প্রকৃত সিদ্ধি কথায়, রচনায়, উক্তিতে। কাব্যব্যাপার কেবলমাত্র মানসিক নয়, ঔক্তিকও বটে। কাজেই কাব্যের বিচার মূলত কবিতার বিচার অর্থাৎ কাব্যোক্তির বিচার। কবিতার উৎস বা প্রেরণা কল্পনা, আবেগ, ভাবোচ্ছ্বাস সব কিছুই হতে পারে, কিন্তু কথার মধ্যে যতোটুকু উক্ত বা ব্যক্ত হচ্ছে সেটুকু নিয়েই পাঠক বা শ্রোতার কাজ। বলা যায় উক্তিই কাব্যের একমাত্র 'অবজেকটিভ কো-রিলেটিভ'। বাস্তব ক্ষেত্রে কাব্যের কাব্যত্ব নির্ভর করছে উক্তির উপর, সার্থক প্রকাশের উপর। কুন্তক তাই বললেন, কাব্যের কথা সর্বদাই বিশিষ্ট কথা, অ-সাধারণ কথা, এক ধরনের অ-সহজ বা বাঁকা কথা (শ্লেষাত্মক অর্থে নয়), সংক্ষেপে বক্রোক্তি।

অলঙ্কার অলঙ্কার ব'লে সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্র একেবারে পাগল। কিন্তু অলঙ্কার মানেই তো নির্ধারিত প্যাটার্ণ। অথচ কাব্যের জন্য চাই ক্রমাগত প্যাটার্ণ, স্টাইল, এমন কি ফ্যাশন পর্যন্ত বদলানো। চিরন্তন এফেক্টের জন্য ব্যগ্র না হয়ে যেটি সবচেয়ে প্রয়োজন তা হচ্ছে স্বাদবদল। কিন্তু কাব্যশাস্ত্রীরা স্বাদের উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট ইত্যাদি ক্রম সাজিয়ে এমন চরম রায় দিয়ে বসে আছেন যে গৃহীত অর্থে কমনীয়, রমণীয় ইত্যাদি না হলেই কাব্য রসাতলে যাবে এমন একটা ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে আলঙ্কারিকরা ভাবী কবিদের ভয় পাইয়ে রেখেছেন, তাদের সাহসী পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিশেষ অবকাশ রাখেননি। কুন্তক এই শাস্ত্র-পীড়িত পরিখাবেষ্টিত কাব্যবিচারসভায় শাস্ত্রকে সরাসরি নস্যাৎ না করলেও গৌণ বলেই ঘোষণা করলেন। তিনি নূতনকে সন্ধান করার কথা বললেন এবং কবিকে প্রলোচিত করলেন সাহসী ও নিরঙ্কুশ হতে। অবশ্য কুন্তকের নিজের বক্তব্যও যথেষ্ট বক্রোক্ত। সরাসরি শাস্ত্রকে বাতিল বললে কেউই শুনবে না, তাই তিনি নিজে অলঙ্কারশাস্ত্রীর ভূমিকা গ্রহণ করেই তাঁর বক্রোক্তি-বাদ প্রচার করলেন।

কুন্তক-প্রচারিত বক্রোক্তি কোনো নির্দিষ্ট ভঙ্গী বা অলঙ্কারের নাম নয়। যে-কোনা আকর্ষক চমক-দেওয়া রচনাকেই বক্রোক্তি বলা যায়। যা বক্রোক্তি নয়, কেবলমাত্র উক্তি, তা কাব্যই নয়, কারণ বক্রোক্তিসাধ্যতাই কবিত্ব। কুন্তকের মতে 'ভঙ্গী-

ভণিতিরম্যতা'-ই কাব্যের প্রধান লক্ষ্য এবং এটি সম্পাদন করা কবির মুখ্য কাজ। জোরটি রম্যতার উপর নয়, ভঙ্গীর উপর। রবীন্দ্রনাথ 'শুধু ভঙ্গী' দিয়ে মন ভুলাতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু কুন্তক বলেন, ভঙ্গী চাইই। ভঙ্গী এবং রীতিবাদীরা যাকে রীতি বলেন তা কিন্তু এক নয়। রীতি বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষাব্যবহারের বাঁধাধরা আলাদা আলাদা নাম, যেমন বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী আবন্তিকী, মাগধী, লাটিকা ইত্যাদি রীতি। ভঙ্গী হচ্ছে বাঁধাধরার বাইরের জিনিষ, যা ভঙ্গীকার নিজের স্বাতন্ত্র্য অর্জনের জন্যই রচনার মধ্যে আমদানি করে থাকেন। বক্রতা বললেই এমন কিছু বুঝায় যা স্বাভাবিকভাবে প্রত্যাশিত নয়, যার মধ্যে রয়েছে আকস্মিকতা ও বিপর্যয়। যেমন, যেখানে বহুবচন প্রত্যাশিত সেখানে বিশেষ এফেক্টের জন্য একবচনের প্রয়োগ, বিষয় হিসাবে যেটি নিতান্ত গৌণ তাকেই মুখ্য হিসাবে বর্ণনা করা ইত্যাদি। এগুলিকে বক্রতার প্রকারভেদ হিসাবে নামকরণ করার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু তার বিশেষ সার্থকতা আছে বলে মনে হয় না। কারণ বক্রতার প্রয়োগ যেখানে সার্থক সেখানে এসব পঙ্ক্তী বা category-র দরকার হয় না। 'বক্রোক্তিজীবিত' গ্রন্থে অন্যান্য অলঙ্কারগ্রন্থের মতো এই ধরনের পঙ্ক্তীকরণ ও শ্রেণীবিভাজনের আয়োজন থাকলেও কুন্তকের সব বক্তব্যের মধ্যে এই আশ্বাসই প্রধানত ফুটে উঠেছে যে এগুলি শুধু কবিব্যাপার বুঝাবার জন্যই বলা হচ্ছে, কবি যে এগুলির মধ্যেই নিজেকে সীমিত রাখবেন তা কখনই নয়। কবি ভাষা ও উক্তিতে বিপর্যয় ঘটাবেন এবং বিপর্যয় ঘটিয়ে বৈচিত্র্য সম্পাদন করবেন। বিপর্যয়, বৈচিত্র্য, এগুলি শুধু গড়ার নয় ভাঙারও কথা, অলঙ্কারশাস্ত্রকে সজ্ঞানে অমান্য বা অতিক্রম করারও কথা। এই বৈপ্লবিক, অচিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গী আমদানি করার জন্যই সম্ভবত ঐতিহ্যানুসারীরা 'বক্রোক্তিজীবিত' গ্রন্থের সারমর্ম উপেক্ষা করে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন ; কুন্তকের আগে আলঙ্কারিকরা স্থূলভাবে বক্রতা বলতে যা বুঝতেন পরবর্তীকালেও অনেকে শুধু সেই পুরোনো কাসুন্দিই ঘেঁটেছেন, কুন্তকের নূতন অর্থ ও ইঙ্গিত গ্রহণ করেননি।

কুন্তকও অলঙ্কারবাদী, তবে তিনি একটু ভিন্নধরনের অলঙ্কারবাদী। তাঁর মতে, অলঙ্কারের জন্যই অলঙ্কার নয়, বক্রোক্তির জন্য এবং বক্রোক্তির মধ্যেই অলঙ্কার। তিনি বলেন, কাব্যের জন্য অলঙ্কার অবশ্যই চাই, কাব্যে ব্যবহৃত শব্দ ও অর্থ উভয়কেই অলঙ্কৃত হতে হবে। অলঙ্কার কী ? যা সহজ স্বাভাবিক তার চেয়ে যা অতিরিক্ত তাই অলঙ্কার, যা রচনাকে অলঙ্কৃত অর্থাৎ অসামান্য ও বিশিষ্ট করে তোলে তাই অলঙ্কার। কাব্য মানেই অ-সামান্য উক্তি, এই উচ্চায়ন বা heightening কাব্য-ব্যাপারের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। অতএব বলা যায় যা কাব্য তাই অলঙ্কৃত। যা অলঙ্কৃতি

তাই কবিকৃতি। কাব্য ঝঙ্কৃত হতে পারে নাও পারে, কিন্তু অলঙ্কৃত হবেই। কুন্তক তাঁর গ্রন্থের উপস্থাপনায় অলঙ্কার বলতে বিশেষ করে উৎপ্রেক্ষা, শ্লেষ প্রভৃতি অলঙ্কারের কথা বলছেন না। অলঙ্কার বলতে তিনি এগুলি এবং এগুলি ছাড়াও আরো যা কিছু সবই বুঝাচ্ছেন— যা কিছু কাব্যের উক্তিকে কাব্য হতে সাহায্য করে তা সবই, যা শুধু বহিঃসজ্জা বা আভরণ জোগায় তা নয়, যা উক্তিকে বক্রোক্তি করে তোলে প্রধানত তাই। বক্রোক্তিই সব অলঙ্কারের মূল কথা এবং তথাকথিত অলঙ্কারের অতিরিক্ত কাব্যব্যাপারেরও মূল কথা। শাস্ত্রমতে ভিন্ন ভিন্ন অলঙ্কারের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। অলঙ্কারবাদীরা 'বক্রোক্তি'কেও একটি অলঙ্কার হিসাবে চালাতে চেষ্টা করেছেন এবং এর ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী নির্দেশ করতেও সচেষ্ট হয়েছেন। শ্রেণী ভাগ করা খুব কঠিন কাজ নয়, এবং কুন্তক নিজেই উদাহরণসংযোগে তা করেছেন। কিন্তু কুন্তকের আসল উদ্দেশ্য প্রথাসিদ্ধ শ্রেণীবিভাজন নয়, দৃষ্টান্ত দেবার সুবিধার জন্যই তিনি আলাদা আলাদা শ্রেণী ও তাদের নামকরণ করেছেন মনে হয়।

অলঙ্কারবাদীরা সবকিছুকেই অলঙ্কার বলে চালাতে গিয়ে মাঝে মাঝে খুব মুশকিলে পড়ে যান। এই মুশকিল বিশেষভাবে ঘটে স্বভাবোক্তির ক্ষেত্রে। স্বভাবোক্তি মানেই স্বাভাবিক অনলঙ্কৃত উক্তি। অলঙ্কারহীনতা যদি কাব্যের হানি ঘটাতে না পারে তাহলে অলঙ্কারই কাব্যত্ব এ যুক্তি খাটে না। তাই তাঁরা মুখরক্ষার জন্য স্বাভাবিক উক্তিকেও একটি আলঙ্কারিক নাম নামাঙ্কিত করেছেন—স্বভাবোক্তি অলঙ্কার। এটি ভাবের ঘরে চুরি ছাড়া আর কিছুই নয়। এ যেন অলঙ্কারবাদের কারখানায় তৈরি একটি সোনার পাথরের বাটি। অলঙ্কারহীনতাই অলঙ্কার, নগ্নতাই আবরণ এ সবই স্ববিরোধী উক্তি। আবার রস বা ধ্বনি সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছাড়াই কবি যখন কাব্য রচনা করেন তখন রসবাদী বা ধ্বনিবাদীরাও মুশকিলে পড়েন। তাঁরা তখন চেষ্টাচরিত্র করে প্রমাণ করতে বসেন যে রস বা ধ্বনির অনুপস্থিতি আসলে অনুপস্থিতি নয়, আপাতশ্রুতিতে রস বা ধ্বনি না থাকলেও এসব ক্ষেত্রে রস বা ধ্বনি অনুমান করে নেওয়া যায় বা নিতে হবে।

স্বভাবোক্তি অলঙ্কার কি না এই প্রশ্ন নিয়ে আলঙ্কারিকরা এমন জটিল দ্বন্দ্বে পড়তেন না যদি কুন্তকের মতো কাব্যকে একটি সমগ্র ইউনিট বলে মনে করার চেষ্টা করতেন। কুন্তক নিজেও যে এ ব্যাপারে খুব দৃঢ় বা স্পষ্ট তা নয়, কিন্তু তিনিই এ ব্যাপারে সঠিক পদক্ষেপ করতে অগ্রসর হয়েছিলেন বলা যায়। কাব্যকে একটিমাত্র শ্লোকের মধ্যে বেঁধে ফেলে বিচার করতে বসলে অনেক জায়গায়ই কোনো অলঙ্কার বা অসাধারণত্বের সাক্ষাৎ মিলবে না। কিন্তু সবগুলি শ্লোক একত্রে পড়লে কি সমগ্রভাবে

সেগুলিকে দৈনন্দিন আটপৌরে কথা থেকে পৃথক মনে হবে না? কালিদাসের যে শ্লোকে কোনো তথাকথিত অলঙ্কার নেই তা নিরলঙ্কার বলেই কি ঠিক সাধারণ উক্তি? তার মধ্যে যে অসাধারণ মাধুর্য পাই, তা কেন পাই? তার কারণ, কাব্যের অব্যবহিত প্রসঙ্গ বা context-য়ের মধ্যে এই সহজ বর্ণনাও অসাধারণ হয়ে উঠেছে, কাব্য বা শিল্প হিসাবে সার্থক হয়ে উঠেছে। শেকসপিঅরের 'ম্যাকবেথ' নাটকে লেডি ম্যাকবেথ যখন বলেন, 'we fail!' (আমরা ব্যর্থ হবো!), তখন কথা দুটি স্বভাবোক্তি নিশ্চয়ই, কারণ শাদা গদ্যে এবং সাধারণ সব ক্ষেত্রেই এদের ব্যবহার আছে, এদের মধ্যে কোনো অলঙ্কার বা figure of speech আবিষ্কার না করলেও চলে। কিন্তু নাটকের মধ্যে লেডি ম্যাকবেথ যখন এই দুটি কথা ব্যবহার করেন তখন শ্রোতা বা পাঠক শুধু এই দুটি কথায় মোহিত হন না, সমগ্র নাটকীয় context-য়ের মধ্যে লেডি ম্যাকবেথের জটিল মানসিকতার সঙ্গে মিলিয়ে এর চমৎকারিত্ব উপলব্ধি করেন। বাক্য বা বাক্যাংশটি স্বভাবোক্তি বা সাধারণ উক্তি, কিন্তু সমগ্র পরিবেশের মধ্যে তা একটি অসাধারণ 'অ-স্বাভাবিক' উক্তি হয়ে উঠেছে। এইভাবে বিচার করলে বলা যায় কাব্যের সমগ্র ইউনিট কখনই অলঙ্কারশূন্য, আটপৌরে বা সহজোক্ত নয়।

আরো একভাবে এই বিষয়টি বিচার করা চলে। সাধারণ কথা থেকে কাব্যকথা যে আলাদা তা তার ছন্দ, বাগ্‌বন্ধ, স্পন্দন ইত্যাদির মধ্যে নানাভাবে ধরা পড়ে। কিন্তু লৌকিক আটপৌরে কথার সঙ্গে কাব্যকথা কখনই নিঃসম্পর্কিত নয়। বরং বলা যায় সব কবিই কমবেশি লৌকিক, সামাজিক ও ব্যবহারিক কথার সঙ্গে তথাকথিত 'কাব্যিক' কথা সংযুক্ত করে থাকেন। মুখের কথার সঙ্গে সাহিত্য বা কাব্যের কথার মিশ্রণের পরিমাণ ও ধরন অবশ্য সর্বদাই বদলাচ্ছে। এই মিশ্রণের রীতি, পরিমাণ ও অনুপাত বদলিয়ে বদলিয়েই সাহিত্য ও কাব্যের নূতনত্ব সৃষ্টি হচ্ছে। প্রত্যেক কবিই নিজের মতো করে এই মিশ্রণের রীতি ও পরিমাণ স্থির করে নেন। কাব্য অলঙ্কৃত হবে কি হবে না, কিংবা কাব্যের ভাষা মৌখিক ভাষার সমান হবে কি হবে না—এটি একটি ভুল বিচার, এবং ওয়র্ডসওয়র্থ ও কোলরিজের মধ্যে গদ্য ও কাব্যের ভাষা নিয়ে যে বিতর্ক তাও কিছুটা এই ভুলবিচারের উপরই প্রতিষ্ঠিত। সর্বদাই কাব্যের স্বাদ ও রুচি বদলাবে এবং কাব্য ও অকাব্যের ভাষা কখনোই শতকরা একশো ভাগ সমান হবে না। কবিতার মধ্যে লৌকিক ও অ-লৌকিকের সংযোগসেতুটি কোন্ তীরে কতো ভারী তা চিরকালের জন্য কেউ স্থির করে দিতে পারে না। সমগ্র কাব্যে অলঙ্কৃত উক্তি ও স্বভাবোক্তি দুয়েরই প্রয়োজন আছে। অতএব কোনো একটি শ্লোকে যদি অলঙ্কার নাও থাকে তাতে সমগ্র কাব্য অনলঙ্কৃত হয়ে যায় না। বরং অলঙ্কার ও

অনলঙ্কারের এই মিশ্রণ দিয়েই কবির বৈশিষ্ট্য চেনা যায়। কালিদাসের কাব্যে লৌকিক ভাষা ও বাগ্‌রীতির পরিমাণ ও অনুপাত যদি অলঙ্কারশাস্ত্রীরা বিচার করে দেখতেন তবে হয়তো কালিদাসের স্টাইলের নির্ভরযোগ্য বিশ্লেষণ আমরা পেতাম।

স্বভাবোক্তি ও অলঙ্কৃত উক্তি কাব্যে উভয়েরই স্থান আছে, কারণ কাব্যের মধ্যে দুইই বক্রোক্তি। আধুনিক কাব্যের পাঠকরা বক্রোক্তির সপক্ষে আরো একটি যুক্তি দেখাতে পারেন, যা কুন্তক দেখাননি। মানুষের ভাষায় বাক্যবন্ধের উৎপত্তি ঘটেছে যুক্তিপ্রয়োগের স্বার্থে, rational চিন্তাধারা থেকে। আমরা যখন কথা বলি তখন লজিক মেনে চলি, পদবিন্যাস বা syntax তারই সাক্ষ্য দেয়। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে বাক্যের দৈর্ঘ্য ও জটিলতাও বেড়েছে অর্থাৎ কার্যকারণ-পরম্পরায় আবদ্ধ যুক্তির শৃঙ্খল ক্রমশ দীর্ঘ হওয়ায় বাক্যের দৈর্ঘ্যও বড়ো হয়েছে। এইভাবে যুক্তির সরণি অনুসরণ করতে করতে মানুষ শুধু বাক্যের দৈর্ঘ্যই নয়, সভ্যতার জয়যাত্রাকেও বাড়িয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু মানুষের আরো একটি স্বরূপ আছে সেটি irrational, সেটি অযুক্তি বা আবেগের সত্তা এবং নির্জ্ঞান বা unconscious-য়ের মধ্যে তা প্রোথিত। ব্যবহারিক জগৎ যুক্তির জগৎ, কিন্তু স্বপ্ন বা কল্পনার জগৎটি অযুক্তির জগৎ, মানসোল্লাস বা vision-য়ের জগৎ। ভাষা সাধারণত যুক্তির বাহন হলেও ভাষাকে এই অযুক্তিরও বাহন হতে হয়, বাহন করে তোলার চেষ্টা কাব্যসাহিত্যের চিরন্তন দুরূহ সাধনা। উক্তিকে উক্তিমাত্র রাখলে এই গভীর গোপন সত্তাকে প্রকাশ করা যায় না। এটি করতে হলে প্রয়োজন উক্তিকে বক্রোক্তি করে তোলা। তাই বক্রোক্তিই কবিতা একথা গভীর অর্থে সত্য, আধুনিক কাব্যবিচারের ক্ষেত্রে তো বিশেষভাবে সত্য।

কুন্তক তাঁর 'বক্রোক্তিজীবিত' গ্রন্থের শুরুতেই বৈচিত্র্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন, কারণ এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই তাঁর কাব্যভাবনার মৌলিকতা নিহিত। অলঙ্কার নয়, বৈচিত্র্য ; বৈচিত্র্যসৃষ্টিতেই কাব্যের সার্থকতা। অবশ্য বৈচিত্র্যের জন্যই বৈচিত্র্য নয়, কাব্যের জন্যই বৈচিত্র্যের প্রয়োজন। ভাষার বৈচিত্র্য বা সজীবতা ছাড়া কাব্যের স্বাদ লাভ করা সম্ভব নয়। কাব্যসিদ্ধি মানেই, অন্তত কবির পক্ষে, বৈচিত্র্যসিদ্ধি। এই অপূর্ব চমকপ্রদ ঘোষণা দিয়েই তিনি তাঁর গ্রন্থ আরম্ভ করেছেন এবং পর পর কয়েকটি শ্লোকে কাব্যবিচারে তাঁর এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন :

লোকোত্তর চমৎকারকারি **বৈচিত্র্য** সিদ্ধয়ে।
কাব্যস্যায়মলঙ্কারঃ কোঽপ্যপূর্বো বিধীয়তে ॥

কাব্যের যা কিছু অলঙ্কার তার একটিমাত্র উদ্দেশ্য বৈচিত্র্য উৎপাদন বা বৈচিত্র্যসিদ্ধি। 'অলঙ্কার' পদটির আগে যে 'অপূর্ব' বিশেষণটি দেওয়া হয়েছে তাও 'বৈচিত্র্যে'র সঙ্গে

মিলিয়েই পড়তে হবে। 'বৈচিত্র্য' একটি ব্যাপক শব্দ, এটি কোনো অলঙ্কারের নাম নয়, হতেও পারে না। বক্রোক্তিও তাই। এটি প্রায় বৈচিত্র্যেরই সমার্থক শব্দ। বক্রোক্তিকার তাই বৈচিত্র্যের প্রসঙ্গ দিয়েই তাঁর বক্তব্য শুরু করেছেন।

তৃতীয় শ্লোকেই তিনি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন— 'কাব্যবন্ধ'। বাক্য বা শ্লোক নয়, তিনি কাব্যবন্ধ অর্থাৎ সমগ্র সর্গ বা নানা সর্গে বিভক্ত সমগ্র কাব্যকেই ইউনিট বলে ধরেছেন। কাব্য যে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্প-ইউনিট, এই বোধ কুন্তকে বিশেষভাবে উচ্চারিত, 'কাব্যবন্ধোঽভিজাতানাং হৃদয়াহ্লাদ-কারকঃ।' 'অভিজাত'-দের আনন্দদায়ক, এই কথাটিতে বিদগ্ধরুচির প্রতি পক্ষপাতের ইঙ্গিত রয়েছে। এটি স্বভাবকবিত্ব বা স্বভাবোক্তির বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী। কাব্যকে অ-সাধারণ হতে হবে, কিন্তু সেই সঙ্গে পাঠককেও কিছুটা 'অভিজাত' বা অ-সাধারণ রুচিসম্পন্ন হতে হবে।

এরপর চতুর্থ শ্লোকে কুন্তক জোর দিয়েছেন নূতনত্বের উপর। অভিনবত্ব, আকর্ষকত্ব, চমক এগুলি কাব্যের প্রাণশক্তির পরিচয় দেয়,—

সৎ কাব্যাধিগমাদেব **নূতনৌচিত্যমা**প্যতে।

কাব্য থেকে আমরা শুধু ঔচিত্যের নয় নূতনত্বের, অথবা বড় জোর নূতনত্বের সঙ্গে মিশ্রিত ঔচিত্যের স্বাদ পাই। এখানে ঔচিত্যের সঙ্গে নূতনের বন্ধন ঘটানোয় প্রকৃতপক্ষে 'ঔচিত্য' কথাটির ভ্রূকুটিই অনেকটা মিলিয়ে গেছে। নব্য-ক্লাসিকদের 'প্রপ্রাইটি' বা 'ডেকোরাম'-য়ের মতো 'ঔচিত্য' পাছে অনুশাসনবিধির সগোত্র হয়ে ওঠে তাই কুন্তক নূতনত্বের কথাটি আগে পেড়েছেন। কাব্যে ঔচিত্যের জন্যই ঔচিত্য আমদানি করার অবকাশ নেই, নূতনত্ব সৃষ্টির জন্য যা উচিত কাব্যে তার বেশি বা তদতিরিক্ত ঔচিত্যের একেবারেই দরকার নেই। প্রাচ্য ঔচিত্যের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য লিটারেরি ডেকোরাম (literary decorum)-কে ঠিক এক বন্ধনীর মধ্যে হয়তো ফেলা যায় না। তবু ঔচিত্য ও ডেকোরাম উভয়েরই পশ্চাতে এক সমধর্মী অনুশাসনের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। তাই নূতনের অনুরোধে ও প্রয়োজনে, চলিত ঔচিত্য ও ডেকোরাম ভাঙবার অধিকার কুন্তক প্রথমেই পাকা করে রাখতে চান। আর সেইজন্যই ঔচিত্যের রথের আগে নূতনের পক্ষিরাজটি জুড়ে দিয়েছেন।

ষষ্ঠ শ্লোকে কুন্তকের বক্তব্য অলঙ্কার সম্বন্ধে প্রচলিত বক্তব্য থেকে রীতিমতো স্বতন্ত্র। কাব্যের অলঙ্কার বাইরে থেকে চাপিয়ে বা পরিয়ে দেওয়া কোনো গহনা বা সাজ নয়, কাব্য যখন সার্থক কাব্য তখন তাকে আপনা থেকেই পৃথক বা অলঙ্কৃত মনে

হয়, তার সজ্জা যে সাধারণ কথোপকথনের সজ্জা থেকে আলাদা তা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না।। কাব্যের সঙ্গে অতিরিক্ত অলঙ্কার যোগ করার কথাই ওঠে না। কারণ কাব্য স্বয়ংশোভিত স্বযমলঙ্কৃত হয়েই সৃষ্ট ও ভূমিষ্ঠ হয়। তাই ষষ্ঠ শ্লোকে কুন্তক 'কাব্যস্য সালঙ্কারতা' না বলে বলেছেন 'সালঙ্কারস্য কাব্যতা'।

এরপর সপ্তম শ্লোকে তিনি কাব্যের 'বক্রত্ব' এবং 'বন্ধত্ব' সম্বন্ধে আবার বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন—

শব্দার্থৌ সহিতৌ **বক্র** কবিব্যাপারশালিনি।
বন্ধে ব্যবস্থিতৌ কাব্যং তদ্বিদাহ্লাদকারিণি॥

এখানে 'বন্ধ' বা বাঁধুনি বলতে শিল্পসম্মত ফর্মে আবদ্ধ ইউনিট বুঝতে হবে। কুন্তক নিজে ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "বন্ধো বাক্যবিন্যাসঃ"। কাব্যকে যিনি বাক্য না বলে উক্তি বলেছেন তিনি 'বন্ধ' ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যেন অসতর্কভাবেই বাক্য কথাটি আমদানি করে ফেলেছেন। অবশ্য 'বাক্য' কথাটি এখানে গৌণ, 'বিন্যাস' কথাটির উপরই সব জোরটুকু গিয়ে পড়ছে। তাছাড়া 'বাক্যবিন্যাস' অর্থ বাক্যের (একবচন) বিন্যাস না বুঝে বাক্যগুলি বা বাক্যসমষ্টির (বহুবচন) বিন্যাসই বুঝতে হবে। ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে সমাসনিষ্পন্ন পদ থেকে বোঝা যায় না সমাসের অন্তর্গত সমস্ত পদে একবচন না বহুবচন আছে। অতএব পাঠককে কুন্তকের ব্যাখ্যাকেও আবার বহুবচন হিসাবে ব্যাখ্যা করে নিতে হবে। অর্থাৎ কাব্যে ব্যবহৃত সমস্ত বাক্যগুলি একসঙ্গে যেভাবে সাজানো হয়েছে সেই গঠন বা structure-ই হচ্ছে 'বন্ধ' বা বিন্যাস। কারিকায় 'বাক্য' কথাটি সযত্নে এড়িয়ে গিয়ে ব্যাখ্যার সময় সেটি আমদানি করে লেখক অসতর্ক পাঠককে সহজেই বিভ্রান্তির দিকে ঠেলে দিয়েছেন। হঠাৎ মনে হতে পারে কুন্তকও বুঝি আলাদা আলাদা বাক্য বা শ্লোককেই কাব্য মনে করেন, বুঝি কাব্যের সামগ্রিক রূপটি তাঁর কাছেও অনাবিষ্কৃত। কিন্তু পাঠক যদি এই ভুল করেন তবে কুন্তকের প্রতি তিনি অবিচারই করবেন। কারণ কুন্তকের কাব্যবিচার ও কাব্যবোধ যে বাক্য বা শ্লোকবিশেষের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, তিনি যে অব্যবহিত প্রসঙ্গ বা context-য়ের সঙ্গে মিলিয়েই শ্লোক বা কাব্যাংশের স্বাদ অনুভব করতেন তারও প্রমাণ আছে। এই কারিকারই বৃত্তি বা টীকা অংশে কুন্তক ভবভূতির 'মালতীমাধব' নাটকের পঞ্চম অঙ্ক থেকে একটি কাব্যাংশ উদ্ধৃত করে সঙ্গে সঙ্গে তার অব্যবহিত প্রসঙ্গও সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন—

অসারং সংসারং পরিমুষিতরত্নং ত্রিভুবনং
নিরালোকং লোকং মরণশরণং বান্ধবজনম্।

অদর্পং কন্দর্পং জননয়ননির্মাণ সফলং
জগজ্জীর্ণারণ্যং কথমসি বিধাতুং ব্যবসিতঃ॥

অত্র কিল কুত্রচিৎ প্রবন্ধে কশ্চিৎ কাপালিকঃ কামপি কান্তাং ব্যাপাদয়িতুম্ অধ্যবসিতো ভবন্নেবম্ অভিধীয়তে। অর্থাৎ কোনো এক কাপালিক কোনো এক কান্তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়ে এই কথাগুলি বলছে, ইত্যাদি। দেখা যাচ্ছে কুন্তক এ বিষয়ে অবহিত যে, উদ্ধৃত কাব্যাংশ সমগ্র কাব্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে আস্বাদন করা যায় না। উদ্ধৃত শ্লোকে বা উক্তিতে শুধু বাচ্যবাচক অর্থই নয় সমগ্র ঘটনা ও নাটকীয় পরিবেশ-জনিত বিশেষ অনুভবটিও ধরা পড়েছে এবং তা বাদ দিলে ঐ শ্লোকের তাৎপর্য অনেকখানিই নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। কুন্তক আরো বলতে চান যে 'বন্ধ' বা বাঁধুনি হচ্ছে শিল্পসম্মত ফর্ম, আর সেই বাঁধুনির আসল গিরোটি হচ্ছে 'বক্রকবিব্যাপার'—বক্র, কারণ শাস্ত্রে, গ্রন্থে বা অভিধানে প্রদত্ত প্রচলিত অর্থ বা ধারা থেকে পৃথক। নতুন কিছু সৃষ্টি করাই কবির কাজ এবং এই কবিকৃতি বা 'কবিব্যাপার' হচ্ছে "শাস্ত্রাদিপ্রসিদ্ধ-শব্দার্থোপনিবন্ধব্যতিরেকী"। কুন্তক স্পষ্টই বুঝেছিলেন যে কবিব্যাপার একটি চ্যালেঞ্জ, যা গ্রথিত ও গৃহীত তাকে বিপর্যস্ত করেই কাব্যের অগ্রগতি, যা প্রচলিত এবং প্রসিদ্ধ তাকে অতিক্রম করাই কাব্যের দুরূহ সাধনা।

কাব্যের সমগ্রতা বা ইউনিট সম্বন্ধে কুন্তক সচেতন। শুধু তাই নয়, এই ইউনিটের পরিচয় যে তার স্বয়ম্ভর প্রাণবত্তায় এটিও কুন্তক বুঝেছিলেন। নবম শ্লোকে তিনি বলেছেন, শব্দ ও অর্থ একত্রে যে কাব্যসৌন্দর্য সৃষ্টি করে তা বাইরে থেকে চাপানো কোনো নিষ্প্রাণ অলঙ্কার নয়, তা জীবন্ত দেহকোষের মতো অর্গ্যানিক বা ভিতর থেকে সৃষ্ট এক অবিভাজ্য সৌন্দর্য। শব্দ বলতে শুধু একটি পদ নয়, "সমুচিতসমস্তসামগ্রীকঃ"—কাব্যের অন্তর্গত সব বাক্যের সমাহার বুঝতে হবে। আর অর্থ হচ্ছে, কুন্তকের ভাষায় "সহৃদয়াহ্লাদকারিস্বস্পন্দসুন্দরঃ"। 'সহৃদয়' বা 'আহ্লাদকারী' এগুলি পুরোনো কথা, কিন্তু 'স্বস্পন্দ' কথাটির মধ্যে বেশ একটু নূতনত্ব আছে। কাব্যের সৌন্দর্য বাইরের উপর নির্ভরশীল নয়, কাজেই অলঙ্কার এখানে অপ্রধান। স্বাভাবিক সৌন্দর্যের মতো কাব্যের সৌন্দর্য সহজাত অর্থাৎ কবিকল্পনার সামগ্রিক ফলশ্রুতি। এটি আরো পরিস্ফুট হয়েছে যখন কুন্তক সার্থক দৃষ্টান্ত হিসাবে মেঘদূত থেকে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন—

ভর্তুর্মিত্রং প্রিয়মবিধবে বিদ্ধি মামম্বুবাহং
তৎ সন্দেশাদ্ হৃদয়নিহিতাদাগতং ত্বৎ সমীপম্।
যো বৃন্দানি ত্বরয়তি পথি শ্রাম্যতাং প্রোষিতানাং
মন্দ স্নিগ্ধৈর্ধ্বনিভিরবলাবেণিমোক্ষোৎসুকানি॥

বলা বাহুল্য, এই শ্লোকটি সমগ্র মেঘদূতের context থেকে আলাদা করে কোনো অর্থই বহন করবে না। ভর্তা, মিত্র এবং অবিধবা—প্রত্যেকেই মেঘদূত কাব্যের অভিশপ্ত যক্ষের সঙ্গে সম্বন্ধিত। বেণিমোচনে উৎসুক পথিকদলকে বিরহী যক্ষের কামনা-গূঢ় হৃদয়ের চোখ দিয়েই দেখতে হবে। মেঘদূতের এই শ্লোক বা অন্য যে কোনো শ্লোক বিচ্ছিন্নভাবে পাঠককে আনন্দ তো দূরের কথা কোনো সংলগ্ন অর্থই উপহার দিতে পারে না। কাজেই 'স্বস্পন্দসুন্দর' বলতে কাব্যের সমগ্র ইউনিটের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে প্রত্যেক অংশের যে সহজ অনায়াস অর্থগৌরব তাকেই বুঝতে হবে। শব্দ বলতে সমগ্র ইউনিট এবং অর্থ বলতে অর্গ্যানিক সৌন্দর্য। শেষে কুন্তক তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে বলেছেন, কাব্যের শব্দই বলো আর অর্থই বলো, শুধু শব্দ বা শুধু অর্থ যতোই 'স্পন্দসুন্দর' হোক না কেন তা কাব্যের অন্বিষ্ট নয়, এগুলির মধ্য দিয়ে কাব্যের বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য—এক কথায় বক্রত্ব—সম্পাদিত হওয়া চাই :—"এবং শব্দার্থয়োঃ প্রসিদ্ধস্বরূপাতিরিক্তমন্যদেব রূপান্তরমভিধায় ন তাবন্মাত্রমেব কাব্যোপযোগি, কিন্তু বৈচিত্র্যান্তরবিশিষ্টমিতি।" শব্দ এবং অর্থ উভয়ক্ষেত্রেই প্রচলিতকে অতিক্রম করে নূতন নূতন বৈচিত্র্য সৃষ্টিই সার্থক কাব্যের সাধনা, এইটিই বক্রোক্তি। মহিমভট্ট কুন্তকের ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

প্রসিদ্ধং মার্গমুৎসৃজ্য যত্র বৈচিত্র্যসিদ্ধয়ে।
অন্যথৈবোচ্যতে সোঽর্থঃ সা বক্রোক্তিরুদাহৃতা ॥

তিনি আরো বলেছেন, "শাস্ত্রাদিপ্রসিদ্ধশব্দার্থোপনিবন্ধব্যতিরেকি যদ্ বৈচিত্র্যং তন্মাত্র-লক্ষণং বক্রত্বং নাম কাব্যস্য জীবিতম্ ইতি।" কাব্যে প্রসিদ্ধ অবয়বের অতিরিক্ত 'আরো কিছু'র কথা ধ্বন্যালোকেও আছে, কিন্তু ধ্বনিকার বড্ড বেশি লাবণ্যের ভক্ত বলে এই 'আরো কিছু'র মধ্যে তথাকথিত অকাব্যিক অপেলবের উপস্থিতি ভাবতে পারেন নি—

প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব
বস্তুস্তি বাণীষু মহাকবীনাম্।
যত্তৎ প্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তম্
আভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু ॥

প্রসিদ্ধের অতিরিক্ত বলতে ধ্বনিকার যা বোঝেন কুন্তক কিন্তু হুবহু তা বোঝাতে চান না। দশম শ্লোকে কুন্তক বলেছেন—

উভাবেতাবলঙ্কার্যৌ তয়োঃ পুনরলঙ্কৃতিঃ।
বক্রোক্তিরেব বৈদগ্ধ্যভঙ্গীভণিতিরুচ্যতে ॥

আগেই বলা হয়েছে সৌন্দর্য হবে ভিতর থেকে সৃষ্ট, তাহলে অলঙ্কার কোথা থেকে আসছে? আর অলঙ্কার ছাড়া কাব্য অলঙ্কৃতই বা হচ্ছে কীভাবে? কুন্তক 'অলঙ্কার' কথাটির প্রচলিত অর্থই বদলে দিতে চান, যেমন সম্ভবত আরিস্ততল্ করেছিলেন 'মিমেসিস'-য়ের ক্ষেত্রে। কুন্তকের কথা হচ্ছে, কাব্য অলঙ্কৃত হবে বৈ কি। কারণ কাব্য কখনোই আটপৌরে বা দীন হবে না। কিন্তু কাব্যের অলঙ্কার বা ঔজ্জ্বল্য ভামহাদি কথিত কতকগুলি গিল্টিসোনার জড়োয়া গহনা নয়, তা হচ্ছে বক্রোক্তি। বক্রোক্তি একটি 'ভণিতিপ্রকার', রুয্যকের ভাষায় 'উক্তি বৈচিত্র্য'; তা কাব্যদেহের কোনো অংশ বা কোনো প্রত্যঙ্গের উপর চাপানো রূপক, যমক প্রভৃতি অলঙ্কার নয়:—"বক্রোক্তিঃ প্রসিদ্ধাভিধানব্যতিরেকিনী বিচিত্রৈবাভিধা। কীদৃশী—বৈদগ্ধ্যভঙ্গী-ভণিতিঃ। বৈদগ্ধ্যং বিদগ্ধভাবঃ কবিকর্মকৌশলং তস্য ভঙ্গী বিচ্ছিত্তিঃ, তয়া ভণিতিঃ **বিচিত্রৈবাভিধা বক্রোক্তি**রিত্যুচ্যতে।"

'অলঙ্কার' শব্দটিই খানিকটা বিভ্রান্তিকর। 'বক্রোক্তি' কথাটিও কম গোলমেলে নয়। যেমন অনেকের মতে 'বক্রোক্তি' একটি বিশেষ অলঙ্কারেরই নাম। আবার যেখানে কোনো অলঙ্কারই নেই সেই স্বভাবোক্তিকে অনেকে বলেছেন অলঙ্কার। আলঙ্কারিকদের এই সর্বগ্রাসিতা, সব কিছুকেই অলঙ্কার বলে চালানোর চেষ্টা, খুবই স্বাভাবিক। কারণ যাঁরা মনে করেন অলঙ্কার ছাড়া কাব্য হয় না তাঁরা যেখানেই কাব্য দেখেন সেখানেই অলঙ্কারও দেখতে বাধ্য, জোর করে হলেও তা দেখবেন। অলঙ্কার-সর্বস্বতার এই অচলপ্রতিষ্ঠ দাবীকে না দমিয়ে বক্রোক্তির আলাদা স্বাধীন সত্তা প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তাই কুন্তক অলঙ্কারবাদীদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ। তিনি বলেছেন, অলঙ্কৃত ও অনলঙ্কৃত এইভাবে কাব্যকে দুটি পৃথক ভাগে ভাগ করা যায় না। কারণ কাব্য সর্বদাই অলঙ্কৃত এবং সর্বাংশেই অলঙ্কৃত। অলঙ্কৃতি যদি কাব্যের একটি সহজাত গুণ হয় তাহলে তাকে আবার অলঙ্কৃত করার প্রশ্নই ওঠে না। আর স্বভাবোক্তিকে যদি অলঙ্কার বলা হয় তবে তো কাব্যিক উক্তিমাত্রেই স্বভাবোক্তি নামক অলঙ্কারের উপর আরোপিত আরো একটি অলঙ্কার। আর সেক্ষেত্রে কোনো অলঙ্কারই বিশুদ্ধ অলঙ্কার থাকতে পারে না, হয়ে দাঁড়ায় সঙ্কর বা মিশ্র অলঙ্কার, এবং সেক্ষেত্রে অলঙ্কারের সংজ্ঞাই যায় বদলে।

কবিকর্ম বা কবিব্যাপারই বক্রত্বসাধক! বক্রতা কতোরকমের হওয়া সম্ভব? নিশ্চয়ই অসংখ্য, অনন্ত। কারণ তা না হলে নিত্যনূতনের সম্ভাবনা থাকে কী করে? তাই কুন্তক যখন আর সব অলঙ্কার-বৈয়াকরণদের মতো এক দুই করে বক্রত্বের সুনির্দিষ্ট প্রকারভেদ ঘোষণা করেন তখন আমরা একটু হতাশ হই—

কবিব্যাপারবক্রত্বপ্রকারাঃ সম্ভবন্তি ষট্।
প্রত্যেকং বহবো ভেদাস্তেষাং বিচ্ছিত্তিশোভিনঃ ॥

কাব্যের বক্রত্ব যদি "প্রসিদ্ধপ্রস্থানব্যতিরেকিবৈচিত্র্য"ই হয়, তাহলে কাব্যে আলঙ্কারিক-নির্দিষ্ট এমন কি কুন্তক-কথিত প্রকারও বর্জিত হতে পারে এবং হওয়াই প্রার্থিত। কুন্তক নিজে 'পদবক্রতা' বিচার প্রসঙ্গে স্বীকার করেছেন যে বক্রতা সৃষ্টিতে হাজার হাজার বৈচিত্র্য সম্ভব। পদের অন্তর্গত বক্রতার—বর্ণবিন্যাসবক্রত্ব, পদপূর্বার্ধবক্রত্ব, পর্যায়বক্রত্ব—তবু আলাদা আলাদা পরিচয় দেওয়া সম্ভব, কিন্তু সমগ্র পদের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য অসংখ্য। আর পদবক্রতার পর যখন বাক্যবক্রতার কথা ওঠে তখন কুন্তক নিজেই বলেন যে বাক্যবক্রতা হাজার রকমের হতে পারে—

বাক্যস্য বক্রভাবোঽন্যো ভিদ্যতে যঃ সহস্রধা।
যত্রালঙ্কারবর্গোঽসৌ সর্বোঽপ্যন্তর্ভবিষ্যতি ॥

এখানে কুন্তক খুব সাহসের সঙ্গে এবং বেশ জোর দিয়েই বলছেন যে আলঙ্কারিকরা যেসব অলঙ্কার নিয়ে এত মাথা ঘামিয়েছেন সেগুলি তো বটেই, তাছাড়াও আরো হাজার হাজার অজ্ঞাত ব্যাপার বক্রতার মধ্যেই পড়ছে। অলঙ্কার হিসাবে আলাদা-ভাবে অনুভূত না হয়ে সব মিলিয়ে কাব্যে বক্রতার অন্তর্ভুক্ত হিসাবে অনুভূত হচ্ছে। কাব্যের স্বাদ গ্রহণ করবার সময় আমরা অলঙ্কার উপভোগ করি না, বক্রত্বই অনুভব ও উপভোগ করি। কাব্যে অলঙ্কারের পৃথক সত্তা বজায় থাকে না; থাকলে তা উৎকৃষ্ট কাব্য হয় না। সব অলঙ্কারই কাব্যের মধ্যে কাব্যের বক্রতার মধ্যে লীন হয়ে যায়, পৃথক সত্তা বজায় রাখে না—"অলঙ্কারবর্গঃ··· ···সর্বঃ সকলোঽপ্যন্তর্ভবিষ্যতি অন্তর্ভাবং ব্রজিষ্যতি পৃথক্‌ত্বেন নাবস্থাপ্যতে।" অলঙ্কারসন্ধানের মতো রচনার অংশবিশেষে বক্রোক্তিসন্ধান করতে কুন্তক উৎসাহী নন। কুন্তকের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সংস্কৃত সমালোচনার ক্ষেত্রে যা সবিশেষ চমকপ্রদ তা হচ্ছে রচনাকে একটি সম্পূর্ণ ইউনিট হিসাবে গণ্য করার সোচ্চার দাবী। আলঙ্কারিকগণ বাক্য ও বাক্যাংশ, শ্লোক ও শ্লোকার্ধকেই ইউনিট বলে গণ্য করতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং সেজন্য প্রায়শই কাব্যের মণিমুক্তাখণ্ডের সৌন্দর্যকেই তাঁরা কাব্যের সৌন্দর্য বলে ধরে নিতেন। কুন্তক বললেন, না শুধু বিশেষ বিশেষ অংশে কেন, বক্রতা সমগ্র রচনায়, এবং নাটকের ক্ষেত্রে সমগ্র নাটকে, প্রকীর্ণ থাকে একথা ভুললে চলবে না। আলাদা আলাদা অলঙ্কার বা figure of speech-য়ে নয় সমগ্র কাব্যিক পরিস্থিতি এবং নাটকে সমগ্র মনস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতির মধ্যে বক্রত্ব থাকে—

বক্রভাবঃ প্রকরণে প্রবন্ধে বাস্তি যাদৃশঃ।
উচ্যতে সহজাহার্য সৌকুমার্যমনোহরঃ ॥

শ্লোকের মধ্যে না থাকলেও কুন্তক ব্যাখ্যার মধ্যে নাটকের প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন এবং তাতে তাঁর বক্তব্য বুঝতে আমাদের খুব সুবিধা হয়েছে। তিনি বলেছেন, "বক্রভাবো বিন্যাসবৈচিত্র্যং প্রবন্ধৈকদেশভূতে প্রকরণে যাদৃশোঽস্তি যাদৃগ্ বিদ্যতে প্রবন্ধে বা **নাটকাদৌ** সোঽপ্যুচ্যতে কথ্যতে।" প্রকরণবক্রতার উদাহরণ হিসাবে রামায়ণে মায়ামারীচ-কর্তৃক রামের কণ্ঠ অনুকরণ করে আর্তনাদ এবং সীতা কর্তৃক ভর্ৎসিত লক্ষ্মণের মৃগানুসরণ দৃশ্যের উল্লেখ করা যায়। মহাকবি বাল্মীকি এই দৃশ্যের বর্ণনায় শুধু অলঙ্কৃত শ্লোকপরম্পরা রচনা করেই যদি ক্ষান্ত থাকতেন তবে সীতা ও লক্ষ্মণের মনস্তত্ত্ব এবং দ্বিধাদ্বন্দ্ব—যা এখানে সবচেয়ে আকর্ষক—একেবারেই পরিস্ফুট হতে পারতো না। নাটকের ক্ষেত্রে এটি আরো স্পষ্ট, কারণ চরিত্র ও সজ্ঘাত কয়েকটি বাক্যে বা শ্লোকে নয় সমগ্র নাটকে বা দৃশ্যে বিধৃত থাকে। সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে ব্যাপ্ত এই যে বিশেষ কবিকৃতি, এরই নাম বক্রতা বা বক্রোক্তি। প্রকরণ বক্রতার সমর্থনে কুন্তক রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গ থেকে একটি সুন্দর শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন—

পূর্বানুভূতং স্মরতা চ যত্র
কম্পোত্তরং ভীরু। তবোপগূঢ়ম্।
গুহাবিসারীণ্যতিবাহিতানি
ময়া কথঞ্চিদ্ ঘন-গর্জিতানি ॥

এই শ্লোকটির মধ্যে রাম প্রেয়সী সীতার কাছে তাঁর নিজের বিরহকালের স্মৃতি রোমন্থন করছেন। বনবাসকালে মেঘের গর্জন শুনলে সীতা কম্পিতবক্ষে এসে রামকে জড়িয়ে ধরতেন। সীতাকে হারিয়ে রাম যখন বনে বনে ঘুরতেন তখন পাহাড়ের গুহায় প্রতিধ্বনিত মেঘগর্জন শুনে তাঁর মনে পড়তো সীতার সেই আলিঙ্গনের কথা এবং তিনি অতি কষ্টে হৃদয়াবেগ সংযত করতেন। এই পূর্ব-অনুভূতি স্মরণের ব্যাপারটি শুধু রামের নয়; পাঠকের কাব্য উপভোগের পক্ষেও পূর্ব-প্রসঙ্গ স্মরণ একটি আবশ্যিক পূর্বশর্ত। একথা স্পষ্ট যে উদ্ধৃত শ্লোকটির চার দেয়ালের মধ্যে সম্পূর্ণ আবদ্ধ থেকে কোনো পাঠকই এর স্বাদ গ্রহণ করতে পারেন না, তাঁকে বেরিয়ে আসতে হয় এই শ্লোকের বাইরে, বিচরণ করতে হয় সমগ্র কাব্যের বনে প্রান্তরে। কারণ কাব্যিক বক্রোক্তি সমগ্র কাব্যেই বিস্তৃত।

কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গে হরের আশ্রমে অকাল বসন্তের দৃশ্যটিও স্মরণ করা যেতে

পারে। অকালবসন্তের প্রসঙ্গ যুক্ত না করলে এই বর্ণনার অধিকাংশই একেবারে সহজ বা স্বভাবোক্তি—

মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে
পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্তমানঃ।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং
মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ॥

কিন্তু এখানে মধুকর এবং কৃষ্ণসার কাব্যিক বক্রোক্তির ফলেই পতঙ্গ ও পশুজগৎ অতিক্রম করে সমগ্র প্রাণীজগৎ এমন কি নর ও দেবজগৎকেও প্রতিভাসিত করছে, শুধু বনাশ্রমেই নয় সমগ্র বিশ্বচরাচরে যে প্রেমধর্ম বিরাজমান সেই প্রেমেরই অভিষেক এই সর্গে। ঠিক এর বিপরীত বর্ণনা হিসাবে এসেছে নন্দীর তর্জনীবিক্রমে অকস্মাৎ স্তব্ধ বনস্থলীর চিত্র—

নিষ্কম্পবৃক্ষং নিভৃতদ্বিরেফং
মূকাণ্ডজং শান্তমৃগপ্রচারম্।
তচ্ছাসনাৎ কাননমেব সর্বং
চিত্রার্পিতারম্ভমিবাবতস্থে॥

এই শ্লোকটিরও বাইরে এসে না দাঁড়ালে এর চমৎকারিত্ব আমরা কতোটুকু উপভোগ করতে পারি? যার শাসনে বনস্থল চিত্রবৎ নিস্পন্দ সেই নন্দীর নামটি পর্যন্ত এখানে অনুচ্চারিত। শুধু শ্লোকটির মধ্যে আবদ্ধ না থেকে এর ঠিক আগে যে উচ্ছল বন-বর্ণনা রয়েছে তার সঙ্গে মিলিয়ে তবেই এই স্তব্ধতা উপভোগ করা যাবে—

অসূত সদ্যঃ কুসুমান্যশোকঃ
স্কন্ধাৎ প্রভৃত্যেব সপল্লবানি।
পাদেন নাপৈক্ষত সুন্দরীণাং
সম্পর্কমাসিঞ্জিতনূপুরেণ॥

সদ্যঃ প্রবালোদ্গমচারুপত্রে
নীতে সমাপ্তিং নবচূতবাণে।
নিবেশয়ামাস মধুর্দ্বিরেফান্
নামাক্ষরাণীব মনোভবস্য॥

বর্ণ প্রকর্ষে সতি কর্ণিকারং
দুনোতি নির্গন্ধতয়া স্ম চেতঃ।

প্রায়েণ সামগ্রবিধৌ গুণানাং
পরাঙ্মুখী বিশ্বসৃজঃ প্রবৃত্তিঃ।

বালেন্দুবক্রাণ্যবিকাশভাবাদ্
বভুঃ পলাশান্যতিলোহিতানি।
সদ্যো বসন্তেন সমাগতানাং
নখক্ষতানীব বনস্থলীনাম্ ॥

লগ্নদ্বিরেফাঞ্জনভক্তিচিত্রং
মুখে মধুশ্রীস্তিলকং প্রকাশ্য।
রাগেণ বালারুণ কোমলেন
চূত প্রবালোষ্ঠমলঞ্চকার ॥

মৃগাঃ পিয়ালদ্রুমমঞ্জরীণাং
রজঃকণৈর্বিঘ্নিত দৃষ্টিপাতাঃ।
মদোদ্ধতাঃ প্রত্যনিলং বিচেরু-
র্বনস্থলীমর্মরপত্রমোক্ষাঃ ॥

কালিদাস যেন রবীন্দ্রনাথের গান 'আগুন লেগেছে বনে বনে' বহু শতাব্দী আগেই গেয়ে রেখেছেন। অশোক তরু কুসুমে কুসুমে রঙীন হয়ে উঠেছে। আম্রপল্লবে বসেছে ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর, কর্ণিকাফুলের স্বর্ণ আভায় বন জলজ্বল করছে। অতি লাল পলাশকুঁড়িগুলি নখক্ষতের মতো বনস্থলীনায়িকার অঙ্গে প্রত্যঙ্গে চিহ্ন এঁকে দিয়েছে, সূর্যালোকে আমের মুকুলগুলি রঞ্জিত ঠোঁটের মতো রক্তিম দেখাচ্ছে, এবং মদোদ্ধত হরিণের দুরন্ত ছুটাছুটিতে সারা বন হয়ে উঠেছে মুখরিত, মর্মরিত। এখানে সমগ্র সর্গকে ইউনিট হিসাবে গণ্য না করলে নিষ্কম্পবৃক্ষ বা নিভৃত দ্বিরেফের প্রকৃত সৌন্দর্য আমাদের অগোচরেই থেকে যাবে।

আলঙ্কারিকরা আলাদা আলাদা শ্লোককে নির্দোষ, নিখুঁত, সর্বাঙ্গসুন্দর অলঙ্কারে পরিণত করাকেই কাব্যের চরম উৎকর্ষ জ্ঞান করেছেন, যেমন কাব্যপ্রকাশে মম্মট বলেছেন, "অদোষৌ সগুণৌ সালঙ্কারৌ শব্দার্থৌ কাব্যম্।" কিন্তু সর্বাঙ্গসুন্দরতার স্বর্ণহরিণ আলঙ্কারিকদের লক্ষ্য হলেও স্রষ্টিধর কবিদের তা একমাত্র অন্বিষ্ট হয় নি। উপরে উদ্ধৃত শ্লোকের মধ্যেই কালিদাসের সাবধান বাণীটি রয়েছে—'প্রায়ই দেখা যায় স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টা কোনো গুণকেই একেবারে সম্পূর্ণ নিটোল নিখুঁত করে সৃষ্টি করতে চান না।' বিশ্বস্রষ্টা যে-বিষয়ে পরাঙ্মুখ কাব্যস্রষ্টা কি সেখানে সাহসী হবেন?

আলঙ্কারিকরা নিজেরা স্রষ্টা নন বলেই সৃষ্টির জীবনময়তা ও দোষগুণ সমন্বিত ঐক্যের চমৎকারিত্বের উপর জোর না দিয়ে ব্যবচ্ছেদকের মতো কাব্যের গুণগুলিকে আলাদা আলাদা করে তুলে পরখ করতে চান। কুন্তকের কাব্যতত্ত্বে এই প্রথার সজ্ঞান বিরোধিতা রয়েছে। কাব্যের প্রতিটি শ্লোককে নির্দোষ হতে হবে এমন ধনুকভাঙা পণ তাঁর নয়। উপরের উদ্ধৃত অংশে কালিদাসের আরেকটি শ্লোকে 'বক্র' কথাটিই ব্যবহৃত হয়েছে। ঈষৎ-বক্র পলাশকুঁড়ি দিয়েই কবি বক্রোক্তি রচনা করেছেন। বাঁকা পলাশকুঁড়ির সঙ্গে রমণীদেহে নখক্ষতের তুলনা ইংরেজি সাহিত্যে ডান ও মেটা-ফিজিক্‌ল কবিদের কাব্যই মনে পড়ায়। ডানের কবিতা প্রায়ই নিখুঁত নয়, এক ধরনের অসংশোধিত কর্কশতা বা অমসৃণতা দিয়ে তাঁর কাব্যের শরীর নির্মিত। কিন্তু সার্থক বক্রোক্তির জন্য সমগ্রভাবে তাঁর কাব্য আমাদের মুগ্ধ করে। কুন্তকের সামনে যদি ডানের সমধর্মী কোনো বড় সংস্কৃত কবির দৃষ্টান্ত থাকতো তবে 'বক্রোক্তিজীবিত' গ্রন্থের বক্তব্য নিঃসন্দেহে আরো অকুণ্ঠ এবং ঋজু হতে পারতো এবং কুন্তককে আমরা অনায়াসেই সংস্কৃত সমালোচকদের মধ্যে 'আধুনিক' নন্দনতাত্ত্বিক বলতে পারতাম।

সংস্কৃত সমালোচকরা কাব্য ও কাব্যের রস সম্বন্ধেই বেশি আলোচনা করেছেন। কবির কথা প্রায় বাদ পড়ে গেছে। ফলে এই সব আলোচনা থেকে কবি বিশেষ উপকৃত হন না। কিন্তু কুন্তকের বক্তব্য কবি-সচেতন। কবি তৎপর হবেন বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে, এই কথাটি বারেবারে উচ্চারিত হয়েছে কুন্তকের আলোচনায়। 'বৈচিত্র্য' কথাটি কুন্তকের বিশেষ প্রিয়, আর বৈচিত্র্য কবিপ্রতিভারই সৃষ্টি,— "যৎ কিঞ্চনাপি বৈচিত্র্যং তৎসর্বং প্রতিভোদ্ভবম্।" তিনি আরো বলেছেন—

অক্লেশব্যঞ্জিতাকূতং ঝগিত্যর্থসমর্পণম্।
রস বক্রোক্তিবিষয়ং যৎ প্রসাদঃ স কথ্যতে॥

রসসৃষ্টির নামে কেবল পুঁথিগত অলঙ্কারের প্রয়োগ নয়, স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত কাব্যসৃষ্টি —এইভাবে অলঙ্কারবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে লঘু করে তিনি বক্রত্বের উপর বিশেষ জোর দিতে চান। কাব্য হবে স্বতঃস্ফূর্ত, অক্লেশে ব্যঞ্জিত স্বাভাবিক সৃষ্টি। কাব্য শৃঙ্গার প্রভৃতি রস সৃষ্টি করবে, কিন্তু এজন্য কাব্যে সব অলঙ্কারের মধ্যে যা গোচর সেই 'বক্রোক্তি' অবশ্যই থাকবে। কুন্তকের আলোচ্য বিষয় শুধু রস নয় রসবক্রোক্তি, বড় জোর রসাশ্রিত বক্রোক্তি। কাব্যের লক্ষ্য যদি রসসৃষ্টি হয় তবে কবির লক্ষ্য হবে বক্রোক্তি সৃষ্টি করা, কারণ রচনা রস দিয়ে হয় না, হয় কথা দিয়ে, বক্রোক্তি দিয়ে। পাঠক মনশ্চর্বণজাত রস উপভোগ করেন, কিন্তু কবিকে মনোযোগী হতে হয় বক্রোক্তিতে। বৈচিত্র্যগুণের প্রশংসা করে কুন্তক বলেছেন, প্রতিভাধর কবিরা বিনা

আয়াসেই বৈচিত্র্য বা বক্রতা সৃষ্টি করতে পারেন। অলঙ্কারের পর অলঙ্কার প্রয়োগ করে কবি যেখানে বিরক্ত অসন্তুষ্ট সেখানে স্বাভাবিক প্রতিভাবলে উক্তির মধ্যে বৈচিত্র্য ঘটিয়ে অর্থাৎ বক্রত্ব সৃষ্টি করে তিনি হঠাৎ রচনাকে এক মুহূর্তেই খুব উঁচু স্তরে নিয়ে যেতে সমর্থ হন—

অলঙ্কারস্য কবয়ো যত্রালঙ্করণান্তরম্।
অসন্তুষ্টা নিবধ্নন্তি হারাদের্মণিবন্ধবৎ ॥
রত্নরশ্মিচ্ছটোৎসেক ভাস্বরৈর্ভূষণৈর্যথা।
কান্তা শরীরমাচ্ছাদ্য ভূষায়ৈ পরিকল্প্যতে ॥
যত্র তদ্বদলঙ্কারৈর্ভ্রাজমানৈর্নিজাত্মনা।
স্বশোভাতিশয়ান্তঃস্থমলঙ্কার্যং প্রকাশ্যতে ॥
যদপ্যনূতনোল্লেখং বস্তু যত্র তদপ্যলম্।
উক্তিবৈচিত্র্যমাত্রেণ কাষ্ঠাং কামপি নীয়তে ॥

বৈচিত্র্য বা বক্রোক্তি কাব্যের জীবিত অর্থাৎ প্রাণ; বক্রোক্তির ফলেই কাব্য প্রাণবন্ত হয় এবং অর্গ্যানিক সত্তা লাভ করে। বিচিত্র বা বৈচিত্র্যমার্গ হচ্ছে বক্রোক্তি সাধনের পথ, কিন্তু এই পথ অনুসরণ করা সহজ নয়, কেবলমাত্র প্রতিভাবান কবিরাই এই কঠিন পথে সঞ্চরণ করতে পারেন—

বিচিত্রো যত্র বক্রোক্তি বৈচিত্র্যং জীবিতায়তে।
পরিস্ফুরন্তি যস্যান্তঃ সা কাপ্যতিশয়াভিধা ॥
সোঽতিদুঃসঞ্চরো যেন বিদগ্ধকবয়োগতাঃ।
খড়্গধারাপথেনেব সুভটানাং মনোরথাঃ ॥

বক্রোক্তিই কাব্যের প্রাণ অলঙ্কারবাদীরা কখনই একথা মানতে প্রস্তুত নন। তাদের মতে বক্রোক্তি বড়জোর একটি অলঙ্কার মাত্র। রুদ্রট বলেছেন, বক্রোক্তি তো একটা অলঙ্কার, তাকে কাব্যের প্রাণ কী করে বলা যায়? "বক্রোক্তিঃ কাব্যজীবিতম্ ইতি বক্রোক্তিজীবিতকারোক্তম্ অপি পরাস্তং বক্রোক্তেরলঙ্কাররূপত্বাৎ।" তিনি বক্রোক্তিকে শব্দালঙ্কার হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে যখন 'কাকু' হয় অর্থাৎ আলাদা উচ্চারণে একই কথার আলাদা মানে হয়, অথবা একই কথার দুটি আলাদা অর্থ থাকার ফলে—যেমন শ্লেষে—বিভ্রম সৃষ্টি হয়, তখনই বক্রোক্তি ঘটছে বলা যেতে পারে। পরবর্তী কালে বামনও বক্রোক্তিকে একটি অলঙ্কার বলেই ব্যাখ্যা করেছেন, তবে শুধু শব্দালঙ্কার না বলে তিনি একে অর্থালঙ্কার হিসাবেও গ্রহণ করেছেন। ভামহ কিন্তু কাব্যের এই কৃত্রিম শব্দচাতুর্যের উপর খুব একটা গুরুত্ব দেন নি। বক্রোক্তি

বলতে তিনি কাব্যের বিশেষ একটি গুণ বা অলঙ্কার বোঝেন নি। অতিশয়োক্তি অলঙ্কারকে তিনি বক্রোক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেখেছেন কিন্তু বক্রোক্তিকে অলঙ্কারের অন্তর্ভুক্ত করেন নি। তার কারণ তিনি বক্রোক্তি বলতে এমন একটি বৈশিষ্ট্য বোঝেন যা না থাকলে কোনো অলঙ্কারই অলঙ্কার হয় না—

সৈষা সর্বৈব বক্রোক্তিরনয়ার্থো বিভাব্যতে।
যত্নোঽস্যাং কবিনা কার্যঃ কোঽলঙ্কারোঽনয়া বিনা॥

ভামহ শুধু কাব্যে নয়, মহাকাব্য নাটক আখ্যায়িকা, এক কথায় সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রেই, বক্রতার উপস্থিতি অত্যাবশ্যক বলে মনে করেছেন। প্রচলিত সংজ্ঞায় অতিশয়োক্তিকে "লোকাতিক্রান্তগোচরং বচঃ" বলা হয়। আবার বক্রোক্তিও এক হিসাবে "লোকাতিক্রান্তগোচরং বচঃ", কারণ প্রচলিত উক্তি থেকে তা স্বতন্ত্র। এক অর্থে সব কাব্যই অতিশয়োক্তি—অতিমাত্রায় ফাঁপিয়ে বলা, বাড়িয়ে বলা (Hyperbole, Exaggeration) এই অর্থে অতিশয় নয়, বিশিষ্ট, ভিন্ন বা আকর্ষক এই অর্থে অতিশয়। আরিস্ততল যেমন ট্রাজেডির ক্ষেত্রে spoudaious কথাটি ব্যবহার করেছিলেন সেই রকম। বক্রতা অতিশয়োক্তি সৃষ্টি করে বৈ কি, কিন্তু তাকে 'অতিশয়োক্তি অলঙ্কার' মাত্র বলা যায় না। আটপৌরে স্বাভাবিক উক্তি থেকে যা আলাদা তাই অতিশযোক্তি, কাব্যের পক্ষে যেটি বিশেষ প্রয়োজনীয়। সেই জন্যই ভামহ স্বভাবোক্তিকে কাব্যের চত্বরে ঢুকতেই দিতে চান না, এমন কি অলঙ্কার হিসাবেও নয়। দণ্ডী সব উক্তিকেই দুভাগে ভাগ করেছেন—স্বভাবোক্তি ও বক্রোক্তি। স্বভাবোক্তি হচ্ছে আদ্যা অলঙ্কৃতি বা আদি অলঙ্কার যেমন প্রসাধনে ফাউণ্ডেশন ক্রীম। প্রকৃতপক্ষে এটি নিরলঙ্কৃতিই। বক্রোক্তি সম্বন্ধে দণ্ডী বলেন—

শ্লেষঃ সর্বাসু পুষ্ণাতি প্রায়ো বক্রোক্তিষু শ্রিয়ম্।
দ্বিধা ভিন্নং স্বভাবোক্তির্বক্রোক্তিশ্চেতি বাঙ্ময়ম্॥

এখানে দণ্ডী 'শ্লেষ' কথাটি বিশেষ একটি অলঙ্কার অর্থে প্রয়োগ করেন নি, বক্রোক্তির বিশিষ্ট ঝোঁক বুঝাতেই কথাটি ব্যবহার করেছেন।

রসের আলোচনা কুন্তকে খুবই ক্ষীণ। তাঁর মতে রচনায় বক্রত্ব সম্পাদনের বিশেষ একটি ধরনের নামই রসসৃষ্টি অর্থাৎ রস বক্রোক্তিরই অন্তর্গত। অলঙ্কারবাদ, রীতিবাদ, রসবাদ, ধ্বনিবাদ এইভাবে দেখতে গেলে বলা যায় কুন্তক অলঙ্কারবাদের ধারা থেকেই নিজের থিওরি প্রতিষ্ঠা করতে অগ্রসর হয়েছেন। তিনি রস ধ্বনি ইত্যাদির বদলে বক্রত্বের কথা বলেছেন যা প্রায় সব অলঙ্কারেরই সবনাম। কুন্তক 'চমৎকার' বা চমৎকারিত্ব কথাটি অনেকবার ব্যবহার করেছেন। রসবাদের সঙ্গে 'চমৎকার' ব্যাপারে

কুন্তকের কিছুটা সংযোগ দেখা যায়। রসবাদীদের ভাষায় চমৎকারের প্রতিশব্দ হচ্ছে 'লোকোত্তর আহ্লাদ' যা কাব্যে সর্বত্র অনুভূত হয়, "রসে সারশ্চমৎকারঃ সর্বত্রাপ্যনুভূয়তে।" চমৎকার কী? যাতে চিত্তের প্রসার ঘটে, যা বিস্ময় জাগায়, "চমৎকারশ্চিত্ত-বিস্তাররূপো বিস্ময়াপরপর্যায়ঃ।" বিস্ময়সৃষ্টি কুন্তকেরও ঈপ্সিত। তাঁর কাছে 'চমৎকার' এবং বৈচিত্র্য প্রায় সমার্থক, আর বৈচিত্র্যই বক্রোক্তির মূল কথা। কাব্যের প্রাণ বক্রোক্তি, বক্রোক্তির প্রাণ বৈচিত্র্য। কুন্তকের বক্তব্য অনেকটা এইরকম—অলঙ্কার আছে কি নেই, রস আছে কি নেই, ধ্বনি আছে কি নেই, কোনো বিশেষ রীতি আছে কি নেই এটিই সবচেযে বড় কথা নয়, বক্রোক্তি ঘটছে কিনা সেইটেই প্রধান বিবেচ্য।

কুন্তকের বক্রোক্তিবাদে রসের বিশুদ্ধিরক্ষার কোনো দায়দায়িত্ব নেই। ফলে শিল্পে একাধিক রসের সহাবস্থান এবং একাধিক রসের যৌগিক সংমিশ্রণও তিনি মেনে নেন। কাব্যের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধিবাদের তিনি বিরোধী, কারণ কাব্য নির্দোষ না হয়েও পাঠকের মনে চমৎকারিত্বের অনুভূতি ঘটাতে পারে এবং কাব্য হিসাবে সার্থক হতে পারে। শুধু একাধিক রসের নয়, কাব্যে দোষ ও গুণের সহাবস্থিতিও সম্ভব। ট্রাজেডি ও কমেডির সহাবস্থিতির স্পষ্ট নির্দেশ না থাকায় নব্যক্লাসিক ইয়োরোপিঅ সমালোচকরা ট্রাজি-কমেডি বা নতুন ধরনের নাটক বিচারে খুব মুশকিলে পড়তেন। ভারতবর্ষে ভরত ও পরবর্তী শিল্প সমালোচকরা রসের বিশুদ্ধি বিষয়ে এতটাই নিশ্চিত ছিলেন যে মিশ্ররসের কোনো কল্পনা তাঁরা করেন নি। অথচ দেখি সঙ্গীতশাস্ত্রে মিশ্ররাগরাগিনীর উপস্থিতি ও প্রয়োগ সম্বন্ধে সঙ্গীতশিল্পী ও শিল্পসমালোচকগণ সম্পূর্ণ অবহিত। সাহিত্যে কুন্তকের বক্রোক্তিবাদ এ ব্যাপারে আধুনিক রুচির খুব কাছাকাছি। কারণ কাব্যে কোনো একটি বিশুদ্ধ রসসৃষ্টিতে তিনি উৎসাহী নন এবং একে কাব্যের অন্বিষ্ট বলেও মনে করেন না। যেভাবেই হোক বক্রোক্তি সৃষ্টিই কাব্যের মূল কথা। এই বক্রোক্তি সৃষ্টির কৌশলকেই তিনি বলেন 'কবিকৌশল'। রসবৎ ও রসবিহীন কোনটিতেই তাঁর আপত্তি নেই, রসগোল্লা এবং কেইক উভয়ই তাঁর কাছে গ্রাহ্য, এবিষয়ে তাঁর ডেসার্ট একটু বেশি উদার। 'প্রবন্ধবক্রতা' ও 'প্রকরণবক্রতা'র উপর তিনি যেমন বিস্তারিত আলোচনা করেছেন আর কেউ তেমন করেন নি। এই যে সমগ্রতার উপর দৃষ্টি এবং সমগ্র শিল্পের ঐক্যের স্বার্থে একই রসের পুনঃপুনরাবৃত্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এটি কুন্তকের অনন্যসাধারণ সাহসিকতার পরিচায়ক। নাটকের ক্ষেত্রে নতুন নতুন সারপ্রাইজ সৃষ্টির জন্য অঙ্গীরসের মধ্যেও বৈচিত্র্য ঘটাতে হবে এবং প্রবন্ধ অর্থাৎ আখ্যানাদিতেও অঙ্গীরস বা প্রারম্ভিক মূল রস বর্জন করে সম্পূর্ণ অন্য রস দিয়ে

সমাপ্তি ঘটানো যাবে, যদি তাতে রচনায় বৈচিত্র্য বা চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করা যায়। যেমন 'বেণীসংহার' নাটকে মহাভারতের কাহিনী অবলম্বিত হলেও মূলের শান্তরস বর্জন করে নাটকে বীররস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। খুব সহজেই আমরা প্রাচীন গ্রীক নাটকের কথা স্মরণ করতে পারি। অয়েসখুলস, সফক্লেস ও ইউরাইপিদেস অনেক সময় একই কাহিনী বা কিংবদন্তী অবলম্বন করে নাটক রচনা করেছেন, কিন্তু প্রত্যেকেই স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গি এবং নিজ নিজ প্রতিভা, কবিকল্পনা বা 'কবিব্যাপার' অনুযায়ী নতুন নাটক এবং নতুন সারপ্রাইজ সৃষ্টি করেছেন। বলা যায়, প্রত্যেকেই বিশেষ সুখানুভূতি অর্থাৎ 'বিচ্ছিত্তি' 'বৈচিত্র্য' বা 'বক্রোক্তি' সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন। কালিদাস রামায়ণ অবলম্বনে রঘুবংশ রচনা করলেও নতুন করে বক্রোক্তি সৃষ্টি করতে পেরেছেন বলেই তিনি সার্থক কবি। স্বভাবোক্তি ও পুনরুক্তি উভয়েরই বিপরীত বক্রোক্তি, অনু-কৃতিরও বিপরীত বক্রোক্তি যেহেতু বক্রোক্তি হচ্ছে কাব্যিক সৃষ্টিশীল বৈচিত্র্য। রস, ধ্বনি প্রভৃতি সব কিছুই কবি কাজে লাগান বক্রোক্তি বা বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য। কুন্তক ধ্বনিকেই কাব্যের সার বা আত্মা মনে করেন না, ধ্বনি কাব্যের একটি অঙ্গ হতে পারে এইমাত্র। তাঁর মতে ধ্বনি হচ্ছে বক্রোক্তির—বিশেষ করে উপচারবক্রতার—অন্তর্গত। কাব্যের মধ্যে ধ্বনি সর্বব্যাপী বা universal নয়। বস্তুধ্বনি, রসধ্বনি, অলঙ্কারধ্বনি এগুলি সম্বন্ধে কুন্তক অবহিত, কিন্তু ধ্বনিই কাব্যের সব, একথা তিনি মানেন না।

এমন অনেক কাব্য বা টুকরো কবিতা আছে যার মধ্যে রস বা ব্যঞ্জনা সৃষ্টির কোনো উদ্দেশ্যই কবির নেই, কবির একমাত্র উদ্দেশ্য বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা, মনোযোগ আকর্ষণ করা, পাঠককে চমকিত ও চমৎকৃত করা। ধ্বনিকার এ ধরনের কাব্যকে খুব নিকৃষ্ট ধরনের কাব্য মনে করেন, কারণ এতে ব্যঞ্জনা হয় খুব সামান্য নয় একেবারেই নেই ; ধ্বনিকার এদের 'গুণীভূত ব্যঙ্গ' ও 'চিত্র' এই নামে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে 'চিত্রকাব্য' কাব্য নয়, কাব্যের অনুকৃতি মাত্র। যেখানে রসের ব্যঞ্জনা নেই সেখানে কাব্যের কাব্যত্ব কী থেকে আসে ? মম্মটের মতে 'উক্তি-বৈচিত্র্য' থেকে ;—"যত্র তু নাস্তি রসস্তত্রোক্তিবৈচিত্র্যমাত্রপর্যবসায়িনঃ।" তার মানে বৈচিত্র্য অন্য সব কিছুর চেয়ে ব্যাপক। যেখানে ব্যঞ্জনা নেই, অলঙ্কার নেই, সেখানেও বৈচিত্র্য আছে বা থাকতে পারে। মম্মট তো বলেছেন "বৈচিত্র্যমলঙ্কারঃ", বৈচিত্র্যই অলঙ্কার এবং ভামহের মতো মম্মটও অতিশয়োক্তিকে অলঙ্কারের প্রাণ বলে বর্ণনা করেছেন—"অতিশয়োক্তিরেব প্রাণত্বেনাবতিষ্ঠতে, তাং বিনা প্রায়েণালঙ্কারত্বাযোগ্যত্বাৎ।" যা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে পারে না তা অলঙ্কারই নয়। বক্রোক্তি ও অতিশয়োক্তিকে

আলাদা অলঙ্কার বলে চিহ্নিত করার যে চেষ্টা হয়েছে তার মূলে আছে অভ্যাসের দাসত্ব। অতিশয়োক্তিকে অলঙ্কার বলা আর উক্তির আতিশয্য অর্থাৎ কাব্যিক আতিশয্য, অতিরিক্ততা, বৈশিষ্ট্য বা অভিনবত্বকে কাব্যের প্রাণ বলা নিশ্চয়ই এক কথা নয়। বক্রোক্তিকে অলঙ্কার বলা এক কথা আর উক্তির বক্রতা অর্থাৎ শিল্পসম্মত বিপর্যয় বা transformationকে কাব্যের প্রাণ বলা সম্পূর্ণ আলাদা কথা। কোনো কোনো কাব্যে বা কাব্যের কোনো কোনো জায়গায় অতিশয়োক্তি বা বক্রোক্তি আবিষ্কার করা এবং তাকে অলঙ্কার বলে উল্লেখ করা এক কথা, আর সব কাব্যে এবং কাব্যের সর্বত্র অতিশয়োক্তি বা বক্রোক্তির উপস্থিতি দাবী করা সম্পূর্ণ অন্য জিনিষ। এই দ্বিতীয় দাবী উত্থাপন করাই কুন্তকের অনন্যতা।

যাঁরা কাব্যকে অলঙ্কারসর্বস্ব ভাবেন তাঁরা কবির দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মাথা ঘামান না। তাঁরা যেন কাব্যবিচারে বড্ড বেশি অবজেকটিভ এবং তাঁদের বিচার অনেকটাই যান্ত্রিক। বক্রোক্তিবাদের বৈশিষ্ট্য এই যে এতে সাবজেকটিভ দিকের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই কুন্তকের সহমর্মী রুয্যক সহজেই বলতে পারেন, "কবিপ্রতিভোত্থাপিতে সন্দেহে সন্দেহালঙ্কারঃ"—সন্দেহের অস্তিত্ব আছে বলেই 'সন্দেহ অলঙ্কার' নয়, কবি প্রতিভা থেকে উদ্ভূত বলেই সন্দেহ 'সন্দেহ অলঙ্কার', অর্থাৎ কাব্যিক বৈশিষ্ট্য যুক্ত না হলে শুধু 'সন্দেহত্ব'ই অলঙ্কার হবার পক্ষে যথেষ্ট নয। এই বৈশিষ্ট্য আসে কবির বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তা, কল্পনা, প্রতিভা এবং বক্রতাসৃষ্টির কুশলতা থেকে। 'ভ্রান্তিমৎ' অলঙ্কারের ক্ষেত্রেও তেমনি বলা যায়, সাদৃশ্য থেকে ভ্রান্তি সৃষ্টি হলেই যে ভ্রান্তিমৎ অলঙ্কার হবে, তা নয, তার পিছনে কবিপ্রতিভার স্পর্শও থাকা চাই। এই স্পর্শই সাধারণ উক্তিকে বক্রোক্তিতে পরিণত করে, বাক্যকে কাব্যে রূপান্তরিত করে দেয়। যেমন জয়রথ বলেন, "সাদৃশ্যেঽপি কবিপ্রতিভোত্থাপিতস্যৈব অলঙ্কারত্বম্।" অলঙ্কার তখনই যথার্থ অলঙ্কার যখন তা কবির বক্রোক্তিসৃষ্টির পরিপোষক। বিচ্ছিত্তি, বৈচিত্র্য বা চমৎকারিত্ব বক্রোক্তিরই বৈশিষ্ট্য এবং এর মূলে রয়েছে কবিপ্রতিভা বা কবিকর্ম। জগন্নাথ বলেন, "চমৎকারিত্বং চালঙ্কারসামান্যলক্ষণং প্রাপ্তমেব।' বিচ্ছিত্তির প্রকাশ ঘটে নানাভাবে, নানা আঙ্গিকে, এবং এই সব বিভিন্ন প্রকাশকে বিভিন্ন অলঙ্কার নামে চিহ্নিত করার চেষ্টা হয়ে থাকে। কিন্তু কবিপ্রতিভা অনন্তসম্ভাবনাময়। কারণ প্রচলিত অলঙ্কারের তালিকা অতিক্রম করার ক্ষমতাও কবি রাখেন এবং কোনো অলঙ্কার ছাড়াও কাব্যসৃষ্টি করতে পারেন। কবিপ্রতিভার এই অন্তহীন সম্ভাবনার কথা ব্যক্তিবিবেকের টীকাকার স্বীকার করে বলেছেন, "তথা চ শব্দার্থয়োর্বিচ্ছিত্তিরলঙ্কারঃ, বিচ্ছিত্তিশ্চ কবিপ্রতিভোল্লাসরূপত্বাৎ কবিপ্রতিভোল্লাসস্যচানন্ত্যাদ্ অনন্তত্বং

ভজমানা ন পরিচ্ছেত্তুং শক্যতে।" অনন্ত সম্ভাবনা রয়েছে বলেই বিচ্ছিত্তিকে নিঃশেষে বর্ণনা করা অসম্ভব।

যাঁরা কাব্যের সামগ্রিক তাৎপর্যকে বড করে দেখেন তাঁরা কবিপ্রতিভার উপর জোর না দিয়ে পারেন না। কাব্যবিচারে প্রায়ই দোষ ও গুণের যোগবিয়োগ ফল নির্ণয়ের চেষ্টা দেখা যায়। কিন্তু কাব্যকে আলঙ্কারিকদের ভাষায় 'নির্দোষ' হতেই হবে এমন কথা কোনো যুগের কোনো প্রকৃত কাব্যরসিকই বলবেন না। যিনি কাব্যের দ্বারা অভিভূত, চমৎকৃত, তিনি কাব্যের খুঁটিনাটি দোষ উপেক্ষা করেন। আমরা যাকে ভালবাসি তার দোষ দেখি না, তার দোষ সম্বন্ধে উদাসীন বা অচেতন থাকি। যিনি কাব্য ভালবাসেন তিনি দোষগুণ মিলিয়েই কাব্য ভালবাসেন। কোনো কবিতা যখন আমাদের ভাল লাগে তখন 'নির্দোষ' বলেই যে আমাদের ভাল লাগে তা নয়, তার মধ্যে কাব্যগুণ বা চমৎকারিত্ব আছে বলেই, বক্রত্ব রয়েছে বলেই, ভাল লাগে। নিখুঁত বা পারফেক্ট কাব্য খুঁজতে বা বাছতে গেলে হযতো কাব্যই আমরা খুঁজে পাবো না। তাছাডা যিনি শক্তিধর কবি তিনি তথাকথিত দোষকেও কাব্যে গুণে পরিণত করতে জানেন। ইংলণ্ডের মেটাফিজিক্‌ল কবিরা ছিলেন এই ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত। কাব্য অনুভবসিদ্ধ। কাজেই কাব্য যে উপায়েই হোক শ্রোতা বা পাঠকের মনে প্রার্থিত অনুভূতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেই হল। এমন কি অর্থহীন শব্দ প্রয়োগ করেও কবি কখনো কখনো এই অনুভব সৃষ্টি করে থাকেন। অতএব সদোষ-নির্দোষের চুলচেরা বিচারের উপর যে-কাব্যতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত তা খুব নির্ভরযোগ্য হয না।

ঔচিত্য-অনৌচিত্যের প্রসঙ্গ অবতারণা করেও সংস্কৃত সমালোচকগণ কখনো কখনো নিজেদেব বিধাযকের আসনে বসিয়েছেন। কিন্তু কাব্য যখন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে সমর্থ হয তখন কোনটা উচিত আর কোনটা অনুচিত এই প্রশ্ন আপনা থেকেই অন্তর্হিত হযে যায়। রসগঙ্গাধর-রচয়িতা জগন্নাথ বলেছেন, "অনৌচিত্যং তু রসভঙ্গ-হেতুত্বাৎ পরিহরণীয়ম্। ভঙ্গশ্চ পানকাদিরসাদৌ সিকতাদিনিপাতজনিতেবারুন্তুদতা। তচ্চ জাতিদেশকালবর্ণাশ্রমবয়োঽবস্থা প্রকৃতিব্যবহারাদেঃ প্রপঞ্চজাতস্য তস্য তস্য যল্লোকশাস্ত্রসিদ্ধমুচিতদ্রব্যগুণক্রিয়াদিতদ্ভেদঃ।" অনৌচিত্যদোষ ঘটলে রসভঙ্গ হয় অতএব তা বর্জনীয়। পানক প্রভৃতি রসের মধ্যে বালুকণা পড়লে যেমন তা পীড়া-দায়ক হয়, রসভঙ্গ ঘটলেও তেমনি হয়ে থাকে। এই জগতে জাতি, দেশ, কাল, বর্ণ, আশ্রম, বয়স, অবস্থা, প্রকৃতি, ব্যবহার প্রভৃতি অনুযায়ী লোকশাস্ত্রসম্মত যে যে সমুচিত দ্রব্যগুণ ক্রিয়াদির প্রয়োগ দেখা যায় তার অন্যথা হলে ঐ দোষ ঘটে। জগন্নাথ উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, "জাত্যাদেরনুচিতং যথা গবাদেস্তেজোবলকার্যানি পরাক্রমাদীনি,

সিংহাদেশ্চ সাধুভাবাদীনি।" অর্থাৎ, জাতির ক্ষেত্রে অনৌচিত্যের উদাহরণ, শান্ত ও নিরীহ গবাদি পশুতে তেজস্বিতা ও বলশালিতা এবং সিংহাদি হিংস্র পশুতে সাধুভাব আরোপ করা। কিন্তু কাব্যপ্রতিভার বলে যে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাওয়ানো সম্ভব একথা রসগঙ্গাধর রচয়িতা ভুলে গেছেন। ইংরেজি মেটাফিজিক্‌ল কাব্যের চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্যই তো এই অ-সম বা বিষম বিষয়ের যৌগপত্য রচনা। সেখানে অনেকটা জোর করেই বিরোধী বা বিষম ভাবগুলিকে একসঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়—"the most heterogeneous ideas are yoked by violence together"। মেটাফিজিক্‌ল কবিদের সম্বন্ধে ডক্টর জনসন বলেন ;—"They cannot be said to have imitated anything, they neither copied nature nor life, neither painted the forms of matter, nor represented the operations of intellect. Their thoughts are often new but seldom natural"—মেটাফিজিক্‌ল কবিরা কোন কিছু অনুকরণ করেছেন তা বলা চলে না ; তাঁরা প্রকৃতি বা জীবনের হুবহু প্রতিলিপি তৈরি করেন নি, বস্তুর যথাযথ আকৃতিও চিত্রিত করেন নি, বা বুদ্ধিবৃত্তির ক্রিয়াকলাপেরও বর্ণনা দেন নি। তাঁদের চিন্তাধারা প্রায়ই নতুন, কিন্তু খুব কম ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক। প্রচলিত অর্থে অনুচিতকে উচিত হিসাবে প্রয়োগ করার মধ্যে যে নাটকীয়তা ও বিস্ময় আছে, প্রচলিত প্রত্যাশাকে অপূর্ণ রাখার মধ্যে যে চমক আছে, সেসম্বন্ধে কোনো প্রতিভাবান কবিই উদাসীন থাকতে পারেন না। গ্রীক নাটকে ক্লিতেম্‌নেস্ত্রা বা শেক্সপিঅর নাটকের লেডি ম্যাকবেথ ঠিক স্ত্রীলোকোচিত আচরণ করলে, অয়েদিপউস ও ইয়োকাস্তার সম্পর্ক শাস্ত্রসিদ্ধ সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে বিশ্বসাহিত্য যে দীন হত এবিষয়ে সন্দেহ নেই। ক্যাপুলেট ও মণ্টেগুদের ঔচিত্যের গণ্ডী ভাঙতে গিয়েই তো রোমিও ও জুলিয়েট বিশ্বনাটকের নায়ক নায়িকা। উচিত-অনুচিতের দীর্ঘ তালিকা তৈরি করার কী সার্থকতা যদি কাব্যের স্বার্থে সব অনুচিতই উচিত হয়ে উঠতে পারে? যাঁরা নতুন নতুন কাব্যসৃষ্টি চান তাঁদের উচিত প্রচলিতের প্রতি আনুগত্যের বদলে অপ্রচলিতের প্রতি ঔৎসুক্য সৃষ্টি করা। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে জয়দেব প্রভৃতি বিশিষ্ট কবি অলঙ্কারশাস্ত্রীদের নির্দেশিত ঔচিত্য—সহৃদয়সম্মত প্রচলিত আচার—মদমত্ত গজের মতোই ভেঙে ফেলেছেন। কিন্তু তবু তিনি বলতে চান যে জয়দেব প্রভৃতির এই দৃষ্টান্ত অন্য কবিরা যেন অনুসরণ না করেন :—"জয়দেবাভিস্তু গীতগোবিন্দাদিপ্রবন্ধেষু সকলসহৃদয়সম্মতোঽয়ং সময়ো মদোন্মত্তমতঙ্গজৈরিব ভিন্ন ইতি ন তন্নিদর্শনেনেদানীন্তনেন তথা বর্ণয়িতুং সাম্প্রতম্।" এমন কি আনন্দবর্ধন যিনি

ধ্বনিবিচারে এত সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন তিনিও শাসকের পিনাল কোডের মতো ঔচিত্যের ধারা আবৃত্তি করতে ছাড়েন নি। তাঁর মতে অনৌচিত্য ছাড়া রসভঙ্গের অন্য কোনো কারণ নেই, রসের পরম রহস্য হচ্ছে প্রসিদ্ধ ঔচিত্য নিবন্ধন—

অনৌচিত্যাদৃতে নান্যদ্‌রসভঙ্গস্য কারণম্‌।
প্রসিদ্ধৌচিত্যবন্ধস্তু রসস্যোপণিষৎ পরা॥

হয়তো কুন্তকের প্রভাবেই জগন্নাথ আনন্দবর্ধনের উক্তি উদ্ধৃত করেও আবার একটু সংশোধনী প্রস্তাব জুড়ে দিয়ে বলেছেন, কিন্তু যতোটুকু অনৌচিত্য রসের পোষক ততটুকু নিষেধ করার দরকার নেই, রসের প্রতিকূল হলেই শুধু তা নিষেধ করতে হবে: "যাবতা ত্বনৌচিত্যেন রসস্য পুষ্টিস্তাবত্তু ন বার্যতে, রসপ্রতিকূলস্যৈব তস্য নিষেধ্যত্বাদ্‌।" এই উক্তির মধ্যে যে স্ববিরোধ রয়েছে তা একটু চিন্তা করলেই ধরা পড়ে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে ঔচিত্যের কোনো স্থির সংজ্ঞা নেই, স্থায়ী সংজ্ঞা বা নির্দেশ দিয়ে সৎকবিকে নিরস্ত করা যায়ও না বা করলেও কোনো সুফল ফলে না। ঔচিত্যের বস্তুনিষ্ঠ বা অবজেকটিভ সংজ্ঞা নির্ণয় করার চেষ্টা পণ্ডশ্রম, যদিও সব কবি, সমালোচক ও আলঙ্কারিকেরই নিজের নিজের কাছে একটি সাবজেকটিভ ধারণা থাকে। এমন কি কোলরিজের মতো রোমান্টিক কবি-সমালোচকও কল্পনার কানুন বা rules of Imagination-য়ের কথা বলেছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে ভালোমন্দ, ঠিক-বেঠিক, উচিত-অনুচিতের ধারণা প্রধানত সাবজেকটিভ। স্পিনোজা বলেছেন, ভালো বলেই যে আমরা কোনো কিছু চাই তা নয়, আমরা চাই বলেই তা আমাদের ভালো লাগে। কিন্তু সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের কাব্যবিচার বা ভালো লাগার খতিয়ান ঘাঁটতে ঘাঁটতে মনে হয়, ভালো লাগা বলতে যে মানসোল্লাস সেটি এখানে একেবারেই অনুপস্থিত। হিমঘরে রাখা এই সব সমালোচনার মধ্যে এক ধরনের চিরন্তনত্ব হয়তো আছে, কিন্তু চিরনবীনত্বের স্পর্শ একেবারেই নেই। তাই যখন কুন্তকের মতো কোনো সমালোচক আবির্ভূত হয়ে নতুনকে অভিনন্দন জানান, নতুনত্বকে কাব্যের প্রাণ বলেন, তখন ঐতিহ্যবাদী আলঙ্কারিকরা হয়তো বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হন, কিন্তু আমরা চমকে উঠি, আমাদের মুখ থেকে আপনা থেকেই সাধুবাদ বেরিয়ে আসে। রসবিচারে যদি কোনো নির্ব্যক্তিক সর্বকালীন ঔচিত্য গ্রাহ্য হ'ত তাহলে কাব্যের নবীনত্ব বা চমকে দেবার ক্ষমতাই থাকতো না। এখানে আমরা ওয়র্ডসওয়র্থের লিরিক্যাল ব্যালাড্‌স-য়ের ভূমিকা (১৮০২) থেকে সামান্য একটু অংশের উল্লেখ করতে পারি। ওয়র্ডসওয়র্থ বলেছেন তিনি এমন অনেক উক্তি ব্যবহারে বিরত থেকেছেন

যেগুলি এমনিতে উচিত ও সুন্দর, কিন্তু নিকৃষ্ট কবিরা মূর্খের মতো সেগুলি বারবার ব্যবহার করে এমন করে দিয়েছেন যে এদের উল্লেখ করা মাত্র বিতৃষ্ণা জাগে এবং এদের অনুষঙ্গ আর কোনোমতেই পাঠককে অভিভূত করতে পারে না— 'I have ··· ··· abstained from the use of many expressions, in themselves *proper and beautiful, but which have been foolishly repeated by* bad poets, *till such feelings of disgust are connected with them* as it is scarcely possible by any art of association to overpower.' এমনিতে উপযুক্ত ও সুন্দর অর্থাৎ 'উচিৎ'— 'in themselves proper and beautiful'— কিন্তু এই ঔচিত্যসত্ত্বেও অবস্থান্তরে এরা শুধু বিতৃষ্ণাই সৃষ্টি করে এবং কাব্য হিসাবে একেবারে অকেজো ও ব্যর্থ হয়ে যায়। বারবার ব্যবহৃত হওয়ায় উচিতও কাব্যের পক্ষে অনুচিত হয়ে দাড়ায়। এখানেই বক্রোক্তির দাবী দুর্বার বলে মনে হয়। কাব্যের জন্য প্রযোজন পুনরুক্তি নয় বক্রোক্তি, উচিত উক্তিও নয় বক্রোক্তি, এক কথায় ঔচিত্য নয় বক্রত্ব।

সমালোচক টিলিয়ার্ড কবিতাকে সোজা ও বাঁকা— direct and oblique— এই দু'ভাগে ভাগ করেছেন। সোজা কবিতা হচ্ছে বক্তব্যপ্রধান যা অধিকাংশক্ষেত্রেই ছন্দোবদ্ধ গদ্য; আর বাঁকা কবিতা হচ্ছে ইঙ্গিতপ্রধান যা আসলে কাব্য। আর এই দুই বিপরীত মেরুর মাঝখানে রয়েছে বহু মধ্যবর্তী স্তর। টিলিয়ার্ড স্বীকার করেছেন যে সোজা কবিতা আসলে কবিতাই নয়—"The terms 'direct' and 'oblique' poetry are a false contrast. All poetry is more or less ***oblique :*** there is no direct poetry." (*Poetry Direct and Oblique*—E.M.W. Tillyard). অর্থাৎ বাক্যকে না বাঁকিয়ে কাব্য করা যায় না। শব্দের সোজা আঙুলে কাব্যের ঘি ওঠেনা, অতএব উক্তিকে বক্রোক্তিতে পরিণত করাই কবির কাজ। বক্রোক্তি সৃষ্টির জন্য নিশ্চয়ই বক্রদৃষ্টিও চাই। সরল সোজা দৃষ্টি হয়তো সাধকের বা বৈজ্ঞানিকের, কিন্তু একটু বঙ্কিম আড়চোখে দেখাই কবির দেখা। কবির চাহনি যেন ট্যারা চাহনি, প্রত্যক্ষ সোজা জিনিষকে বিশেষ তেরছাভঙ্গিতে দেখা। আধুনিক কাব্যের বেলায় এটি বিশেষভাবে সত্য। বক্রোক্তিজীবিতকার বলবেন, সব কাব্যের বেলাতেই একথা সত্য, কারণ সব সার্থক কবিতাই জন্মলগ্নে আধুনিক কবিতা। 'আধুনিক' না হয়ে কোনো সার্থক কাব্য বা শিল্প সম্ভবই নয়। হপকিন্স-য়ের কবিতার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে পল মারিয়ানি বলেছেন— 'One sometimes has to ***squint*** a little if he is to see the poems from Hopkins'

perspective' (Paul L. Mariani—*Commentary on the Poems of Hopkins*)। এই ট্যারা চোখে দেখাই বক্রদৃষ্টি। বক্রোক্তিবাদী বলবেন, শুধু হপকিন্স, ডান বা বিশেষজাতের কবির ক্ষেত্রেই নয় সব কবির সব সার্থক কবিতা সম্বন্ধেই 'বক্রদৃষ্টি' কথাটি খাটবে। কারণ কাব্যক্ষেত্রের উপর কবিমাত্রেরই দৃষ্টি বক্রী। এই দৃষ্টি আছে বলেই কবির পক্ষে নতুন নতুন সৃষ্টি সম্ভব। কবিকল্পনা বা imagination *প্রসঙ্গে কোলরিজ বলেছেন, কল্পনা দুই বিপরীত প্রক্রিয়ার মিলন ঘটায়*— 'the sense of novelty and freshness with old and familiar objects ; a more than usual state of emotion with more than usual order.' পুরোনো ও পরিচিতের উপর নতুনত্ব ও সজীবতার রং লাগানোর কথা বক্রোক্তিবাদীরাও বলেন।

নন্দনতত্ত্ব হিসাবে বক্রোক্তিবাদের সীমিতি এই যে এতে শুধু উক্তির কথাই আছে, কিন্তু কবির বিশ্বধ্যান বা ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুই বলা হয়নি। বক্রতা থেকে মনোহারিত্ব, আনন্দ বা রসের জন্ম হয় ঠিকই, কিন্তু বক্রতা কী থেকে জন্মায়, সমাজজীবনে রূপান্তর ও নতুন অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির সঙ্গে কাব্যের নবীন দৃষ্টিভঙ্গি বা বক্রতার সম্পর্ক কতোটুকু তা কুন্তক বলতে চেষ্টা করেননি। কাব্যের সামগ্রিকতা সম্বন্ধে কুন্তক সচেতন— এবং এটি তাঁর বিশিষ্টতা— কিন্তু কবির সামগ্রিক চেতনা যে তাঁর ব্যক্তিক বা সামাজিক সম্বন্ধ ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে, কুন্তকে এমন সম্ভাবনার উল্লেখ পযন্ত নেই। অধ্যাপক গ্রিয়ার্সন মেটাফিজিক্‌ল কাব্যের প্রশস্ত সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন— 'Metaphysical poetry, in the full sense of the term, is a poetry which, like that of the Divina Commedia, the De Natura Rerum, perhaps Goethe's Faust, has been inspired by a philosophical conception of the universe and of the role assigned to the human spirit in the great drama of existence' (H. J. C. Grierson—*The Background of English Literature and Other Collected Essays and Addresses*). মেটাফিজিক্‌ল কাব্যের বক্রতার সঙ্গে মেটাফিজিক্‌ল কবির বিশ্ববীক্ষায় যে বক্রতা তার কথাই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। মেটাফিজিক্‌ল কাব্যের কেন্দ্রীয় কবি হিসাবে সহজেই দান্তে বা ডানের নাম মনে আসে, কিন্তু বক্রোক্ত কাব্যের স্রষ্টা বলতে কোনো বিশেষ সংস্কৃত কবির কথা আমাদের মনে পড়ে না, এমন কোনো কবি নেইও। তাছাড়া আমরা যখন ডানের মেটাফিজিক্‌ল কাব্য বিচার করি তখন এলিজাবিথিঅ যুগের অন্ত্য পর্ব ও কবি ডানের

ব্যক্তিজীবনের পশ্চাৎপটের কথা বিশেষভাবে মনে রাখি। ইরেজি মেটাফিজিক্ল কাব্য প্রসঙ্গে সকলেই অভিনবত্বের প্রতি ঝোঁক বা passion for novelty-র কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সমালোচকরা বলতে ভোলেননি যে এই passion for novelty হচ্ছে 'one of the characteristics of an oversophisticated time' (Helen C. White— *The Metaphysical Poets*)। মেটাফিজিক্ল কাব্যে যে অতিরিক্ত আত্মসচেতনতা ও কবিকর্তৃক ইচ্ছাকৃত বক্রোক্তি চোখে পড়ে তাও যে সপ্তদশ শতকের পরিমণ্ডল থেকেই গৃহীত, একথাও বলা হয়েছে—'Certainly something self-conscious and deliberate comes into the art of the new century, and something of the old spacious freedom and casualness of less rigorous times is lost' (H. C. White)। ডানের বক্রোক্তিকে যখন পোষাকি চতুরতা বা স্মার্টনেস বলে বর্ণনা করা হয়েছে তখন সেই যুগের স্মার্ট পরিমণ্ডলের কথাও বলা হয়েছে—'The great bulk of Donne's verse was written with an eye to the smart world in which he aspired to play a conspicuous part.' (Ibid)।

নতুনত্বের মধ্যে যে মাধুর্য তা হয়তো অনেক সময় প্রচলিত অর্থে মাধুর্যই নয়, কিন্তু কাব্যে একঘেয়ে মিষ্টত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও নতুন মাধুর্য সৃষ্টি করে এবং সম্মোহ ভাঙার নতুন সম্মোহ থেকেই জন্ম নেয় বক্রোক্তি। কাব্য আনন্দ দেয়, একথা বললে সব বলা হয় না। তাহলে ক্রমাগত নতুন কাব্যের প্রয়োজনই হত না এবং নতুন কাব্য রচনার তাগিদও থাকতো না। কাব্য নতুন করে আনন্দ দেয় এবং নতুনভাবে আনন্দ দেয় অর্থাৎ নতুন ধরনের আনন্দ সৃষ্টি করে। পালাবদল শিল্পের একটি আবশ্যিক ক্রিয়া, একে লঘু করে দেখা চলে না। অতএব চিরন্তন কাব্যাদর্শ ঠিক করে বসে থাকলে তাতে আলঙ্কারিকদের বিচারাসন হয়তো অটল থাকে, কিন্তু কাব্যের কপালে জোটে শুধুই তিরস্কার। অলঙ্কারশাস্ত্রীরা যখন চরম উৎকর্ষ বা perfection-য়ের প্রবক্তা হন তখন তাঁরা কাব্যকে এমন এক মেঘলোকে উচ্চাসীন করেন যে তা আর ব্যবহার্য থাকে না। কাব্যের মধ্যে চমৎকারিত্ব তো থাকবেই, কিন্তু যদি একই ব্যঞ্জনের একই স্বাদের পুনরাবৃত্তি হতে থাকে তবে স্বাদ হয়ে ওঠে বিস্বাদ। অতএব চমৎকারিত্বের জন্যই বক্রোক্তি প্রয়োজন, কারণ বক্রোক্তির মধ্যে সেই বিদ্রোহ বা পালাবদল আছে যা কাব্যের নবীনত্ব বজায় রাখতে একান্ত প্রয়োজন। ডানের কবিতাবলী সম্পর্কে শ্রীমতী হোয়াইট বলেছেন—'They are a revolt against a litarary convention, one of the most brilliant rebellions known to English

literature, a revolt against what was restrictive and artificial and hackneyed and stale in that convention, it is true, but also a revolt against what was ideal and graceful in it'. দেখা যাচ্ছে, যা ideal এবং graceful তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সত্ত্বেও কাব্য হিসাবে তাদের রচনা ব্রিলিয়্যাণ্ট। তাহলে শুধু grace, শুধু ভাববিচ্ছিত্তির বাঁধাধরা শাস্ত্রীয় যোগ-বিয়োগ কাব্যসৃষ্টির ব্যাপারে সহায়ক তো নয়ই, অনেক সময় ক্ষতিকর।

বক্রোক্তিজীবিতকার তাঁর গ্রন্থের দ্বিতীয় উন্মেষে বাক্যের অবয়ব বা diction নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে বর্ণবিন্যাসবক্রতা, পর্যায়বক্রতা, উপচারবক্রতা, বিশেষণবক্রতা ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে আমার আরিস্ততল-যের 'কাব্যতত্ত্ব' গ্রন্থটির কথা মনে আসছে। অবশ্য বক্রোক্তি-বিচারের উপসংহারে আরিস্ততল-য়ের নাম উচ্চারণ করায় অনেকে হয়তো সন্দিগ্ধ হবেন। কারণ যাঁকে আমরা ক্লাসিক্ল সমালোচনার পুরোধা হিসাবে গণ্য করে থাকি তাঁর কাছে বিদ্রোহ, নবীনত্ব ইত্যাদির পোষকতা বা বক্রোক্তির সমর্থন আশা করা যায় না। কিন্তু আরিস্ততল কতোখানি উদার ও মুক্তমনা সমালোচক, কতো বড়ো সত্যান্বেষী তাত্ত্বিক তিনি, তা তাঁর পোয়েটিক্স গ্রন্থের দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদেই প্রমাণিত। তিনি লিখেছেন—'the Diction becomes distinguished and non-prosaic by the use of unfamiliar terms, i. e., strange words, metaphors, lengthened forms, and everything that deviates from the ordinary modes of speech ······ what helps most, however, to render the Diction at once clear and non-prosaic is the use of the lengthened, curtailed, and altered forms of words. Their deviation from the ordinary words will, by making the language unlike that in general use, give it a non-prosaic appearance. It is not right, then, to condemn these modes of speech, and ridicule the poet for using them, as some have done.' (Tr. Bywater).

মনে হবে কুন্তক যেন আরিস্ততল-য়ের এই পরিচ্ছদ থেকে পাঠ নিয়েই তাঁর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটি রচনা করেছেন। আরিস্ততল এবং কুন্তকের পাশাপাশি আমরা কবিবন্ধু রবার্ট ব্রীজেসকে লেখা হপকিন্সের বিখ্যাত উক্তিটি মিলিয়ে দেখতে পারি—'The effect of studying masterpieces is to make me admire and do

otherwise. So it must be on every original artist.' কুন্তকের ভাষায়, কাব্যোক্তি হবে 'পূর্বাবৃত্ত পরিত্যাগ নূতনাবর্তনোজ্জ্বলা'। এইভাবে কাব্যের ক্ষেত্রে চর্বিতচর্বণকে পরিহার করে নতুনকে আবাহন করার সাহস দেখিয়েছেন বলেই কুন্তক সংস্কৃত সমালোচকদের মধ্যে এক ঈর্ষণীয় স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত।

সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র

ভবতোষ দত্ত

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের নানা মহৎ কীর্তির অন্যতম সমালোচনাতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা। বঙ্কিমচন্দ্রের সময় থেকেই বাংলায় পূর্ণায়ত সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের সূত্রপাত হল। এর পূর্বে সাহিত্যতত্ত্বের প্রয়োজনও তেমন দেখা যায়নি। সাহিত্যের রূপ ও রীতি তার অন্তর্নিহিত প্রাণধর্ম। তার দূরপ্রসারী ব্যঞ্জনা-সৃষ্টির রহস্যে যখন সাহিত্যিক মগ্ন হয়ে যান তখন স্বভাবতই তার তত্ত্ববিশ্লেষণের বাসনাও দেখা যায়। এই কারণেই আধুনিক কালের প্রথম সার্থক কবি মধুসূদনের চিঠিপত্রে সাহিত্যরচনা সম্বন্ধে নানা কৌতূহলোদ্দীপক মন্তব্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রও নানা রচনাসূত্রে সাহিত্যসৃষ্টি সম্বন্ধে গভীর মন্তব্য করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র শুধু শিল্পী ছিলেন না, তিনি ছিলেন চিন্তাশীল মনীষী। রসবোধের সঙ্গে ভাবুকতার সমন্বয়ে তাঁর সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলি অতি উজ্জ্বল।

তত্ত্বচিন্তার দিক দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধগুলি যে বিশিষ্ট তার কারণ তিনি সাহিত্যসমালোচনায় মাপকাঠিরূপে ব্যবহার করেছিলেন চিরজীবী ক্লাসিক সাহিত্যকে। একদিকে কালিদাস-ভবভূতি-বাল্মীকি-ব্যাস অন্যদিকে শেক্সপীয়র-মিলটন তাঁর সম্মুখে সনাতন সাহিত্যাদর্শের অম্লান প্রতীক। সমালোচনা-সূত্রে বারবারই তিনি এঁদের সাহিত্যকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ ব্যবহার ক. .ছেন। তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা নবজাত বাংলা সাহিত্যের পথনির্দেশ করতেই তিনি চেয়েছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের যে মহৎ ঐশ্বর্য তাঁর সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয়েছিল, সেই তুলনায় বাংলা সাহিত্য ছিল দরিদ্র। আধুনিক সাহিত্যের অপরিসীম রূপবৈচিত্র্য, শ্রেণীগত সম্পূর্ণতা এবং জীবনাবেগের সংস্পর্শে এসে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি মঙ্গলকাব্য-কবিগান অধ্যুষিত বাংলা সাহিত্যের শূন্যতা বুঝতে পেরেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অব্যবহিত পূর্বে বাংলা স্মরণীয় সাহিত্যকীর্তি মধুসূদনের কাব্য। তার পূর্বে ভারতচন্দ্র এবং বৈষ্ণবপদাবলী। কিন্তু এ দুয়েরই পুনরনুসরণ আর সম্ভব নয়। ফলে বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা তখনও অনিশ্চিত। মধুসূদনের কাব্য সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মত দ্বিধাহীন নয়, একদেশদর্শীও নয়, বরং অতিমাত্রায় সতর্ক। স্বভাবতই বাংলা সাহিত্য তখনও নিশ্চিত এবং প্রত্যয়বান হয়ে ওঠেনি। এইজন্য বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে বাংলা সমালোচনাও ছিল অপরিপুষ্ট এবং আদর্শহীন। ইংরাজির প্রভাব আসার পূর্বে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রই ছিল আমাদের অবলম্বন, যদিও সংস্কৃত সাহিত্যের কল্পনার

সূক্ষ্মতা এবং সৌন্দর্য, তার রসরহস্য এমন কি বিষয়-বৈশিষ্ট্যও বাংলায় ছিল না। তথাপি ভাষাসাহিত্যের ক্ষেত্রেও অলঙ্কার-বিধানই ছিল মান্য। ভারতচন্দ্রের মতো উচ্চ-ক্ষমতা সম্পন্ন কবির কাব্য আস্বাদকালে অলঙ্কারশাস্ত্রের বিধানই প্রযোজ্য হয়েছে। রাধামোহন সেন সম্পাদিত 'অন্নপূর্ণামঙ্গল' কাব্যের টীকাপ্রসঙ্গে ভারতচন্দ্রের ভাষার মিল এবং শব্দপ্রয়োগের ত্রুটি দেখানো হয়েছে। ভারতচন্দ্র নিজেও তাঁর নিজের শিক্ষার বিবরণ দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছিলেন ব্যাকরণ-অভিধান-সাহিত্য-নাটক অলঙ্কার এবং সঙ্গীতশাস্ত্রের।

সংস্কৃত রসশাস্ত্রের পরিভাষা এবং পদ্ধতি মূলত অবলম্বন করে বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের জন্ম। বৈষ্ণবদের ধর্মাচরণ এবং তাদের রচিত পদ—দুইই ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। বৈষ্ণব পদ বস্তুত ধর্মাচরণেরই অঙ্গ হিসাবে গণ্য। পদাবলীর রচনা এবং আস্বাদনে ভক্তিশাস্ত্রের নিয়মগুলিই অনুসরণ করা হয়েছে। কৃষ্ণরতিই সর্বোত্তম রস উজ্জ্বল রসের স্থায়িভাব। ভক্তিচেতনায় স্থিতিলাভই কাব্যাস্বাদনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের অন্যান্য রসেরও লক্ষ্য এই ভক্তিভাবই। এ সকল কারণে বৈষ্ণব ধর্মে একটি নিজস্ব রস-সমালোচনা পদ্ধতি গড়ে উঠলেও প্রকৃত জীবনলীলামূলক সাহিত্যসৃষ্টিতে এর কোনো প্রযোজ্যতা নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব পর্যন্ত, এবং তাঁর পরেও, যাঁরা সংস্কৃত রসশাস্ত্রের আলোচনা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অথবা প্রয়োগ করেছেন তাঁরা বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের প্রসঙ্গ কখনই উত্থাপন করেননি। সাহিত্য মানবজীবনের বহু বৈচিত্র্যের রূপদান করে, ইহজীবনের সৌন্দর্য মাধুর্য সুখ দুঃখ বেদনা ব্যর্থতা চরিতার্থতার শিল্পসৃষ্টি করে থাকে। এই ঐহিক এবং সামাজিক উপলব্ধি-অনুভূতিগুলিকে অর্থহীন বা নিষ্প্রভ করে তোলা সাহিত্যের কাজ নয়। এই কারণে বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের গভীরতা যাই থাক, এর ব্যাপ্তি নেই। ফলে সাহিত্যের আলোচনা ও বিশ্লেষণে এর উপযোগিতা নেই। সংস্কৃত রসশাস্ত্রেও মানুষের হৃদয়ভাবকে নয়টি শ্রেণীতে মূলত ভাগ করলেও সঞ্চারী ভাবরূপে হৃদয়ভাবের আরও নানা মিশ্রণ ও জটিলতাকে স্বীকার করে। সামাজিক উপলব্ধির রসসৃষ্টিই তাতে ছিল লক্ষ্য। বাৎসায়নের গ্রন্থে বিদগ্ধ রসিকের যে লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে, বলা বাহুল্য সে কোনো ধর্মনিষ্ঠ বৈরাগ্যপ্রবণ চরিত্রের বর্ণনা নয়।

মধুসূদনের পূর্ব পর্যন্ত এখানে-ওখানে বাংলা কাব্যের যে সমালোচনা পাওয়া যায়, তাতে সংস্কৃত সমালোচনাই অনুসৃত, সে-সমালোচনাও রস-সমালোচনা নয়—অলঙ্কার সমালোচনা। মিল শব্দ ছন্দ প্রভৃতি বহিরঙ্গ আলোচ্য বিষয়গুলিই তাতে প্রধান। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের একটি মহৎ কীর্তি ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদ প্রভৃতি কবিদের জীবনী ও রচনাসংগ্রহ। তিনি নিজেও কবি। রচনাসংগ্রহের দ্বারা আমরা শুধু ঐতিহাসিক

কর্তব্য-সম্পাদনই আশা করি না, রসাস্বাদনের নমুনাও কিছু আশা করি। ঈশ্বর গুপ্ত কিছু সংস্কৃত জানতেন, প্রথাগত রীতিতে তিনি কাব্য পাঠ করেছিলেন। তিনিও ভারতচন্দ্র এবং নিধুবাবুর গানের আলোচনায় মিল শব্দব্যবহার ও ছন্দোবৈচিত্র্যের উল্লেখ করেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভিন্ন রসেরও নাম করেছেন যদিও গভীরতর সমালোচনাদৃষ্টিতে এই রস বস্তুত বর্ণিত ভাব ছাড়া কিছু নয়। ভাব রস হয়ে উঠতে পারল কিনা কিংবা সর্বজনীনতা অর্জন করতে পারল কিনা সেই আলোচনাই হত সত্যকার সমালোচনা। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত যে প্রণালীতে কাব্য আলোচনা করেছেন সেই প্রণালীই তখন পর্যন্ত সাধারণত প্রচলিত। সংস্কৃত কাব্যালোচনাতে পণ্ডিতগণ টোলে চতুষ্পা'ঠীতে এই প্রণালী অবলম্বন করতেন; তার প্রমাণ মধুসূদনের একটি স্মরণীয় ব্যঙ্গোক্তি—

'Some other Pundits, literary stars of equal magnitude say—হাঁ উত্তম উত্তম অলংকার আছে। মন্দ হয় নি।'

কাব্যালোচনায় অলংকারের প্রয়োগই প্রধান লক্ষ্য কি? মধুসূদন তাঁর চিঠিপত্রের মধ্যে স্থানে স্থানে সত্যকার কাব্যবোধের সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। এমন কি ঈশ্বর গুপ্তের রচনাতেও এর আকস্মিক সংকেত আছে। যেমন ভারতচন্দ্রের কাব্যকলার আলোচনা করেও তিনি বলেছেন—

'পদ্যের দ্বারা ইঁহার পাণ্ডিত্য, বিদ্যা, পরিশ্রম এবং যত্নের ব্যাপার যত প্রকাশ পাইয়াছে, দৈবশক্তির পরিচয় তত প্রকাশ পায় নাই, ফলতঃ যে পর্যন্ত ব্যক্ত হইয়াছে তাহাও সাধারণ নহে।'

কাব্যরচনায় পাণ্ডিত্য এবং দৈবশক্তির এই পার্থক্য সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। এই প্রসঙ্গেই তাঁর আর একটি মন্তব্য বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় আশ্রয় নেওয়াতেই ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনাচাতুর্য এবং বহিরঙ্গ পারিপাট্যে দোষশূন্য হয়েছিল—এই অভিমতে পরিপার্শ্বের সঙ্গে কবিচেতনার কার্য-কারণগত যোগাযোগের যে ইঙ্গিত আছে সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে তার কোনো সূত্র নেই, বরং বঙ্কিমচন্দ্র যে বলেছিলেন 'বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে বিশেষ বিশেষ নিয়মানুসারে বিশেষ বিশেষ ফলোৎপত্তি হয়। তেমনি সাহিত্যও দেশভেদে দেশের অবস্থাভেদে অসংখ্য নিয়মের বশবর্তী হইয়া রূপান্তরিত হয়'।—ঈশ্বর গুপ্তের মন্তব্য তারই পূর্বাভাস যেন সূচিত করে। অবশ্য এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত সেকালে প্রচলিত প্রত্যক্ষতাবাদের প্রভাবেই গঠিত, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত এ রকম কোনো তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যদর্শন যে প্রত্যক্ষতাবাদ থেকেই প্রভাবিত হয়েছিল তার কারণ শুধু বঙ্কিমের নিজস্ব অধ্যয়নই নয়, শিক্ষানীতিও তার একটা কারণ। বঙ্কিমের পূর্ব থেকেই য়ুরোপে প্রচলিত পজিটিভিজ্‌মের হাওয়া আমাদের দেশে আসতে আরম্ভ করেছে। হিন্দু কলেজে যে সব বাঙালি যুবক শিক্ষা গ্রহণ করত তারা প্রত্যক্ষতাবাদ প্রভাবিত তত্ত্ব দ্বারাই ইতিহাস সাহিত্য সমাজের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করত। তারই ফলে সামাজিক পরিবেশ, জনহিতসাধনের উদ্দেশ্য প্রভৃতির বিচার বিবেচনা সাহিত্যালোচনায় স্থান গ্রহণ করেছে। কিন্তু সাহিত্যকে বিশুদ্ধ আস্বাদনের বিষয় রূপে দেখেন, এরকম রসিকও বিরল ছিলেন না। হিন্দু কলেজের অধ্যাপক রিচার্ডসনের সাহিত্যালোচনা ও কাব্যপ্রীতি বহু ছাত্রকেই প্রভাবিত করেছিল, তাঁদের মধ্যে সুবিখ্যাত মাইকেল মধুসূদন দত্ত। রিচার্ডসনের একটি প্রবন্ধ সেকালের নবীন কবি ও সাহিত্যিকদের চিন্তার মূলে ছিল বলে অনুমান করি। প্রবন্ধটির নাম Poetry and Utilitarianism।* এই প্রবন্ধটি বেনথামের উপযোগিতাবাদী সাহিত্যচিন্তার তীব্র প্রতিবাদে লিখিত। রঙ্গলাল ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’ কাব্যের ভূমিকা রচনাকালে রিচার্ডসনের এই লেখার বক্তব্যকেই নিজের ভাষায় পরিবেশন করেছিলেন ; যদিও ‘কাব্য কি’—এই সংজ্ঞার জন্য তিনি দ্বারস্থ হয়েছিলেন সাহিত্যদর্পণেরই। বেনথাম কবিতাপাঠের আনন্দ এবং সাধারণ প্রমোদকে একই শ্রেণীতে ফেলেছিলেন। উত্তরে রিচার্ডসন কবিতার সূক্ষ্ম দৈবী আনন্দের এবং উচ্চতর সৌন্দর্যের কথা বলেন। অনুরূপ ভাবে রঙ্গলালও বলেন ‘কবিতার আর এক শক্তি তাহা আমাদিগের স্বাভাবিক অতি সূক্ষ্মতর ভাবসমূহকে সচেতন করিতে পারে। তদ্দ্বারা দয়া, করুণা, মমতা, প্রণয় প্রভৃতি মানসিক ধর্মসকল বৃদ্ধিযুক্ত হয় ও চিন্তা প্রভৃতি পরিকল্পনার বিশুদ্ধতা জন্মে।’ প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তাকেই মুখ্য উদ্দেশ্য না বললেও রিচার্ডসন বিশিষ্ট এবং উচ্চতর উপযোগিতার কথা বলেছিলেন। এই উপযোগিতা দিয়েই তিনি সাহিত্যের মান নির্ণয় করলেন। সাহিত্যেরও নীতি আছে, সে নীতিও সত্যমূলক—Genuine poetry is generally speaking not only essentially true, but essentially

* দ্রষ্টব্য D. L. Richardson, *Literary Leaves, Vol II*, Calcutta, 1840. এই প্রবন্ধের অনুষঙ্গ হিসাবে রিচাডসন আর একটি প্রবন্ধ লেখেন, ‘On the Influence of Poetry’ সেটিও এই গ্রন্থেই সংকলিত। এই দুই প্রবন্ধেই রিচার্ডসন বেনথাম এবং মিলকে (সম্ভবত জেমস মিল) একই সঙ্গে আক্রমণ করে বলেন when a philosopher talks in this way he deserves no mercy.

রঙ্গলাল রিচার্ডসনের প্রবন্ধের অনুবাদ করেননি শুধু বলেছেন ‘এতদ্দেশীয় লোকের শ্রীবর্ধনেচ্ছুক কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতে এই পরিচ্ছেদের কিয়দংশ লিখিত হইল।’

moral. সৌন্দর্য সত্য ও নীতির সমন্বয়প্রয়াস বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যধারণাতেও লক্ষ্য করা যায়।

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে বেথুন সোসাইটিতে রঙ্গলাল পড়লেন 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রস্তাব'। এতে দেশীয় কবিতার প্রতি অনুরাগের লক্ষণ ছিল, তবু এতে পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং রুচিবোধের পরিচয়ও ছিল। পদ্মিনী উপাখ্যানের ভূমিকাতে যেমন ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবের স্বীকৃতি আছে তেমনি সংস্কৃত আলংকারিক ভাবনাও তাতে বর্জিত হয়নি। তিনিও 'রচনাশক্তি'র উপরেই জোর দিয়েছেন। একমাত্র মধুসূদনেই দেখা যায় তাঁর মতামতে কোনো দ্বিমুখী আকর্ষণ নেই। রঙ্গলাল এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতো ইংরেজি সাহিত্যে শিক্ষিত ব্যক্তিরা দেশীয় সাহিত্যনীতি এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যনীতি—দুয়েরই টানে দ্বিধাগ্রস্ত। তেমনি আবার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও সংস্কৃত আলংকারিক পদ্ধতিতেই সাহিত্য সমালোচনা করেছেন। মনে হয় সাহিত্যসমালোচনাতে তিনি ছিলেন 'রীতিবাদী'। অথচ বহিরঙ্গ অলংকার সমালোচনা ব্যতিরেকেই তিনি যে কাব্যাস্বাদনে যথার্থ রসিক ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর মেঘদূত-সম্পাদনে এবং সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে শকুন্তলা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত গ্যেটের উক্তিতে। এই উক্তিটি রবীন্দ্রনাথের দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ার ফলেই সুপরিচিত হয়েছে। গ্যেটের এই শ্লোকটির উল্লেখ বাংলায় বিদ্যাসাগরই প্রথম করেন।

মধুসূদনের ও অন্যান্য সংস্কৃত নাটকের সমালোচনা উপলক্ষ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিবিধার্থ সংগ্রহে যে স্মরণীয় প্রবন্ধ লিখেছিলেন তাতেই বাংলা সাহিত্যে অ্যারিস্টটলীয় সাহিত্যনীতির আলোচনাও দেখা গেল। এ জন্য আজও তিনি বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের পথিকৃৎরূপে গণ্য। সংস্কৃত আলংকারিক পদ্ধতির যেটুকু উল্লেখ তিনি যুগপ্রয়োজনে করতে বাধ্য হয়েছিলেন সেটুকু বস্তুতই নিষ্ফল হয়েছে।* সার্থকতামণ্ডিত হয়েছে তাঁর চরিত্র প্লট ও অন্যান্য নাট্যলক্ষণ নির্ধারণপ্রয়াস। বঙ্কিমচন্দ্র উত্তরচরিতের উপসংহারে এই আদর্শকেই শিরোধার্য করেছেন, আলংকারিকদের বিদায় দিয়েছেন সসম্মানে।

সাহিত্য সম্বন্ধে বেনথাম বা মিলের মতামত রিচার্ডসন বা আজ আমাদের কাছে

* রাজেন্দ্রলাল মিত্র স্বয়ং ঐতিহাসিক ছিলেন। সেইজন্য বিবিধার্থ সংগ্রহের সমালোচনাতে সর্বদাই ঐতিহাসিক পটভূমির আলোচনা এসে গিয়েছে। বেণীসংহার নাটকের সমালোচনাতে (বিবিধার্থ সংগ্রহ ১৭৭৯ শক ভাদ্র, পৃ ১০০-১০৮) তিনি সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি আলোচনা করেছেন। গ্রীক উদ্ভব তিনি অস্বীকার করেছেন। আবার কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকের সমালোচনা হয়েছে আলংকারিক পদ্ধতিতেই। (ঐ ১৭৭৬ শক মাঘ, পৃ ২২০-২৬১)।

যতই উপেক্ষণীয় হক না কেন, তাঁদের মত ছিল তাঁদের জীবনদর্শনেরই অঙ্গ। প্রত্যক্ষতাবাদী চিন্তার পরিণাম হিসাবেই সাহিত্যেরও উপযোগিতামূলক সার্থকতার চিন্তা তাঁরা করেছেন। যুগপ্রভাবে বঙ্কিমচন্দ্রও প্রত্যক্ষতাবাদ থেকে মুক্ত থাকতে পারেননি, যদিও তাঁর মূল জীবনতত্ত্বকে তিনি আরও নানা যুক্তি ও ধারণা দিয়ে পরিমার্জিত করে নিয়েছিলেন। 'ধর্মতত্ত্বে' তিনি মনুষ্যনীতির যে আলোচনা করেছেন তাতে জ্ঞানার্জনী ও কাযকারিণী বৃত্তির সঙ্গে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিরও স্থান দিয়েছেন। চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিরই ফল সাহিত্য ও শিল্প। কিন্তু এই বৃত্তিকে বঙ্কিমচন্দ্র অন্য বৃত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন স্বয়ংস্বতন্ত্ররূপে বিচার করেননি। মনুষ্যধর্মের সমগ্রতার সঙ্গেই এই বৃত্তি যুক্ত, সেইজন্য চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি সৃষ্টি শিল্পকলার সঙ্গে অন্যান্য মানবিক দায়দায়িত্বকে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। এই সূত্রেই সাহিত্যের বিশিষ্ট প্রকৃতি এবং নীতিধর্মের প্রয়োজনীয়তার আলোচনাও স্বতঃই এসে পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য এই যে 'কাব্য কান্তার ন্যায় মধুর বাক্যে উপদেশ দেয়'—এ রকম স্থূল নৈতিক উপযোগিতার কথা না বলে তিনি সাহিত্যের একটা স্বাভাবিক তত্ত্বসিদ্ধ উপযোগিতার কথাই বলেছেন—

'চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি সকলের অনুশীলনের বিশেষ সাহায্যকারী বিদ্যাসকল মনুষ্যের দ্বারা উদ্ভূত হইয়াছে। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত, নৃত্য এ সকল সেই অনুশীলনের সহায়। বহিঃসৌন্দর্যের অনুভবশক্তি এ সকলের দ্বারা বিশেষ রূপে স্ফুরিত হয়। কিন্তু কাব্যই এ বিষয়ে মনুষ্যের প্রধান সহায়। তদ্দ্বারাই চিত্ত বিশুদ্ধ এবং অন্তঃপ্রকৃতির সৌন্দর্যে প্রেমিক হয়। এইজন্য কবি ধর্মের একজন প্রধান সহায়। বিজ্ঞান বা ধর্মোপদেশ মনুষ্যত্বের জন্য যেরূপ প্রয়োজনীয়, কাব্যও সেইরূপ।' (ধর্মতত্ত্ব)

বৃত্তি মনুষ্যমাত্রেরই সহজাত। সুতরাং রসোপভোগ এবং রসসৃষ্টি করবার এই চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিটিও সব মানুষেরই আছে। কারো সেটা অপরিণত, কারো পরিশীলিত এবং মার্জিত। এর প্রমাণস্বরূপ বঙ্কিম বলছেন, বিশ্বব্যাপী চৈতন্যের যে মূল শক্তি বিশ্বে শৃঙ্খলা নিয়ে এসেছে, সেই শক্তি জড়বস্তুতে আশ্রয় করায় জীবনধারণের একটা স্বাভাবিক আনন্দ আছে। বর্ণ দেখে আমাদের সকলেরই আনন্দ হয়, মধুর গান শুনেও আনন্দ হয়। কবিরা বিশেষ করে এই আনন্দেরই চর্চা করেন। এই আনন্দময় অনুভূতিতেই তাঁরা কাব্য রচনা করে থাকেন। 'আনন্দ' কথাটার একটা ব্যাপক অর্থ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকেই যদি দৃষ্টান্তরূপে নেওয়া যায়, তবে দেখা যায় সাধারণ অর্থে নিছক আনন্দময়তা কমই আছে। বঙ্কিমের অধিকাংশ উপন্যাসই বেদনামাধুর্যে আমাদের হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে। মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যই বা কী?

কাব্যের উপসংহারে মহৎ বিচ্ছেদের মহৎ বিষণ্ণতায় পাঠকের অন্তর পূর্ণ হয়ে ওঠে। এই দুঃখ কি বেঁচে থাকাকে কোনোদিক দিয়ে অর্থহীন করে দেয়? তা যদি না হয় তবে এই সব দুঃখ সত্ত্বেও বেঁচে থাকার আনন্দ আছে। এইজন্যই ইংরেজ কবির স্মরণীয় উক্তি—দুঃখের কাহিনীই আমাদের মধুরতম সঙ্গীত। দুঃখবোধের ভিতর দিয়েই জীবনের প্রতি মমতাটি প্রবলভাবে প্রকাশ পায়। বঙ্কিমচন্দ্র এই আনন্দকে একটি আশ্চর্য রূপকের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। কমলাকান্তের দপ্তরে তাঁর গভীর উক্তি—

'রূপবহ্নি, ধনবহ্নি, মানবহ্নিতে নিত্য নিত্য সহস্র পতঙ্গ পুড়িয়া মরিতেছে—আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি। এই বহ্নির দাহ যাহাতে বর্ণিত হয়, তাহাকে কাব্য বলি। মহাভারতকার মানবহ্নি সৃজন করিয়া দুর্যোধন-পতঙ্গকে পোড়াইলেন—জগতে অতুল্য কাব্যগ্রন্থের সৃষ্টি হইল। জ্ঞানবহ্নিজাত দাহের গীত 'Paradise Lost'। ধর্মবহ্নির অদ্বিতীয় কবি সেণ্ট পল। ভোগবহ্নির পতঙ্গ 'আণ্টনি ক্লিওপেত্রা'।......'

স্পষ্টতই দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্র এখানে কোনো সামাজিক নীতির প্রশ্ন আনেননি। সুখে-দুঃখে আনন্দে-বেদনায় মিশ্রিত জীবনের গ্রন্থ কাহিনীই কাব্য। কিন্তু তার পরেই স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসে জীবনের ঘটনার বর্ণনামাত্রই কি কাব্য? যে কোনো ঘটনাকে যে-কোনো ভাবে প্রকাশ করলেই কি তা কাব্য হয়? এই প্রশ্নের আলোচনা থেকেই গড়ে উঠেছে পাশ্চাত্যে এবং ভারতের বিভিন্ন সাহিত্যপ্রস্থান। বঙ্কিমচন্দ্র এই দুই সাহিত্যপ্রস্থানের সন্ধিস্থলে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকেই নির্দিষ্ট করে দিতে হল আমাদের সাহিত্য. স্রা কোন্ পথ অনুসরণ করবে।

আমাদের দেশীয় সাহিত্যনীতি এবং বিদেশী সাহিত্যনীতির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র দেখলেন এক গভীর বৈষম্য। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমাবধি ইংরেজি সাহিত্য পড়েই মানুষ; সংস্কৃত তিনি ঘরে পড়েছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যালোচনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় সম্ভবত চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতদের মাধ্যমে। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে পণ্ডিতী সমালোচনা তাঁকে তৃপ্ত করেনি। উত্তরচরিত সমালোচনার উপসংহারে তিনি সংস্কৃত আলংকারিকদের প্রণাম করে বিদায় দিয়েছেন, আর অ্যারিস্টটলের 'স্বভাবানুকরণ'-তত্ত্ব এবং রোমাণ্টিকদের 'সৃষ্টি'-তত্ত্বকে তিনি সাগ্রহে স্বীকার করে নিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মনের গঠনের সঙ্গে পরিচয় থাকলে তাঁর এই গ্রহণ-বর্জনের কারণ বোঝা শক্ত হয় না। অ্যারিস্টটলের অনুকরণবাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র দেখেছিলেন জীবনের ঘনিষ্ঠ স্বীকৃতি। আলংকারিকেরা কাব্যকলাচর্চা করেই তৃপ্ত থেকেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সংক্ষেপে বলেছেন আলংকারিকেরা মাত্র কয়েকটি মানসিক বৃত্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে মানবচরিত্রের

বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করেছেন। ফলে ওই নয়টি বৃত্তির অঙ্কনই তাঁদের একমাত্র সমালোচ্য হওয়ায় সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্ব অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃত সমালোচনাতত্ত্ব নিয়ে যে-অভিযোগ করেছেন সেজন্য তাঁকে দোষ দেওযা যায় কিনা সন্দেহ। গুণ রীতি অলংকার প্রভৃতি কাব্যের বহিরঙ্গ বিষয়গুলি মুখ্য আলোচনার বিষয় হয়ে রসসৃষ্টির মর্মসন্ধানকেই গৌণ করে ফেলেছিল। বিশ্বনাথ কবিরাজ সাহিত্য-দর্পণে রসের নির্বিশেষত্ব স্বীকার করেছেন সত্য, কিন্তু হযতো সহজগ্রাহ্য করবার জন্যই বহিরঙ্গ উপকরণগুলির আলোচনাই বিস্তৃতভাবে করেছেন। ফলে কাব্যালোচনা নেহাৎই যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিণত হযেছিল। এই পটভূমিতেই মধুসূদনের পূর্বে উদ্ধৃত উক্তিটি বিশেষ অর্থবহ। সংস্কৃত রসতত্ত্বের যে চরম উৎকর্ষ দেখিযে গিযেছিলেন আনন্দবর্ধন এবং অভিনবগুপ্ত তার সঙ্গে আর পরিচয ছিল না সংস্কৃত-রসিকদের। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো তীক্ষ্ণ ধীশক্তিসম্পন্ন মনীষীও সেইজন্য প্রাচীন সাহিত্যতত্ত্বের যথার্থ পরিচয় গ্রহণ করতে পারেননি। শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত একে বলেছেন 'বিশ্বনাথের অপপ্রভাব'।*

অভিনবগুপ্ত সাহিত্যবোধকে উপকরণ-অলংকরণের বিচারবিশ্লেষণের জটিল জালের মাঝখান দিয়ে যে ধ্রুবলোকে নিযে গিয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের সেই নির্বিশেষ রসসত্যকে যে জানতেন না তা কিন্তু একেবারেই ঠিক নয। 'রস' শব্দটি তিনি বিশেষ অর্থেই ব্যবহার করেছেন, আলংকারিক অর্থে নয। তিনি 'বেগবতী মনোবৃত্তি'-কেই ('ইংরেজি আলংকারিকেরা তাহাকে passions বলেন') কাব্যে অঙ্কিত হলে 'রসোদ্ভাবন' বলেছেন। কিন্তু সাহিত্যের পরম আস্বাদ আলংকারিক এবং বৈযাকরণিক নীতিনিয়মের অতীত। প্রথাগত শ্রেণীবিন্যাসই এর শেষ কথা নয। এই সূত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে অন্তত দুটি দৃষ্টান্তের। 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধটিতে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'রূপগত বৈষম্য প্রকৃত বৈষম্য নহে'। নাটক এবং গীতিকাব্যের যে পার্থক্য তিনি নির্দেশ করেছেন এই প্রবন্ধে এবং 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে, তাতে দেখা যায় তিনি এ দুয়ের ভাবগত প্রকৃতির উপরেই সম্পূর্ণ জোর দিয়েছেন। তাই তাঁর মতে—

'রামের চিত্তে যখন যে-ভাব উদয হইতেছে, ভবভূতি তৎক্ষণাৎ তাহা লেখনীমুখে ধৃত করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, ব্যক্তব্য এবং অব্যক্তব্য উভয়ই তিনি স্বকৃত নাটক-মধ্যগত করিয়াছেন। ইহাতে নাটকোচিত কার্য না করিয়া গীতিকাব্যকারের অধিকারে প্রবেশ করিয়াছেন।'

অনুরূপ সূক্ষ্ম সাহিত্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায় বঙ্কিমচন্দ্রের আর একটি প্রবন্ধে—'শকুন্তলা মিরান্দা দেসদিমোনা'য়। তাতে তিনি বলেছেন—

'ভারতবর্ষে যাহাকে নাটক বলে, ইউরোপে ঠিক তাহাকেই নাটক বলে না। উভয় দেশীয় নাটক দৃশ্যকাব্য বটে, কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকেরা নাটকার্থে আর একটু অধিক বুঝেন। তাহারা বলেন যে, এমন অনেক কাব্য আছে—যাহা দৃশ্যকাব্যের আকারে প্রণীত, অথচ প্রকৃত নাটক নহে। নাটক নহে বলিয়া যে এ সকলকে নিকৃষ্ট কাব্য বলা যাইবে, এমত নহে—তন্মধ্যে অনেকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য, যথা গ্যেটে-প্রণীত ফষ্ট এবং বাইরণ-প্রণীত মানফ্রেড।'

অতঃপর—

'আমরা ভারতবর্ষে উভয়কেই নাটক বলিতে পারি, কেননা, ভারতীয় আলংকারিকদিগের মতে নাটকের যে সকল লক্ষণ, তাহা সকলই ঐ দুই কাব্যে আছে। কিন্তু ইউরোপীয়দিগের সমালোচকদিগের মতে নাটকের যে সকল লক্ষণ এই দুই নাটকে তাহা নাই। ওথেলো নাটকে তাহা প্রচুর পরিমাণে আছে। ওথেলো নাটক—শকুন্তলা এ হিসাবে উপাখ্যান কাব্য।'

—এই সমালোচনাতে আর-একটি কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রচলিত আলংকারিক সমালোচনার সঙ্গে পরিচিত থেকেও ইউরোপীয় সমালোচনা দ্বারাই প্রভাবিত ছিলেন এবং সে-সমালোচনাও তৎকালীন আধুনিক। ক্লাসিকাল সমালোচনায় সাহিত্যের গঠন-রীতির উপরেই জোর পড়েছে, অনুভূতি-বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দেওয়া হয়নি। তার আর একটি বঙ্কিমী দৃষ্টান্তও উল্লেখযোগ্য। এতে 'কাব্যত্ব' লাভের পক্ষে কোনো রচনার কোনো নির্দিষ্ট বাহ্যরূপের আবশ্যকতা একেবারেই অস্বীকৃত—

'এক্ষণে যে রীতি প্রচলিত আছে যে কবিতা পদ্যেই লিখিতে হইবে তাহা সঙ্গত কিনা আমার সন্দেহ আছে। ভরসা করি, অনেকেই জানেন যে কেবল পদ্যই কাব্য নহে। আমার বিশ্বাস আছে যে, অনেক স্থানে পদ্যের অপেক্ষা গদ্য কাব্যের উপযোগী। বিষয়বিশেষে পদ্য কাব্যের উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু অনেক স্থানে গদ্যের ব্যবহারই ভাল। যে স্থানে ভাষা ভাবের গৌরবে আপনা আপনি ছন্দে বিন্যস্ত হইতে চাহে, কেবল সেই স্থানেই পদ্য ব্যবহার্য।'*

বঙ্কিমচন্দ্র সূক্ষ্মতর বিচারে প্রবেশ করেননি। ছন্দ কাব্যের পক্ষে একান্ত আবশ্যক নয়, তবে কাব্যের বিশিষ্ট লক্ষণ কী, সে বিষয়টি বর্তমান প্রসঙ্গে উত্থাপিত হয়নি। গীতিকাব্য প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন, 'বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতামাত্র যাহার

* গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক (১৮৯১) ভূমিকা।

উদ্দেশ্য সেই কাব্যই গীতিকাব্য'। এতেও যে সংজ্ঞা সম্পূর্ণ হল তা বলা যায় না। ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতা মাত্রেই রচনা কাব্য হয়ে ওঠে না, একথা নিশ্চয়ই বঙ্কিমচন্দ্র জানতেন। ভারতীয় রসতাত্ত্বিকের 'সাধারণীকরণ' বা 'অলৌকিকত্ব' প্রভৃতি বাদ দিলেও পাশ্চাত্য সমালোচকদের কল্পনাতত্ত্ব, সৌন্দর্যবোধ, প্রকাশতত্ত্ব প্রভৃতি আধুনিক প্রসঙ্গগুলির উল্লেখ বঙ্কিমচন্দ্র করলেন না। এর কোনো কোনোটির আলোচনা হয়েছে তাঁর পরবর্তীকালে। কোলরিজ-ওয়র্ডসওযার্থের সাহিত্যবিষয়ক লেখা খুব সম্ভবত বঙ্কিম দেখেছেন। রিচার্ডসনের প্রবন্ধে ওয়র্ডসওয়ার্থের উল্লেখ আছে, কিন্তু কোলরিজের উল্লেখ নেই।† বঙ্কিমচন্দ্র ওয়র্ডসওযার্থের কবিতা ভালো করেই পড়েছিলেন। 'প্রকৃত ও অতিপ্রকৃত' প্রবন্ধে ওযর্ডসওয়ার্থের কবিতাকে আধ্যাত্মিকতা দোযে দুষ্ট বলেছেন।§ বঙ্কিমচন্দ্র কোলরিজের উল্লেখ কোথাও করেননি। কোলরিজের সাহিত্যতত্ত্বালোচনা ইংরেজি সমালোচনায় যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করে, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় তার আভাস আছে। বঙ্কিমের নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আছে সাহিত্যকে বাহ্যরূপ দিয়ে বিচার না করে ভাবের আন্তরিক উপলব্ধি এবং গভীরতা দিয়ে বিচার করার চেষ্টায়। ছন্দ মিল দিয়ে কাব্যত্ব নির্ণয না করে ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতাকে এইজন্যই তিনি প্রধান বিচার্য বলে মনে করেছেন। রিচার্ডসনের প্রবন্ধে এ কথা খুব জোরের সঙ্গেই বলা হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র অ্যারিস্টটলকে অনুসরণ করেছেন সাহিত্যের বাস্তবভিত্তি স্বীকার করতে গিয়ে। সাহিত্য জীবন থেকেই বিষযবস্তু সংগ্রহ করে। অ্যারিস্টটল বলেছিলেন সাহিত্য জীবনকে অনুকরণ করে। বঙ্কিম ব্যবহার করেছিলেন 'স্বভাবানুকরণ' শব্দটি।

---

† রিচার্ডসন Poetry and Utilitarianism প্রবন্ধে কবিতাব সংজ্ঞা দিয়েছেন অ্যারিষ্টটল, প্রক্লস, প্লেটো, সক্রেটিস, বেকন, উইলিয়ম টেমপল, ডীন অব সেণ্ট প্যাট্রিক, সার ফিলিপ সিডনী, জনসন, কাউলি, গডউইন, র‍্যাপাইন থেকে। হ্যাজলিটের উল্লেখও আছে। 'On the Influence of Poetry' প্রবন্ধে কোলরিজের উল্লেখ নেই কিন্তু কবিকল্পনার প্রসঙ্গে বলেছেন, The faculty of mind which the poet most exerts is that of the imagination ; and assuredly nothing in life is more directly allied to the highest and purest exertions of the noblest imagination than poetry.

§ বঙ্কিমচন্দ্র ওয়র্ডসওয়ার্থের The light that never was on sea or land—এই বাক্যাংশটির অনুবাদ করেছেন ঋতুবর্ণন কাব্যের সমালোচনায়। এই প্রসঙ্গে ওয়র্ডসওযার্থ সম্পর্কে জন স্টুয়ার্ট মিলের অভিমত তুলনীয়—'In Wordsworth, the poetry is almost always the mere setting of a thought'. ('Poetry and its Varieties')

'আর্যজাতির সূক্ষ্মশিল্প' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র অনুকরণের বিভিন্ন উপায়ে সৃষ্ট বিভিন্ন শিল্পের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন। অ্যারিস্টটলও তাঁর পোয়েটিকসের গোড়াতেই অনুকরণের বিভিন্ন প্রণালীর বর্ণনা দিয়ে চিত্র এবং কাব্যের বিভিন্নতা দেখিয়েছেন। তাঁর প্রধান আলোচ্য ছিল ইতিহাস মহাকাব্য ও নাটক। মহাকাব্য ও নাটকের পার্থক্য সংলাপে এবং বর্ণনাত্মক ভঙ্গিতে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন প্রণালীর পার্থক্যেই নাটক-মহাকাব্যের প্রকৃতিগত ভেদ হয় না। গ্যেটের মত উল্লেখ করে বঙ্কিম বলেছেন 'প্রকৃত নাটকের পক্ষে, কথোপকথনে গ্রন্থন বা অভিনয়ের উপযোগিতা নিতান্ত আবশ্যক নহে।' অ্যারিস্টটলের মূল তত্ত্বকে অবলম্বন করে পাশ্চাত্য সমালোচনা সাহিত্যে ও শিল্পের আরও নানা সম্ভাবনা ও সাফল্যের আলোচনায় নতুনতর সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পেরেছে। বঙ্কিমচন্দ্রকেও গ্যেটে-সমকালীন সাহিত্যচিন্তাতে সচেতন থাকতে দেখা যাচ্ছে।

বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্র যে কবির সৃষ্টিকে স্বভাবানুকারী বলে নির্দেশ করেছেন এতে অ্যারিস্টটলের চিন্তার প্রভাব যত না আছে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর পজিটিভিস্টদের চিন্তার প্রভাব তার চেয়ে কম নেই। অ্যারিস্টটল সাহিত্যকে মানবচরিত্রের অনুকরণ মাত্রে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। তিনি প্লটকে প্রাধান্য দিয়ে চরিত্র-চিত্রকে গৌণ স্থান দিয়েছেন।* উত্তরচরিতের সমালোচনায এবং শকুন্তলা-মিরান্দা-দেসদিমোনার সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু চরিত্র-স্বাতন্ত্র্য নিরতিশয় দক্ষতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন। নাটকের চরিত্রকে সজীব মানবচরিত্রের স্বভাবধর্ম দিয়েই বিচার করেছেন। যদিও চরিত্রের উ রেই গুরুত্ব দিলেন, তথাপি চরিত্রের কার্যকলাপকে তিনি যে উপেক্ষা করলেন, এ কথাও নিশ্চয়ই বলা যাবে না। মোটের উপর অ্যারিস্ট-টলের স্বভাবানুকরণ-তত্ত্বকে বঙ্কিম অন্তত না৩কের ক্ষেত্রে স্বীকার করে নিয়েছেন।

কিন্তু সাহিত্য কি কেবল মানবজীবনের অনুকরণ? বিশ্বপ্রকৃতি কিংবা মনঃকল্পিত সৌন্দর্যও কি সাহিত্যের বিষয় নয়? বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের উপকরণ-সামগ্রীর মধ্যে বৃহত্তর নিসর্গপ্রকৃতিকেও অন্তর্ভুক্ত করলেন। প্রকৃতির রূপরসও কবির মনে সৃষ্টির প্রেরণা এনে দেয়। এই বিশ্বপ্রকৃতির দিকে ত কিয়ে কবির বিস্ময়ের সীমা থাকে না। একেও তিনি কবিতায় ফুটিয়ে তোলেন। একটি কাব্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিম দুই শ্রেণীর কবিতার কথা বলেছিলেন, বর্ণনকাব্য এবং শোধনকাব্য। প্রথমোক্ত কাব্যে কবি এই শোভাময় জগৎকে আঁকেন—'যাহা দেখিতে সুন্দর, শুনিতে সুন্দর, যাহা সুগন্ধ, যাহা সুকোমল তৎসমুদায়ে বিশ্ব পরিপূর্ণ।' এরই যথার্থ প্রতিকৃতি সৃষ্টি বর্ণন-

* In a play accordingly they do not act in order to portray the Characters: they include the Characters for the sake of the action.—বাইওয়াটারের অনুবাদ।

কাব্যের উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য এটাও বিশুদ্ধ স্বভাবানুকারিতা যদিও মানবচরিত্র বা মানবজীবনের নয়। কিন্তু বঙ্কিম যাকে শোধনকাব্য বলেছেন সেটাই বঙ্কিমচন্দ্রের সূক্ষ্মতর ভাবনা এবং সেই ভাবনায় নানা স্বাভাবিক ইঙ্গিতের আভাস আসে।—

'আর এক শ্রেণীর কবিদের উদ্দেশ্য অবিকল স্বরূপ বর্ণনা নহে। অপ্রকৃত বর্ণনাও তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহারা প্রকৃতি সংশোধন করিয়া লয়েন—যাহা সুন্দর, তাহাই বাছিয়া বাছিয়া লইয়া, যাহা অসুন্দর তাহা বহিষ্কৃত করিযা কাব্যের প্রণয়ন করেন। কেবল তাহাই নহে। সুন্দরেও যে সৌন্দয নাই, যে রস, যে রূপ, যে স্পর্শ, যে গন্ধ কেহ কখন ইন্দ্রিয়গোচর করে নাই "যে আলোক জলে স্থলে কোথাও নাই" সেই আত্মচিত্তপ্রসূত উজ্জ্বল হৈমকিরণে সকলকে পরিপ্লুত করিয়া সুন্দরকে আরও সুন্দর করেন—সৌন্দর্যের অতি প্রকৃত চরমোৎকর্যের সৃষ্টি করেন। অতি প্রকৃত কিন্তু অপ্রকৃত নহে। তাঁহাদের সৃষ্টিতে অযথার্থ, অভাবনীয়, সত্যের বিপরীত, প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীত কিছুই নাই, কিন্তু প্রকৃতিতে ঠিক তাহার আদর্শ কোথাও দেখিবে না।'

শোধনকাব্যে কবি প্রকৃতির উপরে কল্পিত সৌন্দর্য আরোপ করেন, ফলে স্বভাবের অনুকরণ করেও এ হয় স্বভাবাতিরিক্ত। এর উৎস হচ্ছে কবিকল্পনা যা কবি নিজের অন্তরের থেকেই লাভ করেন। স্বভাবাতিরিক্ত কথাটি বঙ্কিমই ব্যবহার করেন। উত্তরচরিতের উপসংহার অংশে তিনি একটি গুরুতর প্রসঙ্গের অবতারণা করেন—'যাহা সত্যের প্রতিকৃতি মাত্র নহে—তাহাই সৃষ্টি। যাহা স্বভাবানুকারী, অথচ স্বভাবাতিরিক্ত, তাহাই কবির প্রশংসনীয় সৃষ্টি।' বস্তুজগৎ অবলম্বন করে বস্তুজগৎকে অতিক্রম করে যে সুসঙ্গত জগৎ একশ্রেণীর কবিতায় গড়ে ওঠে তাকে অবশ্যই সৃষ্টি বলা যায়—আমাদের দেশের আলংকারিক ভাষায় 'অপূর্ববস্তুনির্মাণ'। যে কল্পনা দিয়ে এই সৃষ্টি সম্ভব সে কল্পনা 'আত্মচিত্ত প্রসূত' অর্থাৎ সাবজেক্টিভ, তাও বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন। কোলরিজের যুগ থেকেই সাহিত্যে কল্পনা এবং আত্মকেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত হয়ে পরবর্তী সাহিত্যভাবনাকে রূপান্তরিত করেছে। এর পরেই আমরা ক্রোচের যুগে এসে পৌঁছই। বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু 'সৃষ্টি'র কথা বললেন, স্বভাবাতিরিক্ততার বিশ্লেষণ কিংবা 'সৃষ্টি'র গূঢ় মর্ম ব্যাখ্যা করলেন না। পূর্বোক্ত কথাটি বোঝাতে গেলে যে জটিল তত্ত্বের গহনে প্রবেশ করতে হয় বঙ্কিমের প্রত্যক্ষতাবাদী মন হয়তো তাতে অগ্রসর হতে চায়নি। কিন্তু সত্যটি অনিবার্য ভাবেই আভাসিত হয়েছে। সৃষ্টির সম্বন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্র একটিই ইঙ্গিত দিয়েছেন।—

'এক একখানি প্রস্তর পৃথক পৃথক করিয়া দেখিলে তাজমহলের গৌরব বুঝিতে পারা যায় না। একটি একটি বৃক্ষ পৃথক পৃথক করিয়া দেখিলে উদ্যানের শোভা অনুভূত

করা যায় না। এক একটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বর্ণনা করিয়া মনুষ্যমূর্ত্তির অনির্বচনীয় শোভা বর্ণন করা যায় না। সেইরূপ কাব্যগ্রন্থের।'

কাব্যাস্বাদন যেমন সামগ্রিক ভাবেই সার্থক—আলংকারিক বিশ্লেষণের দ্বারা নয়—তেমনি কাব্যসৃষ্টিও সামগ্রিক রূপ-কল্পনাতেই সম্ভব।

'কবির সৃষ্টি—চরিত্র, রূপ, স্থান, অবস্থা কার্যাদিতে পরিণত হয়। ইহার মধ্যে কোন একটির সৃষ্টি কবির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে। সকলের সংযোগে সৌন্দর্যের সৃষ্টিই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য।'

উত্তরচরিতের আলোচনাকালে বঙ্কিম প্লট বা চরিত্র বা ভাষা কোনোটারই আলাদা আলাদা উৎকর্ষ দেখাতে চাননি। সব মিলিয়ে কবি যা সৃষ্টি করে তুলেছেন এবং পাঠকমনে তাতেই সাহিত্যবস্তুর সাফল্য নির্ধারিত, সমগ্র ভাবেই সেটা সৃষ্টি! অনুরূপ উদাহরণ তিনি দিয়েছেন দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটকের আলোচনায়। দীনবন্ধু পূর্ণাবয়ব চরিত্র সৃষ্টি করতে পারতেন। কোনো চরিত্রের আচরণ ও ভাষা মিলিয়েই তার পূর্ণ রূপটি পাঠকের কাছে ধরা দেয়। ঈশ্বর গুপ্ত এই পূর্ণাঙ্গ চরিত্র কিংবা তার সামগ্রিক রূপ রচনা করতে পারেননি। কবিচিত্তে সমগ্রতাটি ধরা দেয় কল্পনাশক্তির সাহায্যে। বঙ্কিম অবশ্য বলেছেন সহানুভূতির সাহায্যে এই পূর্ণ চরিত্র-রূপ দীনবন্ধুর প্রতিভায় ফুটে উঠেছিল। বস্তুত কেবল সহানুভূতিতে সৃষ্টি সম্ভব নয়; কেননা সেই মন আসক্ত, দৃষ্টিও বদ্ধ। অতএব তা হবে নেহাৎই স্থানকালবদ্ধ লৌকিক। একমাত্র কল্পনাশক্তিই কবিকে খণ্ড অবলম্বনে অখণ্ড চেতনায় উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করতে পারে। ঈশ্বর গুপ্তের এই শক্তি ছিল না বলেই তিনি 'রিয়ালিস্ট' এবং 'স্যাটায়ারিস্ট'। প্রসঙ্গত বলা যায়, ব্যঙ্গের যে-সূত্র বঙ্কিম দিয়েছেন—'যাহাতে দুঃখ করা উচিত তাহা ব্যঙ্গের যোগ্য নহে'—এই সূত্রে ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গ রচনাগুলি অবশ্য সাহিত্যপদবাচ্য, কেননা রঙ্গরসে ঈশ্বর গুপ্তের আরটিস্টসুলভ নিস্পৃহ বিদ্বেষহীনতা আছে। বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর 'আইডিয়ালাইজ' করার ক্ষমতার কথা বলেছেন বটে, তবে মনে হয় কথাটি তিনি সাহিত্যতত্ত্বের একটি গুরুতর সূত্ররূপে ব্যবহার করেননি। উত্তরচরিত-সমালোচনাতেও বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যসৃষ্টিতত্ত্বের যে আলোচনা করেছেন দীনবন্ধুর আলোচনায় সেই মান প্রয়োগ করেননি। সেক্ষেত্রে বরং অ্যারিস্টটলের সূত্রটি মাত্র তাঁর মনে কাজ করে থাকবে—**By a universal statement I mean one as to what such or such a kind of man will probably or necessarily say or do—which is the aim of poetry, though it affixes proper names to the characters :**

বস্তুত অ্যারিস্টটলের স্বভাবানুকরণবাদ কোলরিজের যুগে কল্পনাতত্ত্বের দ্বারা নিষ্প্রভ হয়ে গেলেও তখনও পর্যন্ত নিরর্থক হয়ে যায়নি। স্বভাবানুকরণের বাস্তববোধ কল্পনা-শক্তিকেও অতিচারী হতে দেয়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর পজিটিভিস্টরা অতীন্দ্রিয় নয়, ইন্দ্রিয়-জগতের সজ্ঞানবোধ ও যুক্তি দ্বারাই চালিত হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ববিধ চিন্তাতেই ছিল এর শাসন। যে কারণে তিনি স্বভাবাতিরিক্ততাকে সুস্পষ্টরূপে কাব্যের মান বলেও তার ব্যাখ্যায় অগ্রসর হননি সেই কারণেই কল্পনার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নিয়মের অস্তিত্বের উল্লেখ করেছেন। 'প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীত কিছুই নাই'—এই কথার দ্বারা যে নিয়মপাশের ইঙ্গিত দিলেন তা যত-না অ্যারিস্টটলের 'ল অব নেসেসিটি' তার চেয়েও বেশি সেকালের 'ন্যাচারল ল'। কবির সৃষ্ট জগৎ যে মানুষের জগতের চেয়ে আলাদা এ কথা সেকালের দিনে বলা বোধ হয় সম্ভব ছিল না। এইজন্যই এক-দিকে তিনি বিশ্বাস করেছেন সাহিত্য সামাজিক নিয়মেই বিশিষ্ট, আর একদিকে তিনি ভেবেছেন সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্যসৃষ্টি হলেও পরিণাম নৈতিক চিত্তশুদ্ধি।

উত্তরচরিত প্রবন্ধেই বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে 'সৃষ্টি'-বাদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন, আবার ওই প্রবন্ধেই প্রমাণ আছে যে কবির সৃষ্টি স্বভাবাতিরিক্ত হলেও পরিবেশ-নিরপেক্ষ নয়। রামায়ণের রামচন্দ্র এবং ভবভূতির রামচন্দ্রের মধ্যে যে পরিকল্পনাগত পার্থক্য দেখা যায় তার কারণ 'উভয় চরিত্র গ্রন্থরচনার সময়োপযোগী'। এই নিয়মের প্রয়োগ তিনি আরও অন্যান্য প্রবন্ধেও করেছেন। 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে তিনি আর সব কিছুর মতো সাহিত্যকেও বলেছেন 'নিয়মের ফল'। দেশভেদে, অবস্থাভেদে অসংখ্য নিয়মের বশবর্তী হয়ে সাহিত্য রূপান্তরিত হয়। সেসব নিয়ম জটিল, দুর্জ্ঞেয়। কিন্তু 'কোমৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধে যেরূপ তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, সাহিত্য সম্বন্ধে কেহ তদ্রূপ করিতে পারে নাই'। এই উক্তিতে মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে নিয়মের শাসন সম্বন্ধে বোধহয় সম্পূর্ণ নিঃসংশয় ছিলেন না। বাকল সাহিত্য ও সমাজের সম্পর্ক যে-ভাবে দেখিয়েছেন তাতে তিনি সম্পূর্ণ একমত হতে পারেননি। তিনি বলেছেন 'হিতবাদমতপ্রিয় বাকলের সঙ্গে কাব্যসাহিত্যের সম্বন্ধ কিছু অল্প'। অথচ রামচরিত্রের পরিকল্পনায় রূপান্তরণে, কৃষ্ণচরিত্রের বিবর্তনে বঙ্কিমচন্দ্র বাকল-এর প্রদর্শিত পদ্ধতিই অনুসরণ করেছেন। এর কারণ সাহিত্যকে একটা সুনির্দিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়ম দিয়ে সুপ্রত্যক্ষ করে তোলা। সাধারণভাবে সাহিত্যের উদ্ভবের মূলে যেমন তেমনি কল্পনার প্রকৃতিতেও বাস্তবযুক্তিসিদ্ধতাকে তিনি মান্য করেছেন। ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যের ব্যাখ্যায় তিনি যুগ ও জীবনকেই মূলত তাঁর কাব্যের অশ্লীল প্রকৃতির জন্য দায়ী করেছেন।

বাঙালী চরিত্র বাঙালী রসিকতা দিয়েই ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যের চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন। এইজন্যই তাঁর সুবিখ্যাত সূত্র—'কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ'। এখানে, বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্র 'পোয়েটিক পারসনালিটি'র কথা অবশ্যই বলেননি, বলেছেন কবির সামাজিক সত্তাটির কথা। কবি হিসাবে ঈশ্বর গুপ্তের সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের পথে দেশ-কালের প্রভাব ছিল। দেশ-কালসচেতনতা সাধারণভাবে সাহিত্য সম্বন্ধে বঙ্কিম-চন্দ্রের দৃষ্টিতে যে স্পষ্টতা এনে দিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। বৈষ্ণব পদাবলীর তিনি রসিক ছিলেন, কিন্তু জয়দেব এবং বাঙালীর কৃষ্ণকল্পনা সম্বন্ধে তাঁর বুদ্ধিগত বিশ্লেষণ ছিল ভিন্ন। জয়দেবের কাব্যের লালিত্যে তিনি বাঙালীর চরিত্রদৌর্বল্যের প্রতিফলন দেখেছিলেন। নতুন ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বঙ্কিমের রুচিও বাংলা সাহিত্যের বিচারে তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। ইংরেজিতে লেখা Bengali Literature (১৮৭১) প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের স্বচ্ছ দৃষ্টির পরিচয় বহন করছে। স্তর ও শ্রেণীবিন্যাসের দ্বারা তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করেছেন। কিন্তু ভারতচন্দ্র-ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে তিনি পরিবর্তিত রুচিতেই চালিত হয়েছেন। আধুনিক কালে ইংরেজি-প্রভাবিত এবং সংস্কৃত প্রভাবিত লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে প্রথমোক্তটির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা যথেষ্ট। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় ইংরেজিতে লেখা এই প্রবন্ধটিতে তিনি টেন বা বাকলের সূত্র প্রয়োগ করেননি। অথচ মোটামুটি এই সিদ্ধান্ত রক্ষা করে কার্য-কারণের যোগাযোগ সহ পরবর্তীকালে বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনা করেছেন। দেশীয় সাহিত্যের গতিপ্রকৃতিতে এবং সাহিত্যসৃষ্টিতেও তাঁর প্রত্যক্ষতাবাদী চিন্তার পরিচয় সুলভ। কালিদাসের কুমারসম্ভব এবং মিলটনের প্যারাডাইজ লস্ট-এর চরিত্র-কল্পনা সম্বন্ধে তাঁর উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

'যাহা প্রকৃত, তাহা যে সকল নিয়মের অধীন, কবির সৃষ্ট অতিপ্রকৃতও সেই সকল নিয়মের অধীন হওয়া উচিত।'

যুক্তিবাদে বঙ্কিমের নিষ্ঠা এতই প্রবল যে বস্তুসত্যবিরহিত কল্পনাজগতের অন্য-নিরপেক্ষতায় তাঁর আস্থা ছিল না। তাতে কল্পনার সৌকুমার্যেরও কোনো ক্ষতি হয় না। রিচার্ডসনের প্রবন্ধে ছিল—It is a sad mistake to suppose that imagination is in direct contradistinction to reason. বঙ্কিমচন্দ্রের সূক্ষ্ম মধুর সৌন্দর্যের প্রতি একটা স্বাভাবিক রসগ্রাহিতা ছিল। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির পদাবলী আলোচনায় তিনি ভাবমাধুর্যকে অলংকৃত কাব্যময় ভাষায় পাঠকের মর্মগ্রাহ্য করেছেন, তেমনি আধুনিক রুচিতেও রাম বসু হরু ঠাকুর শ্রীধর কথকের গানের রসগ্রহণে তাঁর

কোনো বাধা হয়নি। 'সৌন্দর্য' কথাটি তিনি একাধিকবার ব্যবহার করেছেন। সে সৌন্দর্য মানসিক। তাঁর মতে স্বভাবানুকারী হলেই কাব্য উৎকৃষ্ট হয় না, তাকে সৌন্দর্যবিশিষ্টও হতে হবে। আবার স্বভাবানুকারিতা ছাড়া সৌন্দর্য জন্মে না। বঙ্কিমের এই দুই মন্তব্য থেকে দুটি অর্থ নিষ্কাশিত করা যায়। প্রথমত, স্বভাবের শুধু সেইটুকুই অনুকরণ করতে হবে যা আমাদের কাছে সুন্দর বলে প্রতিভাত। দ্বিতীয়ত, স্বভাব সর্বত্র সুন্দর নয় তবে কল্পনা দিয়ে স্বভাবকে অতিক্রম করে সৃষ্টি করতে পারলে স্বভাব সৌন্দর্যবিশিষ্ট হয়। মনে হয় দ্বিতীয় অর্থটিই বঙ্কিমের অভিপ্রেত।

কাব্য-সাহিত্য প্রাকৃতিক নিয়মে নির্ধারিত হয় বটে তবে সুন্দরই কাব্যের লক্ষ্য। সুন্দরই পাঠকের মনে সাহিত্যপাঠের আনন্দ এনে দেয়। এই সূত্রেও বেনথামের বক্তব্যের সঙ্গে বঙ্কিমের মতভেদ। পুস্পিন খেলা এবং কাব্যপাঠের আনন্দ একই প্রকার—বেনথামের এই মন্তব্যকে আক্রমণ করেছিলেন রিচার্ডসন। কাব্যকে অধিকতর গুরুত্ব দেবার জন্য ব্যবহারিক সার্থকতা দেখাবার উদ্দেশ্যে অনেকে বলেন কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিশিক্ষা। বঙ্কিমচন্দ্র নীতিশিক্ষাকে কাব্যের উদ্দেশ্য বলে গ্রাহ্যই করেননি—'সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ' সৃষ্টিই কাব্যের প্রধান লক্ষ্য। পুস্পিন খেলায় সৌন্দর্যসৃষ্টি নেই, অতএব দুয়ের মধ্যে আমোদ থাকলেও তা তুলণীয় নয়। কাব্যে যে কল্পনামূলক অথচ স্বভাবানুগত রূপসৃষ্টি আছে, তার অনুধাবনে পাঠকের মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, বঙ্কিমচন্দ্র তাকে বলেছেন 'চিত্তশুদ্ধি'। চিত্তশুদ্ধির ব্যাখ্যা বঙ্কিমচন্দ্র অন্যত্র করেছেন। 'চিত্তশুদ্ধি' নামে একটি প্রবন্ধে তিনি সকল ধর্মাচরণের মূল কথাকেই নির্দেশ করেছেন চিত্তশুদ্ধি বলে। এর তিনটি লক্ষণ: হৃদয়ে শান্তি, মনুষ্যে প্রীতি এবং ঈশ্বরে ভক্তি। তৃতীয় লক্ষণটির সঙ্গে সাহিত্যের প্রত্যক্ষ অনিবার্য যোগ নেই বটে কিন্তু সম্ভবত পরোক্ষ যোগ আছে। সত্যকার সুন্দরের সম্মুখীন হলে মনের লৌকিক অনুভূতিখণ্ডগুলি ম্লান হয়ে যায়। লৌকিক এবং নিছক ব্যক্তিগত উত্তেজনার উপশম ঘটলে সর্বব্যাপী সহমর্মিতায় মন পূর্ণ হয়ে যায়। এরকম একটা প্রতিক্রিয়ার কথা 'ক্যাথারসিস'-তত্ত্বের মধ্যেও আছে এবং সংস্কৃত রসশাস্ত্রের 'আবরণ-ভঙ্গ' তত্ত্বটিও এই মানসিক ক্রিয়ারই দ্যোতক। কিন্তু বঙ্কিম উত্তরচরিত-সমালোচনায় চিত্তশুদ্ধির যে দৃষ্টান্তটি দিয়েছেন তাতে বোঝা যায় উপযোগিতাবাদের সঙ্গে বিশুদ্ধ সাহিত্যবোধের একটা সমন্বয় করবারই তিনি চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই দৃষ্টান্তটি তৃপ্তিকর বোধ হয় না। কবি 'সর্বজনমনোহর পবিত্র চরিত্র' সৃষ্টি দ্বারা সৌন্দর্য রচনা করেন। এই চরিত্র দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হবে, চোরও মুগ্ধ হবে। এ রকম চরিত্র পাঠ করলে চোরেরও চিত্তশুদ্ধি হবে, এবং সে অন্যায় কর্মে বিরত হবে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে,

কাব্যে কি কেবল রামচন্দ্রের মতো চরিত্রেরই স্থান? মন্থরা শকুনি ভাঁড়ুদত্ত ইয়াগোদের স্থান নেই?

এই ধারণার দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্রের স্বভাবানুকরণ-তত্ত্বেই আঘাত এসে পড়ে। অর্থাৎ স্বভাবের একটি বিপুল অংশই কবির লক্ষ্যবহির্ভূত হয়ে পড়ে। কিন্তু আর একটু সতর্কভাবে পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় বঙ্কিমচন্দ্র বস্তুত এখানে দুই উদ্দেশ্যের কথাই বলেছেন। 'বাঙ্গালার নব্যলেখকদিগের প্রতি নিবেদন' লেখাটিতে তিনি বলেছেন—

'যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। যাঁহারা অন্য উদ্দেশে লেখেন তাঁহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি হীন ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে।'

সৌন্দর্যসৃষ্টি সকলের সাধ্য নয়। পাঠক অবশ্যই দেখবেন, যাঁদের সাহিত্যে সৌন্দর্য সৃষ্টি নেই, তাঁদের মধ্যে আর কী উদ্দেশ্যের প্রবর্তনা আছে। তাঁরা যদি সাধু চরিত্র অঙ্কন দ্বারা সমাজের কল্যাণ সাধন করেন তবে তাও সাহিত্যের বিস্তৃত ক্ষেত্রে সমাদরণীয় হবে। সৌন্দর্যসৃষ্টিতে সক্ষম সাহিত্যিকের সংখ্যা চিরকালই পরিসীমিত। কিন্তু লেখকদের সংখ্যা কোনো কালেই কম থাকে না। তাঁদের রচনায় আমরা আর কী পেলাম, এটা অবশ্যই আমাদের চিন্তনীয়। নীতির মানেই তাঁদের সাহিত্য বিচার করতে হবে।

সাহিত্যসমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ

সত্যেন্দ্রনাথ রায়

১. সূচনা

সাহিত্যসমালোচনার দুই দিক। এক, তত্ত্বের দিক ; আর-এক হল প্রয়োগের দিক বা ব্যবহারিক দিক। এ দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। কিন্তু প্রেরণা, প্রবৃত্তি ও পদ্ধতির দিক থেকে এদের মধ্যে পার্থক্যও অনেকখানি। সেই কারণে, প্রয়োজন মতো, উভয়কে স্বতন্ত্রভাবেও আলোচনা করা সম্ভব। বর্তমান প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ব্যবহারিক সমালোচনাই আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়, সাহিত্যতত্ত্ব নয়।

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্যকে—তত্ত্ব-আলোচনা নয়, ব্যবহারিক সমালোচনার প্রবন্ধাবলীকে—রচনাকাল ও চরিত্র উভয় দিক থেকে মোটামুটি দুটি পৃথক্ পর্বে ভাগ করে নেওয়া যায়। প্রথম পর্বটি বাল্য ও প্রথম-যৌবনের রচনা নিয়ে। এর এক প্রান্তে রবীন্দ্রনাথের সাড়ে পনেরো বছর বয়সের প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ—'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসরসরোজিনী এবং দুঃখসঙ্গিনী' (জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব, ১২৮৩ কার্তিক, ১৮৭৬), আর অপর প্রান্তে সাধনা পত্রিকার প্রথম প্রকাশ (১২৯৮ অগ্রহায়ণ, ১৮৯১), মোট পনেরো বছর। একে প্রস্তুতিপর্ব আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এই পর্বের অধিকাংশ সমালোচনাপ্রবন্ধেই সমালোচক রবীন্দ্রনাথের প্রধান চেষ্টা হল গীতিকবিতার উৎকর্ষ প্রচার এবং আনুষঙ্গিকভাবে মহাকাব্যের অথবা অনুরূপ ধরনের বিষয়নিষ্ঠ কাব্যের ত্রুটি-প্রদর্শন।

দ্বিতীয় পর্বকে প্রতিষ্ঠাপর্ব আখ্যা দেওয়া যায়। এর আরম্ভ সাধনা পত্রিকার প্রথম প্রকাশ কালে, সমাপ্তি বঙ্গদর্শন পত্রিকার তিরোধানের কিছু পূর্বে। অর্থাৎ এর ব্যাপ্তিকাল ১৮৯১ থেকে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ, এই পনেরো বৎসর। সময়ের দিক থেকে প্রস্তুতিপর্ব আর প্রতিষ্ঠাপর্ব মোটামুটি সমান। কিন্তু গুরুত্বে সমান নয়। শেষের পনেরো বৎসরই রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্যের ভরা ফসলের কাল।

দ্বিতীয় পর্বটিকে আমরা তিনটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি। খানিকটা কালের দিক থেকে, বেশিটাই ভাবের দিক থেকে। প্রথম পর্যায়ে পড়বে 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধ। 'আধুনিক সাহিত্যে'র দু একটি প্রবন্ধ অনেক আগের, রবীন্দ্রনাথের সমালোচকজীবনের প্রথম পর্বের রচনা। তেমনি একটি প্রবন্ধ, 'শুভ-বিবাহ', অনেক পরের রচনা। দ্বিতীয় পর্যায়ে 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের প্রবন্ধ চারটি।

আর তৃতীয় পর্যায়ে 'মেঘদূত' বাদে 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের বাকি প্রবন্ধগুলি। 'আধুনিক সাহিত্যে'র 'শুভবিবাহ' প্রবন্ধটি (বঙ্গদর্শন, ১৩১৩ আষাঢ়, ১৯০৬) এই পর্যায়ের একেবারে শেষ প্রান্তের রচনা। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্যেরও সেইটেই শেষের প্রান্ত। তার পরে নানা উপলক্ষে, নানা রচনায় সমালোচক রবীন্দ্রনাথের আভাস মাত্র পাই, কিন্তু সমালোচক রবীন্দ্রনাথকে আর পাই না, অর্থাৎ কোনো পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা আর পাই না।

২. প্রস্তুতিপর্ব

রবীন্দ্রনাথের প্রথম সমালোচনাপ্রবন্ধ 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা' ইত্যাদি প্রকাশের তিন বৎসর পূর্বে বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রের 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধের পূর্বরূপ 'অবকাশরঞ্জিনী' (১২৮০ বৈশাখ, ১৮৭৩) প্রকাশিত হয়, এবং তার কয়েক মাস পরেই বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধের পূর্বরূপ 'মানসবিকাশ' (১২৮০ পৌষ) প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র গীতিকাব্য, নাটক ও মহাকাব্য—কাব্যজগতের এই তিন প্রধান শাখার প্রত্যেকটির স্থান নির্দেশ করে দিয়েছেন। সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র আলাদা করে গীতিকাব্যের কোনো স্বতন্ত্র মহিমার কথা কিছু বলেননি, গীতিকাব্য যে মহাকাব্যের থেকে উচ্চতর এমন ইঙ্গিত বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় কোথাও নেই। দ্বিতীয় প্রবন্ধে উপরন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা গীতিকবিতার প্রতি কিঞ্চিৎ বক্র কটাক্ষও করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম সমালোচনাপ্রবন্ধের উপলক্ষ তিনখানি অধুনা-বিস্মৃত কাব্যগ্রন্থ —নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভুবনমোহিনী প্রতিভা, রাজকৃষ্ণ রায়ের অবসর-সরোজিনী এবং হরিশ্চন্দ্র নিয়োগীর দুঃখসঙ্গিনী। কিন্তু আসল লক্ষ্য হল বঙ্কিমচন্দ্রের 'গীতিকাব্য' এবং 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধের কাব্যতত্ত্বের প্রতিবাদ। সমালোচনার অবকাশে গীতিকাব্যের উৎকর্ষ প্রচার এবং মহাকাব্যের দোষ-প্রদর্শন।

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'গীতিকাব্য যেমন প্রাচীনকালের তেমনি এখনকার, বরং সভ্যতার সঙ্গে তাহা উন্নতি লাভ করিবে, কেননা সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে যেমন হৃদয় উন্নত হইবে, তেমনি হৃদয়ের চিত্রও উন্নতি লাভ করিবে।'[১]

এই প্রসঙ্গে বাংলা মহাকাব্য সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন, 'এখনকার মহাকাব্যের কবিরা রুদ্ধহৃদয় লোকেদের হৃদয়ে উঁকি মারিতে গিয়া নিরাশ হইয়াছেন ও অবশেষে মিল্টন খুলিয়া ও কখন কখন রামায়ণ ও মহাভারত লইয়া অনুকরণের অনুকরণ

১. র/১৫/১০৬-৭ [সংকেত ;—র=রবীন্দ্ররচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ; প্রথম সংখ্যাটি খণ্ড ও শেষের সংখ্যা পৃষ্ঠাসূচক।]

করিয়াছেন, এই নিমিত্ত মেঘনাদবধে, বৃত্রসংহারে ঐ সকল কবিদিগের পদছায়া স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালার গীতিকাব্য আজকাল যে ক্রন্দন তুলিয়াছে তাহা বাঙ্গালার হৃদয় হইতে উত্থিত হইতেছে।'[২]

শুধু এই সময়েই নয়, এর পাঁচ বৎসর পরে লিখিত 'ডি প্রোফণ্ডিস' প্রবন্ধেও (ভারতী, ১২৮৮ আশ্বিন, ১৮৮১) রবীন্দ্রনাথের অবিকল একই মনোভাব লক্ষ করা যায়। সেখানে আলোচ্য বিষয় হল টেনিসনের গীতিকবিতা, কিন্তু কৌশলে সুযোগ রচনা করে নিয়ে মিল্টনের গুণগ্রাহীদের প্রতি কটাক্ষপাত করে তিনি বলেছেন, 'যাঁহারা একটা দৈত্যকে পর্বত বলিলে, দৈত্যের যষ্টিকে শালবৃক্ষ কহিলে মহান্ ভাবে হাঁ করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে এত বড় কবিতার মহান্ ভাব উপলব্ধি করিতে পারেন না ইহাই আশ্চর্য। বস্তুগত মহান্ ভাব পর্যন্তই বোধকরি তাঁহাদের কল্পনার সীমা, বস্তুর অতীত মহান্ ভাব তাঁহারা আয়ত্ত করিতে পারেন না। তাহা যদি পারিতেন তবে তাঁহারা এই ক্ষুদ্র কবিতাটিকে সমস্ত 'Paradise Lost' অপেক্ষা মহান্ বলিয়া বিবেচনা করিতেন।'[৩]

একে সমালোচনা না বলে নবীন গীতিকবির রোমান্টিক-লিরিক্যাল কাব্যরুচির প্রবল আত্মঘোষণা বলে বর্ণনা করলেই বোধকরি অধিকতর সঙ্গত হবে। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্যের প্রথম পর্বের অধিকাংশ রচনাই অল্পবিস্তর এই জাতীয় বস্তু।

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় সমালোচনাপ্রবন্ধটি সুদীর্ঘ, ভারতীতে ছয় কিস্তিতে প্রকাশিত (১৮৭৭), 'মেঘনাদবধকাব্য', প্রথম পর্যায়। এই প্রবন্ধেও সেই একই মনোভাব। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি অনেক দিক থেকে প্রথম প্রবন্ধ 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা'-ইত্যাদির পরিপূরক। প্রথমটিতে রবীন্দ্রনাথ একটি বিশিষ্ট কাব্যতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেছেন, দ্বিতীয়টিতে তার বিপরীত ধরনের কাব্যের—অর্থাৎ একটি মহাকাব্যের দৃষ্টান্ত নিয়ে তার বিশ্লেষণ এবং সমালোচনা করেছেন। এই দৃষ্টান্ত এখানে মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য।

বালক-সমালোচক মেঘনাদবধ কাব্যের অনেকগুলি ত্রুটির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন। তার কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং সমালোচকের সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচায়ক। দোষের তালিকা দীর্ঘ এবং তার কোনোটিকেই সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেবার উপায় নেই। কয়েকটির উল্লেখ করি। যেমন, মহিমান্বিত প্রবলপ্রতাপ রাবণের রাজসভা বর্ণনার অনৌচিত্য; মহাবীর রাবণের চরিত্রচিত্রণে প্রবল অসঙ্গতি; রাম-

২. র/১৫/১০৭

৩. র/১৩/৬২৩

চরিত্রের ভীরুতা, লক্ষ্মণের নীচতা, ইন্দ্রের কাপুরুষতা—প্রতিপক্ষের এইসব দৌর্বল্যের ফলে নায়ক-পক্ষের মহিমাহানি; সমগ্র মহাকাব্যব্যাপী অশ্রুর বন্যা; ভাষার গুরু-চণ্ডালী দোষ; উপমার কৃত্রিমতা; কাব্যদেহনির্মাণে বাহ্য-কৌশলের বাহুল্য ইত্যাদি ইত্যাদি।

দোষগুলিকে অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু একটা কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে। দোষ কাব্যের কাব্যমূল্যকে নিশ্চয়ই স্পর্শ করে, কিন্তু দোষের তালিকা সব সময় কাব্যের উৎকর্ষ-অনুৎকর্ষের পরিমাপক নয়। অনেক মহৎ কাব্য আছে, দীর্ঘ দোষের তালিকা সত্ত্বেও তা মহৎ কাব্যই থেকে গিয়েছে। অনেক তথাকথিত নির্দোষ কাব্যও কাব্যমূল্যে অকিঞ্চিৎকর হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধ কাব্যের দোষগুলোই দেখেছেন, তার মহত্ত্বের উৎস কোথায় তা দেখেননি। সম্ভবত নিজের কাব্যরুচির কঠোর শাসনই এখানে রবীন্দ্রনাথের কাব্যদৃষ্টিকে আবৃত করে দিয়েছে। সম্ভবত এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধ কাব্যের প্রত্যেক অংশের প্রতি দৃষ্টি দিতে পেরেছেন, কিন্তু সামগ্রিক সৌন্দর্যের দিকে দৃষ্টি দিতে পারেননি।

এর পাঁচ বৎসর পরে ভারতীতে রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় বার মেঘনাদবধকাব্য সমালোচনা করেন। সেই দ্বিতীয় পর্যায়ের 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রবন্ধেও (১২৮৯ ভাদ্র, ১৮৮২) দেখতে পাই, এখানেও সমালোচক-রবীন্দ্রনাথ ঠিক আগের মতোই আপন কবি-স্বভাব এবং আপন কাব্যরুচির দ্বারা পরিচালিত।

দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রবন্ধে মেঘনাদবধ কাব্যকে তিনি বিশেষভাবে মহাকাব্য হিসেবেই বিচার করতে চেষ্টা করেছেন এবং সেই উদ্দেশ্যে এখানে তিনি একটি নতুন মহাকাব্য-তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন। বলা বাহুল্য, এ-মহাকাব্যতত্ত্ব খাঁটি লিরিক কবির মহাকাব্যতত্ত্ব, একে রোমান্টিক কাব্যতত্ত্বেরই একটি সম্প্রসারিত বাহু রূপে গণ্য করা যায়। এ কাব্যতত্ত্বের মূল কথা হল এই যে, দীর্ঘ কাব্য অবাস্তব এবং অসম্ভব জিনিস, তা আসলে বহু-সংখ্যক লিরিকের শিথিল সমষ্টি মাত্র।

এই প্রবন্ধে অনুরূপভাবে রবীন্দ্রনাথ মহাকাব্যকে দেখেছেন কোনো এক কেন্দ্রস্থিত মহৎ চরিত্রের দ্বারা বিধৃত অনেক গীতিকবিতার সমাহার রূপে। রবীন্দ্রনাথের বিবেচনায় মেঘনাদবধ কাব্যের কেন্দ্রে তেমন কোনো মহৎ চরিত্র না থাকার ফলে মহাকাব্য হিসেবে তা সম্পূর্ণ অসার্থক হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মতে, বরং হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহারের কেন্দ্রে সত্যিকারের মহৎ চরিত্র আছে, মেঘনাদবধে কী চরিত্র, কী ভাব, কী কর্ম—কোনো রকম মহত্ত্বই নেই। তাঁর মতে মহাকাব্য হিসেবে মেঘনাদবধ কাব্য অপেক্ষা বৃত্রসংহারের স্থান অনেক উচ্চে। কথাটা তাঁর ভাষাতেই বলি।—

'মেঘনাদবধের অনেক স্থলেই হয়ত কবিত্ব আছে, কিন্তু কবিত্বগুলির মেরুদণ্ড কোথায়! কোন্ অটল অচলকে আশ্রয় করিয়া সেই কবিত্বগুলি দাঁড়াইয়া আছে!··· সেই অভ্রভেদী বিরাট মূর্তি মেঘনাদবধ কাব্যে কোথায়?···মহাকাব্যে মহৎ চরিত্র দেখিতে চাই ও সেই মহৎ চরিত্রের একটি মহৎ কার্য মহৎ অনুষ্ঠান দেখিতে চাই।

'হীন তস্করের ন্যায় নিরস্ত্র ইন্দ্রজিৎকে বধ করা, অথবা পুত্রশোকে অধীর হইয়া লক্ষ্মণের প্রতি শক্তিশেল নিক্ষেপ করাই কি একটা মহাকাব্যের বর্ণনীয় হইতে পারে? এইটুকু যৎসামান্য ক্ষুদ্র ঘটনাই কি একজন কবির কল্পনাকে এত দূর উদ্দীপ্ত করিয়া দিতে পারে যাহাতে তিনি উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে একটি মহাকাব্য লিখিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইতে পারেন? রামায়ণ মহাভারতের সহিত তুলনা করাই অন্যায়, বৃত্রসংহারের সহিত তুলনা করিলেই আমাদের কথার প্রমাণ হইবে। স্বর্গ-উদ্ধারের জন্য নিজের অস্থিদান এবং অধর্মের ফলে বৃত্রের সর্বনাশ—যথার্থ মহাকাব্যের উপযোগী বিষয়।···দেখিতেছি মেঘনাদবধ কাব্যে ঘটনার মহত্ত্ব নাই, একটা মহৎ অনুষ্ঠানের বর্ণনা নাই। তেমন মহৎ চরিত্রও নাই।'[৪]

এই প্রবন্ধের অল্পকাল পূর্বে ভারতীতে রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি (১২৮৮ ফাল্গুন, ১৮৮২) এবং 'বসন্তরায়' (১২৮৯ শ্রাবণ, ১৮৮২), এই প্রবন্ধ দুটি প্রকাশিত হয়। 'মেঘনাদবধ কাব্য' (২) প্রবন্ধটির সঙ্গে একটু আগের এই দুটি প্রবন্ধের ভাবগত মিল লক্ষণীয়। তিন প্রবন্ধেই কবিতায় সহজ ভাব ও সহজ ভাষা বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে। মহাকাব্যের গুরুভার গুণাবলীকে রবীন্দ্রনাথ আসলে সম্পূর্ণ কৃত্রিম ব্যাপার বলে মনে করেন। প্রবন্ধ তিনটিতে ঠিক বিপরীত্ গুণগুলিই—যেমন সরলতা, আড়ম্বরহীনতা, আন্তরিকতা, অকৃত্রিমতা, সহজ ভাব, সহজ ভাষা—রবীন্দ্রনাথ বেছে বেছে প্রশংসা করেছেন। আগের দুই প্রবন্ধে স্পষ্ট ভাষায় এবং তৃতীয় প্রবন্ধে ইঙ্গিতে বলেছেন যে, এই গুণগুলি কাব্য মাত্রেরই আদর্শ গুণ।

রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধটি নানা দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিদ্যা-পতি ও জয়দেব' প্রবন্ধকে স্মরণ করায়। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের বক্তব্য মূলত বঙ্কিম-চন্দ্রের প্রবন্ধের প্রতিবাদ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে প্রাচীন কবিদের অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী, এই রকম সুস্পষ্ট দুই ভাগে ভাগ করে দিয়েছেন। কবিত্বের এই রকম দ্বিখণ্ডীকরণ রবীন্দ্রনাথের মনঃপূত নয়। তাঁর মতে সব ভালো কবিই অন্তর্মুখী কবি। বহির্মুখী কবিদের তিনি যথার্থ কবি বলেই মনে করেন না—অন্তত উচ্চ শ্রেণীর

৪. র/১৩/৬০১-২

নিশ্চয়ই না। বঙ্কিমচন্দ্র একান্ত অন্তর্মুখিতা এবং একান্ত বহির্মুখিতা দুয়েরই নিন্দা করেছেন। তাঁর মতে অন্তর্মুখিতা ও বহির্মুখিতা দুয়ের মিলন ছাড়া সুকাব্য জন্মে না। একান্ত বহির্মুখিতায় কাব্যে ইন্দ্রিয়পরতা দোষ এবং একান্ত অন্তর্মুখিতায় কাব্যে আধ্যাত্মিকতা দোষ জন্মে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই সিদ্ধান্তও রবীন্দ্রনাথের কাছে অশ্রদ্ধেয়। বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাপতিকে অন্তর্মুখী কবি হিসেবে গণনা করেছেন। এও রবীন্দ্রনাথের মতে ভ্রমাত্মক।

এ ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কালের ইংরেজি-শিক্ষিত আধুনিক বাঙালি কবিদের তৃতীয় এক শ্রেণীতে ফেলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে বিস্তৃতি-হেতু হেমচন্দ্র মধুসূদন প্রমুখ নব্য কবিদের প্রগাঢ়তাগুণের লাঘব ঘটেছে। এই সিদ্ধান্ত রবীন্দ্রনাথের মতো নব্য কবি মেনে নিতে পারেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের নামোল্লেখ না করে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে অতি সুন্দরভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যকে খণ্ডন করেছেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ের 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রবন্ধটিতেই কার্যত রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা-সাহিত্যের প্রথম পর্বের পরিসমাপ্তি। পরবর্তী পর্বের আরম্ভ হয়েছে এর অনেক কাল পরে। উভয় পর্বের মাঝখানে নয়-দশ বৎসরের ব্যবধান।

৩. সাধনা-পর্যায়

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্যের দ্বিতীয় পর্বের আরম্ভ 'মেঘদূত' প্রবন্ধটিকে (সাহিত্য, ১২৯৮ অগ্রহায়ণ, ১৮৯১) নিয়ে। ঠিক এই সময় থেকেই সাধনা পত্রিকা প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে।

আগেই বলেছি, এই দ্বিতীয় পর্বটিকে তিনটি পৃথক পর্যায়ে ভাগ করে নেওয়া যায়। প্রথম সাধনা-পর্যায়। স্থূলভাবে ধরলে, একে 'আধুনিক-সাহিত্য' গ্রন্থের প্রবন্ধাবলীর পর্যায়ও বলা যায়। দ্বিতীয় 'লোকসাহিত্য'-পর্যায়। আর তৃতীয় হল, স্থূলভাবে, 'প্রাচীন সাহিত্যে'র প্রবন্ধাবলীর পর্যায়।

সাধনা-পর্যায়ের স্থায়িত্বকাল ১৮৯১ থেকে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ, মোটামুটি এই চার বৎসর। এ হল 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'র কবিতাগুলি রচনার কাল—গল্পগুচ্ছের প্রথম দিকের গল্পগুলির রচনাকাল—'ছিন্নপত্রাবলী'র রচনাকাল।

এই পর্যায়ের প্রথম প্রবন্ধ 'মেঘদূত'। বিষয়বস্তু সংস্কৃত সাহিত্যের, এই কারণে প্রবন্ধটি 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। কিন্তু কালের দিক থেকেও যেমন এ-প্রবন্ধটি 'প্রাচীন সাহিত্যে'র অন্যান্য প্রবন্ধের বহুকাল পূর্বে রচিত, ভাবের দিক থেকেও তেমনি এ-প্রবন্ধ 'প্রাচীন সাহিত্যে'র অন্যান্য রচনা থেকে বহু দূরবর্তী। সামান্য কিছু

অদল-বদল করে নিলে এবং ছন্দে লিখিত হলে রচনাটি অনায়াসে 'সোনার তরী' অথবা 'মানসী' কাব্যগ্রন্থে স্থান পেতে পারত।

রচনাটি কাব্যধর্মী, বুদ্ধি অপেক্ষা হৃদয়ের নিকট এর আবেদন গভীরতর। কেউ যদি একে সমালোচনা বলতে অনিচ্ছুক হন, বিস্মিত হবার কিছু নেই। বিশেষত যখন অল্পকাল পূর্বে প্রকাশিত 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের 'মেঘদূত' কবিতার (রচনা ১৮৯০, ৮ই জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭) সঙ্গে এর ভাব এবং রসাবেদনের মিলের কথা চিন্তা করা যায়। তবে, সমালোচনা কথাটার সংজ্ঞা সুনির্ণীত নয়, পরিধিও সুনির্দিষ্ট নয়। এই অনিশ্চয়তার সুযোগ নিয়ে আমরা একে সমালোচনাপ্রবন্ধ বলেও দাবি করতে পারি।

সমালোচনা বলে স্বীকার করলে বলতে হবে 'মেঘদূত' রস-পরিচয়মূলক সমালোচনা, সৃজনধর্মী সমালোচনা। এর সৃজনাংশের প্রাধান্য এত অবিসংবাদিত, এর এমন একটা স্বয়ংসম্পূর্ণতা আছে যে, একে অপর কোনো রচনার সমালোচনা বলে চিহ্নিত করার কথা মনেই হয় না। সমালোচনা বলি আর না-ই বলি, সাহিত্য হিসেবে 'মেঘদূত' একটি অসামান্য সৃষ্টি তাতে সন্দেহ নেই।

প্রশ্ন উঠতে পারে, রবীন্দ্রনাথকৃত এই ব্যাখ্যা কি যথার্থই কালিদাসের মেঘদূতের ব্যাখ্যা? কালিদাস তো নরনারীর সর্বজন-পরিচিত বাস্তব বিরহের কথাই বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ যে আত্মিক বিরহের ইঙ্গিত দিয়েছেন, তা কালিদাসের কাব্যের পক্ষে সত্য কি? যে-মানসলোকের অখণ্ডতা থেকে আজ আমরা নির্বাসিত হয়েছি বলে রবীন্দ্রনাথ বেদনা বোধ করছেন, সেই মানসলোকের, মনুষ্যত্বের সেই নিবিড় ঐক্যের কোনো ইঙ্গিত কি কালিদাসের কাব্যে আছে? যে অগম মানস-পারে রবীন্দ্রনাথ কল্পনার মেঘদূতকে প্রেরণ করার প্রস্তাব করেছেন, সেই অলৌকিক মানসসরোবরের সন্ধান কি কালিদাসের কাব্যে মিলবে? সমালোচক কি নিজের কল্পনা দিয়ে কালিদাসের কল্পনাকে একটুও আড়াল করে দাঁড়াননি?

সমালোচক সমালোচ্য বিষয়কে আবৃত করে নিজে প্রধান হয়ে উঠেছেন, এ-ধরনের অভিযোগ সৃজনশীল সমালোচনার সম্পর্কে চিরকালই থাকবে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এ-অভিযোগ সত্য। সৃজনশীল সমালোচনা নিজে একটা শিল্পবস্তু। শিল্পবস্তু বলেই সে স্বাধীন, সে সমালোচ্য বিষয়ের অধীন নয়। সৃজনশীল সমালোচনাকে গ্রহণ করতে হলে এই শর্তেই তাকে গ্রহণ করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীল সমালোচনার নিদর্শন হিসেবে 'মেঘদূত', 'কাব্যের উপেক্ষিতা' আর 'রাজসিংহ', এই তিনটি প্রবন্ধই সব থেকে উল্লেখযোগ্য। তিনটি প্রবন্ধই সৃষ্টি হিসেবে অসাধারণ। কিন্তু প্রথম দুটিতে সৃজনের রাজকীয় ঐশ্বর্য স্তম্ভিত

পাঠকের মনোযোগকে সমালোচ্য বিষয় থেকে সরিয়ে সমালোচকের স্বকীয় অনুভবের পরিধিতে নিবদ্ধ করে রাখে, তৃতীয়টিতে তা করে না। সৃজনশীল হলেও সমালোচনাপ্রবন্ধের পরিচিত রূপটি 'রাজসিংহে' (সাধনা, ১৩০০ চৈত্র, ১৮৯৪) মোটামুটি অক্ষুন্নই আছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে রাজসিংহ ঐতিহাসিক উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথের মতেও তাই। কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্পর্কে কোনো দু-জন লোকেরই ধারণা হুবহু এক নয়। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'হিন্দুদিগের বাহুবলই আমার প্রতিপাদ্য'। হিন্দুর বাহুবল প্রতিপাদন করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র আওরঙ্গজেবকে যেভাবে দেখিয়েছেন তাতে ইতিহাসের সত্য ক্ষুন্ন হয়েছে কি না এ প্রশ্ন উঠতে পারে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এ অভিযোগ তোলেন নি। ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শ সম্পর্কে তাঁর অভিমত তিনি 'সাহিত্য' গ্রন্থের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' প্রবন্ধে স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করেছেন। তিনি মনে করেন,'... ইতিহাসের সংস্রবে উপন্যাসে একটা বিশেষ রস সঞ্চার করে, ইতিহাসের সেই রসটুকুর প্রতি ঔপন্যাসিকের লোভ, তাহার সত্যের প্রতি তাঁহার কোনো খাতির নাই।'[৫]

পুনশ্চ—

'...লেখক ইতিহাসকে অখণ্ড রাখিয়াই চলুন আর খণ্ড করিয়াই রাখুন, সেই ঐতিহাসিক রসের অবতারণা সফল হইলেই হইল।'[৬] এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, ইতিহাস আর ঐতিহাসিক উপন্যাস দুয়ের ক্ষেত্র আলাদা, কাজ আলাদা। পাঠক সত্যের জন্য ইতিহাস পড়বেন, আর আনন্দের জন্য ঐতিহাসিক উপন্যাস পড়বেন।

সাধারণ পারিবারিক উপন্যাসে পাত্রপাত্রীর সুখদুঃখের পরিধি সীমাবদ্ধ, কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাসে দেশকালের পটভূমি সুবিস্তৃত, ঘটনার পরিধি বিশাল, পাত্রপাত্রীর সুখদুঃখের ক্ষেত্রও বিস্ফারিত। ঐতিহাসিক উপন্যাসে 'মহাকালের সুদূর কার্যপরম্পরা যে সমুদ্রগর্জনের সহিত উঠিতেছে পড়িতেছে সেই মহান্ কলসংগীতের সুরে তাহাদের ব্যক্তিগত বিরাগ অনুরাগ বাজিয়া উঠিতে থাকে।'[৭]

রবীন্দ্রনাথের মতে ঐতিহাসিক উপন্যাসের লক্ষ্য বিস্তার ও বিশালতা। এই বিশালতার রসকেই রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক রস বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'এই রস

৫. র/১৩/৮২০

৬. তদেব

৭. র/১৩/৮১৯

মহাকাব্যের প্রাণস্বরূপ।'[৮] যে-রস মহাকাব্যের প্রাণস্বরূপ, তার দিকে দৃষ্টি রেখেই রবীন্দ্রনাথ রাজসিংহ উপন্যাসের আলোচনা করেছেন, ইতিহাসের তথ্যের কতোখানি বিকৃতি ঘটেছে কি ঘটেনি, তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কিছুমাত্র চিন্তিত হননি।

যে-উপন্যাস ইতিহাসের সত্যের প্রতি আকৃষ্ট নয়, ঐতিহাসিক ভ্রান্তিতে, এমন কি মিথ্যাতেও যার আপত্তি নেই, তেমন উপন্যাসে ঐতিহাসিক রসের সঞ্চার সম্ভব কি না, ইতিহাসের বিকৃতিতে ঐতিহাসিক রসের বিকৃতি ঘটে কি না, সে প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথ উত্থাপনই করেননি। বুঝতে হবে, ঐতিহাসিক রস বলতে তিনি এপিক-রসকেই বুঝেছেন। বুঝতে হবে, এপিক উপন্যাসকেই—বা অনেকটা ওই জাতীয় বস্তুকেই রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেছেন। রাজসিংহ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র কী ভাবে ইতিহাস এবং মানবহৃদয়কে একসঙ্গে গেঁথে দিলেন, অথবা বলি, কী ভাবে মানবহৃদয়কে সুবৃহৎ দেশকালের পটভূমিতে স্থাপিত করলেন, কী উপায়ে উপন্যাসের মধ্যে মহাকালের সমুদ্রগর্জন ধ্বনিত করে তুললেন, কোন্ কৌশলে উপন্যাসের মধ্যে মহাকাব্যোচিত বিশাল-রস সঞ্চারিত হল, সমালোচক রবীন্দ্রনাথের সমস্ত মনোযোগ সেই দিকে নিবদ্ধ।

এই সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসমধ্যগত কার্যকারণ-পরম্পরা ও তার ঔচিত্যকে উপন্যাসের গঠনের বিশেষত্বের সঙ্গে, উপন্যাসের রূপের ঔচিত্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চেষ্টা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, কেন রাজসিংহ উপন্যাসের গঠন ও বিষয়বিন্যাস বিষবৃক্ষ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হতে বাধ্য। তিনি দেখিয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্র রাজসিংহ উপন্যাসে ঘটনা, পাত্রপাত্রী, কাহিনীর গতি—সমস্ত কিছুকে তাঁর অভীষ্ট ঐতিহাসিক রসের অনুকূল করে সাজিয়েছেন। রাজসিংহ উপন্যাসের সাফল্যের মূলে যে তার ফর্ম ও কণ্টেণ্টের ঐক্য, তার রূপ ও চরিত্রের, তার নির্মিতি ও বিষয়বস্তুর, অভীষ্ট রস এবং রস-সঞ্চার-প্রণালীর ঐক্য, সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ এই মূল্যবান সত্যের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন, 'রাজসিংহের গল্পটা সৈন্যদলের চলার মতো; ঘটনাগুলা বৃহৎ ব্যূহ রচনা করিয়া বৃহৎ আকারে চলিয়াছে। এই সৈন্যদলের নায়ক যাঁহারা তাঁহারাও সমান বেগে চলিয়াছেন।···ইতিহাসের সমস্ত প্রবাহ তখন একটি সংকীর্ণ সন্ধিপথে বজ্রস্তনিত রবে ফেনাইয়া চলিতেছে।···ঘন বর্ষার কাল রাত্রে মৃত্যু হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে আসিয়া দোলা দিয়াছে।···এই অকস্মাৎ মৃত্যুর দোলায় সকলেই সজাগ হইয়া উঠিয়াছে এবং আপনার অন্তরবাসী মহাপ্রাণীর আলিঙ্গন অনুভব করিতেছে।

৮. তদেব, ৮১৮

কোথায় ছিল ক্ষুদ্র রূপনগরের অন্তঃপুরপ্রান্তে একটি বালিকা···সেই পুষ্পপ্রতিমা সুকুমার সুন্দর বালিকাটুকুর মধ্যে কী এক দুর্বার প্রাণশক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিল, সে আজ বাঁধমুক্ত বন্যার একটি গর্বোদ্ধত প্রবল তরঙ্গের ন্যায় দিল্লির সিংহাসনে গিয়া আঘাত করিল। কোথায় ছিল মোগল রাজপ্রাসাদের রত্নখচিত রঙমহলে সুন্দরী জেবউন্নিসা—সে সুখের উপর সুখ, বিলাসের উপর বিলাস বিকীর্ণ করিয়া আপনার অন্তরাত্মাকে আরামের পুষ্পরাশির মধ্যে আচ্ছন্ন অচেতন করিয়া রাখিয়াছিল—সেদিনের সেই মৃত্যুদোলায় হঠাৎ তাহার অন্তরশয্যা হইতে জাগ্রত হইয়া তাহাকে কোন্ মহাপ্রাণী এমন নিষ্ঠুর কঠিন বাহুবেষ্টনে পীড়ন করিয়া ধরিল, সম্রাট দুহিতাকে কে সেই সর্বত্রগামী দুঃখের হস্তে সমর্পণ করিল যে দুঃখ প্রাসাদের রাজরাজেশ্বরীকেও কুটিরবাসিনী কৃষক-কন্যার সহিত এক বেদনাশয্যায় শয়ান করাইয়া দেয়। দস্যু মাণিকলাল হইল বীর··· গৃহপিঞ্জরের নির্মলকুমারী বিপ্লবের বহিরাকাশে উড়িয়া আসিল, এবং নৃত্যকুশলা পতঙ্গচপলা দরিয়া সহসা অট্টহাস্যে মুক্তকেশে কালনৃত্যে আসিয়া যোগ দিল।'[৯]

'রাজসিংহ' প্রবন্ধের প্রকাশ ও বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু একই মাসের ঘটনা। ঠিক তার পরের মাসেই সাধনায় রবীন্দ্রনাথের 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধটি (১৩০১ বৈশাখ, ১৮৯৪) প্রকাশিত হয়। এটি বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো রচনা বিশেষের সমালোচনা নয়। প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের দানের সামগ্রিক মূল্যায়ন। প্রবন্ধটিতে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের— স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো পরিচয় নেই বটে, কিন্তু অত্যন্ত স্বল্প পরিসরে সংস্কৃতি-নায়ক বঙ্কিম-চন্দ্রের যে নানামুখী পরিচয় এখানে তুলে ধরা হয়েছে, বঙ্কিমসাহিত্যের যে-কোনো গবেষকের কাছেই তা মহামূল্য দিগ্‌দর্শনীর মতো।

বিহারীলালের মৃত্যুর পরে রচিত 'বিহারীলাল' প্রবন্ধটি (সাধনা, ১৩০১ আষাঢ়, ১৮৯৪) সামগ্রিক পরিচয়ের ভঙ্গীতে রচিত হলেও, কার্যত প্রবন্ধটি বিহারীলালের সারদামঙ্গল কাব্যের সমালোচনা। কাব্যখানি বাংলাসাহিত্যে রোমান্টিক গীতিকবিতার প্রথম পর্বের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। এই কাব্যের আলোচনার উপলক্ষে বহুকাল পরে আবার রবীন্দ্রনাথের কাছে রোমান্টিক গীতিকবিতার পক্ষসমর্থনের এবং সেই সূত্রে আবার মহাকাব্য কাহিনীকাব্য ইত্যাদির প্রতি বিরূপ কটাক্ষপাতের সুযোগ এসে উপস্থিত হল। এবং, বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ সে-সুযোগের সদ্ব্যবহারও করলেন।—

'বিহারীলাল তখনকার ইংরেজিভাষায় নব্য-শিক্ষিত কবিদিগের ন্যায় যুদ্ধবর্ণনা-সংকুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা লিখিলেন না এবং পুরাতন

৯. র/১৩/৯৪০-৪১

কবিদিগের ন্যায় পৌরাণিক উপাখ্যানের দিকেও গেলেন না— তিনি নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন।'[১০]

রবীন্দ্রনাথের মতে বিহারীলাল বাংলাসাহিত্যে আধুনিক গীতিকবিতার 'ভোরের পাখি'। তিনি লিখেছেন, 'ঠিক ইতিহাসের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু আমি সেই প্রথম বাংলা কবিতায় নিজের স্বর শুনিলাম।'[১১]

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির মর্মসত্যকে গ্রহণ করায় বাধা নেই, কিন্তু কথাটাকে আক্ষরিক বা তার কাছাকাছি অর্থে গ্রহণ করা যায় না। বিহারীলাল প্রসঙ্গে 'ভোরের পাখি' কথাটি বহু-ব্যবহৃত। সেই কারণে বিষয়টির একটু বিস্তৃত আলোচনা দরকার।

রামপ্রসাদ কমলাকান্ত প্রমুখ শাক্ত পদকর্তাদের আগমনী-বিজয়ার গানে অথবা সাধনসংগীতে অনেক সময়ই কবির নিজের কথা শুনতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক লিরিকের অগ্রদূত হিসেবে তাঁদের কথা বাদ দিয়েছেন, সম্ভবত সেটা ইতিহাসের কথা, এই যুক্তিতে। নিধুবাবু শ্রীধর কথক প্রমুখ প্রণয়সংগীত রচয়িতাদেরও রবীন্দ্রনাথ বাদ দিয়েছেন। তাঁরা সকলেই জীর্ণ ইতিহাস-গ্রন্থের বিষয় নন, অন্তত রবীন্দ্রনাথের কালে ছিলেন না। সম্ভবত সংগীতকার বলেই তাঁরা বাদ গিয়েছেন, যদিও বাংলা কাব্যের ক্ষেত্র থেকে সংগীতকারদের বাদ দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলীকেও রবীন্দ্রনাথ বাদ দিয়েছেন। বলেছেন, চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে সনেটের কঠিন বন্ধনের কারণেই বেদনার গীতোচ্ছ্বাস তেমন স্ফূর্তি পায় নাই। চতুর্দশপদী কবিতাবলীর অনেক কবিতাই হয়ত বাদের যোগ্য, কিন্তু তার কোনোটিতেই কবির মনের কথা প্রকাশিত হয়নি, এমন কথা মেনে নেওয়া কঠিন। তাছাড়া, মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ' (আশার ছলনে ভুলি) অথবা 'বঙ্গভূমির প্রতি' (রেখো মা দাসেরে মনে) প্রভৃতি খণ্ড-কবিতা? এগুলি সারদামঙ্গলের আগে রচিত। রবীন্দ্রনাথ কি এদেরও বিস্মৃত ইতিহাসের কোঠায় ফেলতে চান?

বস্তুত ভোরের সূচনা সারদামঙ্গল কাব্য থেকেই নয়, তার বেশ পূর্ব থেকেই হয়েছে, যেমন একটু-একটু করে ভোর হয়, সেইভাবেই। 'আত্মবিলাপে'র কবিকে অবশ্যই ভোরের পাখি বলতে হবে। সন্দেহ হয়, মহাকাব্য-রচনার অপরাধের জন্যই রবীন্দ্রনাথ ঠিক সময়ে মধুসূদনের কথাটি বিস্মৃত হয়েছেন।

তবে, এ-কথা অবশ্য-স্বীকার্য যে, আধুনিক বাংলা লিরিকের পথ-প্রদর্শকদের মধ্যে বিহারীলাল প্রধান একজন। এবং এ-কথাও নিশ্চয়ই সত্য যে, বিহারীলালই প্রথম

---

১০. র/১৩/৯০১

১১. তদেব, ৯০০

উল্লেখযোগ্য বাঙালি কবি, যিনি সারা জীবন একনিষ্ঠভাবে কেবল আপন মনে আপন কথাই বলে গিয়েছেন।

লেখক-পরিচিতি জাতীয় প্রবন্ধের মধ্যে 'সঞ্জীবচন্দ্র' (সাধনা, ১৩০১ পৌষ) উল্লেখযোগ্য। সৌন্দর্যের প্রতি সঞ্জীবচন্দ্রের অকৃত্রিম অনুরাগ, ছোটোবড়ো সমস্ত জিনিসকে সজীব কৌতূহলের সঙ্গে গ্রহণ করার ক্ষমতা, সহজ সরস বর্ণনাভঙ্গী রবীন্দ্রনাথকে খুবই মুগ্ধ করেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভার অসম্পূর্ণতা ও অসংলগ্নতার বিষয়েও রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ সচেতন। তিনি বলেছেন যে সঞ্জীবচন্দ্রের '...মধ্যে যে পরিমাণ ক্ষমতা ছিল সে পরিমাণ উদ্যম ছিল না।'[১২] — উদ্যমহীনতার অভাবে যে উদাসীনতা ও বিশৃঙ্খলতা এসেছে, তা-ই সঞ্জীবচন্দ্রের সাহিত্যপ্রতিভাকে সম্পুর্ণ রাহুগ্রস্ত করে ফেলেছে।

কথাগুলি বিশেষভাবে সঞ্জীবচন্দ্রকে লক্ষ্য করে বলা হলেও, অনেক প্রতিভাশালী বাঙালি লেখক সম্পর্কেই বোধকরি অল্পবিস্তর প্রযোজ্য। প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছেন, 'তাঁহার [সঞ্জীবচন্দ্রের] ঐশ্বর্য ছিল কিন্তু গৃহিনীপনা ছিল না।... তাঁহার অপেক্ষা অল্প ক্ষমতা লইয়া অনেকে যে পরিমাণ সাহিত্যের অভাবমোচন করিয়াছেন তিনি প্রচুর ক্ষমতা সত্ত্বেও তাহা পারেন নাই... ।'[১৩]

'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে রাজসিংহ ছাড়া আরো তিনখানি উপন্যাসের সমালোচনা সংকলিত হয়েছে। এক, শরৎকুমারী চৌধুরানীর শুভবিবাহ উপন্যাসের সমালোচনা ; দুই, শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের ফুলজানি উপন্যাসের সমালোচনা এবং তিন, শিবনাথ শাস্ত্রীর যুগান্তর উপন্যাসের সমালোচনা। এর কোনোটিই সমালোচনা হিসেবে খুব উল্লেখযোগ্য নয়। সম্ভবত সমালোচ্য বিষয়ের দৈন্যই এক্ষেত্রে সমালোচনার অনুজ্জ্বলতার মূল কারণ।

প্রবন্ধ তিনটির মধ্যে প্রথমটিকে— অর্থাৎ 'শুভবিবাহ'কে যথার্থ সমালোচনা না বলে প্রীতিমধুর বন্ধুকৃত্য বললেই বেশি সঙ্গত হয়। 'ফুলজানি'তেও প্রচুর বন্ধুকৃত্য আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবান সমালোচনাও সেখানে পাওয়া যাবে। সুহৃদের উপন্যাসখানির সম্পর্কে— বিশেষ করে এর কাহিনী ও পরিবেশের খাঁটি বাঙালিত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যতই মুগ্ধতা থাকুক না কেন, উপন্যাসটির গঠনগত ত্রুটি তাঁর দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। এ উপন্যাসের প্রথমাংশের সঙ্গে এর শেষাংশের, মূল কাহিনীর সঙ্গে পরিণতির কোনো অনিবার্য যোগ নেই। শিবনাথ শাস্ত্রীর যুগান্তর

১২. র/১৫/৯১৬

১৩. র/১৩/৯১৬

উপন্যাসখানিতেও অনেকটা অনুরূপ ব্যাপার ঘটেছে। দুটি সম্পূর্ণ পৃথক্ কাহিনীকে লেখক জোর করে এক উপন্যাসের কাঠামোর মধ্যে বেঁধে রেখেছেন। এ ত্রুটি শুধু গঠনের নয়, গঠন এবং বিষয়বস্তু উভয়েরই।

'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধটি (সাধনা, ১৩০১ মাঘ-ফাল্গুন, ১৮৯৫) বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থের সমালোচনা। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থটিকে ইতিহাস-সমালোচনা বা ঐতিহাসিক গবেষণা রূপেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ধারণা কিছু ভিন্ন। তিনি মন্তব্য করেছেন, 'বঙ্কিম, মেকলে কার্লাইল লামার্টিন থুকি-দিদীস প্রভৃতি উদাহরণ দেখাইয়া মহাভারতকে কবিত্বময় ইতিহাস বলিতে চাহেন ; আমরা মহাভারতকে ঐতিহাসিক কাব্য বলিয়া গণ্য করি।'[১৪]

রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে, আপাতদৃষ্টিতে ঐতিহাসিক গবেষণা বলে মনে হলেও, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রয়াসটি মূলত তথ্যভিত্তিক গবেষণা নয়, এম্‌পিরিক্যাল অনুসন্ধান নয়। ইতিহাসের বাতাবরণ থাকলেও, কৃষ্ণচরিত্র কার্যত একটি জীবনতত্ত্বের প্রতিষ্ঠার প্রয়াস — একটি দার্শনিক তত্ত্বালোচনা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধের প্রথম দিকেই বলেছেন, 'আমাদের মতে কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থের নায়ক কৃষ্ণ নহেন, তাহার প্রধান অধিনায়ক স্বাধীন বুদ্ধি, সচেষ্ট চিত্তবৃত্তি।··· এই মূল ভাবটিই কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থের ভিতরকার অধ্যাত্মশক্তি, ইহাই সমস্ত গ্রন্থটিকে মহিমান্বিত করিয়া রাখিয়াছে।'[১৫]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমালোচনায় এই মূল ভাবটিকেই অনুসরণ করেছেন। সেই কারণে, রবীন্দ্রনাথের 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধটিকেও তত্ত্বগ্রন্থের সমালোচনা হিসেবে দেখাই সঙ্গত, সাহিত্যসমালোচনা হিসেবে নয়।

৪. লোকসাহিত্য

দ্বিতীয় পর্বের দ্বিতীয় পর্যায়ে 'লোকসাহিত্য'। 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের প্রবন্ধ চতুষ্টয় 'আধুনিক সাহিত্যে'র অধিকাংশ প্রবন্ধের পরে এবং 'প্রাচীন সাহিত্যে'র অধিকাংশ প্রবন্ধের আগে রচিত। মোটামুটিভাবে বলা যায়, সময়টা উক্ত দুই গ্রন্থের রচনাকালের মাঝখানে সেতুর মতো : ১৮৯৫ থেকে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দ, এই পাঁচ বছর। অর্থাৎ রবীন্দ্র-নাথের পূর্ববঙ্গবাসের শেষের দিক। পদ্মার দুই তীরের লোকজীবনের সঙ্গে যোগ এই সময় ঘনিষ্ঠতম।

'ছেলে ভুলানো ছড়া' (১) প্রবন্ধে (সাধনায় 'মেয়েলি ছড়া' নামে প্রকাশিত, ১৩০১

১৪. র/১৩/৯৩১

১৫. র/১৩/৯২৬

ভাদ্র-আশ্বিন, ১৮৯৪) রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে, ছড়ার জগৎ অনেকটা স্বপ্নের জগতের মতো। সে জগতে সংলগ্নতা নেই, কিন্তু ছবি আছে। সে ছবি অদ্ভুত, কিন্তু স্বপ্নেরই মতন বিশ্বাসজনকতার শক্তিতে সত্যবৎ।

ছড়াগুলি যেন এক-একটা টুক্‌রো জগৎ, যেন কোন্ সুদূর এক অর্ধবিস্মৃত আদিম জগতের ভগ্নাবশেষ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'অনেক প্রাচীন ইতিহাস প্রাচীন স্মৃতির চূর্ণ অংশ এই সকল ছড়ার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, কোনো পুরাতত্ত্ববিৎ আর তাহা-দিগকে জোড়া দিয়া এক করিতে পারেন না, কিন্তু আমাদের কল্পনা এই ভগ্নাবশেষগুলির মধ্যে সেই বিস্মৃত প্রাচীন জগতের একটি সুদূর অথচ নিকট পরিচয় লাভ করিতে চেষ্টা করে।'[১৬]

ছড়াগুলিতে বাঙালির সমাজজীবনের পারিবারিক জীবনের একটি চিরকালীন রূপ দেখতে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, '…প্রায় প্রত্যেক ছড়ায় প্রত্যেক তুচ্ছ কথায় বাংলা দেশের একটি মূর্তি, গ্রামের একটি সংগীত, গৃহের একটি আস্বাদ পাওয়া যায়।'[১৭]

রবীন্দ্রনাথ ঋগ্বেদের ইন্দ্র চন্দ্র বরুণের স্তবগানের সঙ্গে মাতৃহৃদয় থেকে উত্থিত ছোটো ছোটো খোকাখুকুর এই স্তবগুলির তুলনা করে বলেছেন, 'প্রাচীনতা হিসাবে কোনোটাই ন্যূন নহে। কারণ, ছড়ার পুরাতনত্ব ঐতিহাসিক পুরাতনত্ব নহে, তাহা সহজেই পুরাতন। তাহা আপনার আদিম সরলতাগুণেই মানব-রচনায় সর্বপ্রথম। সে এই উনবিংশ শতাব্দীর তীব্র মধ্যাহ্ন-রৌদ্রের মধ্যেও মানব-হৃদয়ের নবীন অরুণোদয়রাগ রক্ষা করিয়া আছে।'[১৮]

ছড়া এবং মেঘের রূপের, স্বভাবের এবং ক্রিয়ার সাদৃশ্য দেখিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্য শেষ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'উভয়েই পরিবর্তনশীল, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ুস্রোতে যদৃচ্ছাভাসমান। দেখিয়া মনে হয় নিরর্থক।… অথচ জড়জগতে এবং মানবজগতে এই দুই উচ্ছৃঙ্খল অদ্ভুত পদার্থ চিরকাল মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতেছে। মেঘ বারিধারায় নামিয়া আসিয়া শিশু-শস্যকে প্রাণদান করিতেছে এবং ছড়াগুলি স্নেহরসে বিগলিত হইয়া কল্পনাবৃষ্টিতে শিশু-হৃদয়কে উর্বর করিয়া তুলিতেছে।'[১৯]

---

১৬. র/১৩/৬৭১

১৭. তদেব, ৬৭৬

১৮. র/১৩/৬৬৭

১৯. র/১৩/৬৮৯

'কবি-সংগীত' প্রবন্ধটিকে (১৩০২) 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করার কোনো যুক্তি নেই। তার কারণ, কবিগানের মতো হঠাৎ-বড়োলোকের মনোরঞ্জনকারী একটি অল্প-পরমায়ু বস্তুকে কোনোক্রমেই খাঁটি লোকসাহিত্যের নিদর্শন রূপে গ্রহণ করা চলে না। খাঁটি লোকসাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ ধানের মঞ্জরীর সঙ্গে, মাটির পাত্রে ক্ষুধার অন্নের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কবিগান সে-জাতীয় বস্তু নয়। 'কবি-সংগীত' প্রবন্ধের সূচনাতেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী বসন্তকালের অপর্যাপ্ত পুষ্পমঞ্জরীর মতো; যেমন তাহার ভাবের সৌরভ, তেমনি তাহার গঠনের সৌন্দর্য। রাজসভাকবি রায়-গুণাকরের অন্নদামঙ্গলগান রাজকণ্ঠের মণিমালার মতো. যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার কারুকার্য।... এই কবির গানগুলিও গান, কিন্তু ইহাদের মধ্যে সেই ভাবের গাঢ়তা এবং গঠনের পারিপাট্য নাই।'[২০]

আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে স্রষ্টার স্থান পরিবেশের উর্ধ্বে, ইতিহাসের উর্ধ্বে, প্রাকৃতিক নিয়মের উর্ধ্বে। এই সাহিত্যতত্ত্ব সাহিত্যের সমাজতাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিক ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী নয়। কিন্তু 'কবি-সংগীত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজে কবি-গানের উদ্ভবের এবং চারিত্রিক বিশেষত্বের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা খাঁটি সমাজ-তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা, খাঁটি ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা।

এই ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'পূর্বেকার গানগুলি হয় দেবতার সম্মুখে নয় রাজার সম্মুখে গীত হইত— সুতরাং স্বতঃই কবির আদর্শ অত্যন্ত দুরূহ ছিল।... ইংরেজের নূতনসৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না, পুরাতন আদর্শ ছিল না। তখন কবির আদর্শ ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি, এবং সেই হঠাৎ-রাজার সভায় উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান। তখন যথার্থ সাহিত্যরস আলোচনার অবসর, যোগ্যতা ও ইচ্ছা কয়জনের ছিল? কেবল নূতন সমৃদ্ধিশালী কর্মশ্রান্ত বণিক্‌সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে বসিয়া দুই দণ্ড আমোদের উত্তেজনা চাহিত, তাহারা সাহিত্যরস চাহিত না।

'কবির দল তাহাদের সেই অভাব পূর্ণ করিতে আসরে অবতীর্ণ হইল।...নূতন হঠাৎ-রাজার মনোরঞ্জনার্থে এই এক অপূর্ব নূতন ব্যাপারের সৃষ্টি হইল।'[২১]

যেটুকু সাধুবাদ কবিওয়ালাদের প্রাপ্য, তা দিতে রবীন্দ্রনাথ কুণ্ঠিত হননি। বস্তুত সেই প্রসঙ্গ দিয়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধের উপসংহার রচনা করেছেন।—

'তথাপি এই নষ্টপরমায়ু কবির দলের গান আমাদের সাহিত্য এবং সমাজের

---

২০. র/১৩/৭১০

২১. র/১৩/৭১০

ইতিহাসের একটি অঙ্গ— এবং ইংরেজ-রাজ্যের অভ্যুদয়ে যে আধুনিক সাহিত্য রাজসভা ত্যাগ করিয়া পৌরজনসভায় আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে, এই গানগুলি তাহারই প্রথম পথপ্রদর্শক।'[২২]

রবীন্দ্রনাথের মতে, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে উচ্চ স্তরের সাহিত্য ও নিম্ন স্তরের সাহিত্যের মধ্যে বরাবর একটি নিবিড় যোগ দেখতে পাওয়া যায়। এই যোগের ফলে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের সর্বত্রই কিছু-পরিমাণে লোকসাহিত্যের লক্ষণ দেখা যায়। 'গ্রাম্য সাহিত্য' প্রবন্ধে (১৩০৫) এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'নিচের সহিত উপরের এই-যে যোগ, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। অন্নদামঙ্গল ও কবিকঙ্কণের কবি যদিচ রাজসভা ধনিসভার কবি, যদিচ তাঁহারা উভয়ে পণ্ডিত, সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে বিশারদ, তথাপি দেশীয় প্রচলিত সাহিত্যকে বেশি দূর ছাড়াইয়া যাইতে পারেন নাই।... কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ধর্মমঙ্গল, মনসার ভাসান, সত্যপীরের কথা, সমস্তই গ্রাম্য কাহিনী অবলম্বনে রচিত। সেই গ্রাম্য ছড়াগুলির পরিচয় পাইলে তবেই ভারতচন্দ্র-মুকুন্দরাম-রচিত কাব্যের যথার্থ পরিচয় পাইবার পথ হয়। রাজসভার কাব্যে ছন্দ মিল ও কাব্যকলা সুসম্পূর্ণ সন্দেহ নাই, কিন্তু গ্রাম্য ছড়াগুলির সহিত তাহার মর্মগত প্রভেদ ছিল না।'[২৩]

পূর্বকালে উচ্চ ও নিম্ন সাহিত্যের মধ্যে নিবিড় যোগ ছিল, এ কালে সেই যোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। যাকে আমরা আধুনিক বাংলা সাহিত্য বলি তা শহরের তথাকথিত ভদ্রসম্প্রদায়ের সাহিত্য, ইংরেজি-শিক্ষিত সভ্য-সম্প্রদায়ের সাহিত্য, জনজীবনের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই। এই দুস্তর সংস্কৃতির বিচ্ছেদের জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রধানত ইংরেজি শিক্ষাকে— বিশেষভাবে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাকেই দায়ী করেছেন। শিক্ষা সংক্রান্ত একাধিক প্রবন্ধে এ-বিষয়ে তিনি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এ-প্রবন্ধে অবশ্য তিনি সে-আলোচনায় প্রবৃত্ত হননি।

গ্রাম্য সাহিত্য ও গ্রাম্য ছড়াকে রবীন্দ্রনাথ মোটামুটিভাবে দু ভাগে ভাগ করে নিয়েছেন ঃ এক, হরগৌরী বিষয়ক ; দুই, রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক। হরগৌরীর গান মূলত দাম্পত্য-প্রেমের গান, সমাজবন্ধনের স্বীকৃতির গান। হরগৌরীর গান সমাজসংসারের গান, গৃহস্থালীর গান। এ গান স্বভাবতই বাস্তবরসপ্রধান। রাধাকৃষ্ণের গান স্বাধীন প্রেমের গান, শাস্ত্রশাসন ও সমাজবন্ধন লঙ্ঘন করার গান। এ গানে সমাজসংসার ঘর-গৃহস্থালী নেই, আছে কূলভাঙা প্লাবন। রাধাকৃষ্ণের গানে ভাবের স্বাধীনতা বিস্ময়কর।

২২. তদেব, ৭১৪

২৩. র/১৩/৭১

প্রবন্ধের উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ ঈষৎ ক্ষোভের সঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে, বাংলা দেশে হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণের তুলনায় রামসীতার দাম্পত্যকাহিনী বা রামরাবণের বীরত্বকাহিনী অনেক স্বল্পপরিচিত।—

'আমাদের দেশে হরগৌরী-কথায় স্ত্রীপুরুষ এবং রাধাকৃষ্ণ-কথায় নায়কনায়িকার সম্বন্ধ নানারূপে বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু তাহার প্রসর সংকীর্ণ, তাহাতে সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের খাদ্য পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে রাধাকৃষ্ণের কথায় সৌন্দর্যবৃত্তি এবং হরগৌরীর কথায় হৃদয়বৃত্তির চর্চা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে ধর্মপ্রবৃত্তির অবতারণা হয় নাই।...রামায়ণ-কথায় এক দিকে কর্তব্যের দুরূহ কাঠিন্য, অপর দিকে ভাবের অপরিসীম মাধুর্য, একত্র সম্মিলিত।... বাংলাদেশের মাটিতে সেই রামায়ণ-কথা হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণের কথার উপরে যে মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে নাই তাহা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য।'[২৪]

৫. প্রাচীন সাহিত্য

'মেঘদূত' প্রবন্ধটিকে বাদ দিলে (পূর্বেই বলেছি, 'মেঘদূত' অনেক আগের, 'সোনার তরী'-পর্বের রচনা) 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের প্রধান প্রবন্ধগুলিকে রচনাকাল ও ভাব উভয় দিক থেকেই দুটি স্বতন্ত্র গুচ্ছে ভাগ করা যায়। আগের দিকের প্রবন্ধগুলিকে নিয়ে প্রথম গুচ্ছ, আর পরের দিকের প্রবন্ধগুলিকে নিয়ে দ্বিতীয় গুচ্ছ।

প্রথম গুচ্ছের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হল 'কাদম্বরী চিত্র' (১৩০৬ মাঘ, ১৯০০) এবং 'কাব্যের উপেক্ষিতা' (ভারতী, ১৩০৭ বৈশাখ, ১৯০০)। শুধু রচনাকালের দিক থেকেই নয়, রূপ এবং ভাবের দিক থেকেও এদের সঙ্গে 'কথা ও কাহিনী', 'কল্পনা' ও 'ক্ষণিকা' কাব্যের অনেক কবিতার মিল লক্ষ্য করা যাবে। দুটি প্রবন্ধেরই লক্ষ্য প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য— এবং সেই সূত্রে প্রাচীন ভারত। কিন্তু প্রাচীন ভারতের সাধনা বা আদর্শ এর মুখ্য বিষয় নয়, এর উপজীব্য হল প্রাচীন ভারতের রূপ— জীবনের চিত্র, সংস্কৃত সাহিত্যে সেদিনের জীবনের যে রূপটি ফুটে উঠেছে, সেই রূপ।

প্রবন্ধ দুটির মধ্যে দ্বিতীয়টি অর্থাৎ 'কাব্যের উপেক্ষিতা' সৃজনশীল সমালোচনা, মূল গ্রন্থকে উপলক্ষ করে সমালোচকের স্বাধীন সৃষ্টিলীলা। 'কাদম্বরী চিত্র' ভিন্ন ধরনের রচনা, সেখানে রবীন্দ্রনাথ স্বাধীন সৃজনের সুযোগ গ্রহণ করেননি। কিন্তু দুটি প্রবন্ধই মুক্ত মনের রচনা, কোনোটিতেই সমালোচ্য বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধার আবেগ সমালোচনাকে অভিভূত করেনি। কোনোটিতেই সমালোচনার ক্ষেত্রে সহজ সাহিত্য-

২৪. র/১৩/৭৩৩-৩৪

আদর্শকে আবৃত করে সমালোচকের নৈতিক দায়িত্ববোধ প্রবল হয়ে উঠবার সুযোগ পায়নি।

দ্বিতীয় গুচ্ছের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ তিনটি: 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' (১৩০৮ পৌষ), 'শকুন্তলা' (১৩০৯ আশ্বিন, ১৯০২) এবং 'রামায়ণ' (১৩১০ পৌষ)। প্রবন্ধ তিনটির কোনোটিতেই বিশুদ্ধ সাহিত্য-আদর্শের প্রয়োগ নেই, কোনোটিতেই খাঁটি সাহিত্যবিচার নেই, কোনোটির আলোচনাই রসাস্বাদন-কেন্দ্রিক নয়। তিনটির কোনোটিতেই সাহিত্যকে বিশুদ্ধ সাহিত্য হিসেবে, তার শিল্পমূল্যে দেখা হয়নি, দেখা হয়েছে জীবন-মূল্যের সঞ্চয় হিসেবে। প্রবন্ধ তিনটিতে যে বিচার আছে, তাকে নৈতিক বিচার বা জীবনাদর্শের বিচার ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি— সংস্কৃত সাহিত্যে যে জীবনদর্শন অভিব্যক্ত হয়েছে সেই জীবনদর্শনের প্রতি—গভীর শ্রদ্ধায় প্রত্যেকটি প্রবন্ধই বিনম্র ও বিগলিত। রামায়ণে যে আদর্শ প্রচারিত হয়েছে, কালিদাস তাঁর কাব্যে নাটকে যে জীবনদর্শন প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তার প্রতি ভক্তিতে তিনটি প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ প্রথমাবধি নতজানু। প্রবন্ধগুলি মোটামুটিভাবে 'নৈবেদ্য' কাব্যের সনেটগুলির সমকালীন। দৃষ্টিভঙ্গী এবং ভাবের দিক থেকেও প্রবন্ধগুলি 'নৈবেদ্যে'র সনেটেরই সমগোত্রীয়। এদের আসল লক্ষ্য পথ-সন্ধান, আদর্শ প্রতিষ্ঠা, আদর্শ প্রচার।

প্রথম গুচ্ছের 'কাদম্বরী চিত্র' মূলত প্রদীপে প্রকাশিত একটি ছবির আলোচনা। ছবিটি কাদম্বরী-কাহিনী অবলম্বনে অংকিত। ছবি সংক্রান্ত হলেও, ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা এর প্রধান অংশ। এই প্রবন্ধের একটি মূল্যবান দিক হল সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য।—

'সংস্কৃত ভাষা কথ্য ভাষা ছিল না বলিয়াই সে ভাষায় ভারতবর্ষের সমস্ত হৃদয়ের কথা সম্পূর্ণ করিয়া বলা হয় নাই। ইংরেজি অলংকারে যে শ্রেণীর কবিতাকে lyrics বলে তাহা মৃত ভাষায় সম্ভবে না।···

'মৃত ভাষায়, পরের ভাষায় গল্পও চলে না; কারণ গল্পে লঘুতা এবং গতিবেগ আবশ্যক। ভাষা যখন ভাসাইয়া লইয়া যায় না, ভাষাকে যখন ভারের মতো বহন করিয়া চলিতে হয়, তখন তাহাতে গান এবং গল্প সম্ভব হয় না।'[২৫]

সাহিত্যের ভাষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য গভীর অভিনিবেশ সহকারে অনুধাবন করার যোগ্য। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছেন, 'দুর্ভাগ্যক্রমে সংস্কৃত গদ্য সর্বদা-ব্যবহারের জন্য নিযুক্ত ছিল না, সেইজন্য বাহুশোভার বাহুল্য তাহার অল্প

২৫. র/১৩/৬৬২ (৩২)

নহে। মেদস্ফীত বিলাসীর ন্যায় তাহার সমাসবহুল বিপুলায়তন দেখিয়া সহজেই বোধ হয় সর্বদা চলা-ফেরার জন্য সে হয় নাই; বড়ো বড়ো টীকাকার ভাষ্যকার পণ্ডিত বাহকগণ তাহাকে কাঁধে করিয়া না চলিলে তাহার চলা অসাধ্য। অচল হোক, কিন্তু কিরীটে কুণ্ডলে কঙ্কণে কণ্ঠমালায় সে রাজার মতো বিরাজ করিতে থাকে।'[২৬]

'মেঘদূত' এবং 'কাব্যের উপেক্ষিতা' দুই-ই সৃজনশীল সমালোচনা, কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও লক্ষণীয়। 'মেঘদূতে'র ক্ষেত্রে যে সৃজন, তা ভাবের পথে, ব্যঞ্জনার পথে সৃজন, অর্থাৎ তা কাব্যধর্মী সৃজন। 'কাব্যের উপেক্ষিতা'য় যে সৃজন, তা এসেছে কাহিনীর পথ ধরে, চরিত্রের পথ ধরে, অকথিত কথার ইঙ্গিতে, অবর্ণিত বেদনার বর্ণনায়, সুপ্ত সম্ভাবনার পরিস্ফুটনের পথে। এ সৃজন আখ্যানধর্মী সৃজন, কথা-সাহিত্যিকের সৃজন।

'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত সাহিত্যের তিনখানি বিখ্যাত গ্রন্থের বিরুদ্ধে স্নিগ্ধ সরস সংবেদনশীল একটি অভিযোগ উপস্থিত করেছেন। অভিযোগ, কি ছদ্ম-অভিযোগ বলা কঠিন। অভিযোগের ছলনা-লীলার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বাধীন সৃজনের অবকাশ রচনা করেছেন— এমনও বলা যায়।

অভিযুক্ত গ্রন্থ তিনখানির একটি হল বাল্মীকির রামায়ণ, একটি কালিদাসের শকুন্তলা এবং তৃতীয়খানি বাণভট্টের কাদম্বরী। অভিযোগ এই যে, তিন ক্ষেত্রেই মূল লেখক তাঁর গ্রন্থের কোনো-না-কোনো সম্ভাবনাপূর্ণ নারী-চরিত্রের প্রতি অযৌক্তিক অবহেলা দেখিয়েছেন।—

রামায়ণে কবি তাঁর কল্পনা-উৎসের যত করুণাবারি সমস্তই কেবল সীতাদেবীর অভিষেকে নিঃশেষ করেছেন, সর্বসুখ-বঞ্চিতা ম্লানমুখী অব্যক্তবেদনা দেবী উর্মিলার জন্য এক বিন্দু অভিষেকবারিও অবশিষ্ট রাখেননি। শকুন্তলা নাটকে কবির সমস্ত মনোযোগ শকুন্তলার প্রতি; অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা কবিকর্তৃক উপেক্ষিতা। সংস্কৃত সাহিত্যের আর একটি অনাদৃতা হল কাদম্বরী কাহিনীর পত্রলেখা।

এর মধ্যে বাল্মীকি এবং কালিদাসের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ, তাকে ইচ্ছা করলে আমরা ছদ্ম-অভিযোগ বলেও বর্ণনা করতে পারি। কারণ এখানে যে অভিযোগ, তা কোনো কাব্যগত ত্রুটির বিরুদ্ধে নয়। এ অভিযোগ কাব্যের অপরিহার্য নির্মমতার বিরুদ্ধে, যে নির্মমতার মূল্যে কাব্য তার শিল্পগত উৎকর্ষকে অর্জন করে— অভিযোগ কাব্যের অনিবার্য সংযমের বিরুদ্ধে, তার কঠিন সংহতির বিরুদ্ধে। কিন্তু বাণভট্টের বিরুদ্ধে যে-অভিযোগ, তাকে ছদ্ম-অভিযোগ বলা চলে না। তা যথার্থ কাব্যগত ত্রুটির

২৬. র/১৩/৬৬২ (৩৩)

বিরুদ্ধেই অভিযোগ। পত্রলেখার প্রতি কবি যে উপেক্ষা দেখিয়েছেন, তা জীবনের ঔচিত্যকে— এবং সেই কারণে কাব্যের ঔচিত্যকে লঙ্ঘন করে। ঊর্মিলার প্রতি অনাদরে, অনসূয়া-প্রিয়ংবদার প্রতি অবহেলায় যে কাব্যের ঔচিত্য লঙ্ঘিত হয়নি, এ কথা রবীন্দ্রনাথের মোটেই অজানা নয়। কিন্তু পত্রলেখার প্রতি অমনোযোগের ফলে কাদম্বরী-কাহিনী একটি মূল্যবান সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত হয়ে ছকে-বাঁধা প্রাণহীন উপ-কথায় পরিণত হয়েছে।

'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধের পত্রলেখা-সম্পর্কিত অংশটিকে সৃজনশীল সমালোচনা বলা চলে না। অভিযোগ এখানে সৃজনের উপলক্ষমাত্র নয়। এই অংশের আলোচনাকে প্রচলিত তদ্‌গত এবং বিচারমূলক সমালোচনা বলেই মানতে হবে। এই সমালোচনায় সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক এক মুহূর্তে কাদম্বরী-কাহিনীর দুর্বলতম স্থানটিতে অঙ্গুলি সংস্থাপন করেছেন।

অপর দুটি ক্ষেত্রে উপেক্ষার অভিযোগ প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন সৃষ্টির উপলক্ষ ছাড়া আর কিছু নয়। দুটি উপলক্ষই সম্পূর্ণ সার্থক। সে সার্থকতা স্বতঃপ্রমাণিত, প্রমাণ পরিচয় বর্ণনা কিছুরই অপেক্ষা রাখে না।

গৌণ চরিত্রকে উপেক্ষা বা না-দেখার সংযমেই, না-দেখার শক্তিতেই যে রামায়ণ রামায়ণ হয়ে উঠেছে, একথা রবীন্দ্রনাথের থেকে বেশি আর কে জানে? প্রশ্নের ছলে, ঊর্মিলা যে কেন উপেক্ষিতা তার উত্তর রবীন্দ্রনাথ নিজেই দিয়েছেন। 'পাছে সীতার সহিত ঊর্মিলার পরম দুঃখ কেহ তুলনা করে, তাই কি কবি সীতার স্বর্ণমন্দির হইতে এই শোকোজ্জ্বল মহাদুঃখিনীকে একেবারে বাহির করিয়া দিয়াছেন—জানকীর পাদপীঠ-পার্শ্বেও বসাইতে সাহস করেন নাই?'[২৭]

—এ-সম্পর্কে চূড়ান্ত মন্তব্যও আমরা রবীন্দ্রনাথের কাছেই পাব: 'জানি, কাব্যের মধ্যে সকলের সমান অধিকার থাকিতে পারে না।…কাব্য হীরার টুকরার মতো কঠিন।'[২৮]

শুধু একটি কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। যে অব্যক্তবেদনা দেবী ঊর্মিলার বেদনার সঞ্চয়কে আমাদের সামনে রবীন্দ্রনাথ উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছেন, সেই শোকোজ্জ্বল মহাদুঃখিনী নারী রামায়ণের ঊর্মিলা নয়; মহাকবির কল্পনাতে ছিল না তার ছবি, রবীন্দ্রনাথের মনোভূমিই তার জন্মভূমি।

ঠিক তেমনি অনসূয়া-প্রিয়ংবদার যে বসন্ত-বিহ্বল আত্মবিস্মরণের ইন্দ্রজাল দিয়ে

---

২৭. র/১৩/৬৬২ (৪০)

২৮. তদেব

রবীন্দ্রনাথ আমাদের সম্মোহিত করে দিয়েছেন, সেই আত্মবিস্মরণের জন্মভূমিও রবীন্দ্রনাথের মনোভূমি। তারা সুপ্ত সম্ভাবনার নবাঙ্কুর, তারা কালিদাসের হয়েও কালিদাসের নয়।—

উর্মিলার মতো অনসূয়া-প্রিয়ংবদাও নতুন সৃষ্টি—'বিদায়-অভিশাপ' কি 'কর্ণকুন্তী-সংবাদ' অথবা 'গান্ধারীর আবেদনে'র পাত্রপাত্রীর সগোত্র। কিন্তু পত্রলেখা তা নয়। পত্রলেখায় রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কল্পনার সংযোজন কিছুই নেই। যা আছে, তা বাণভট্টের রচনারই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও বিচার।—

'পত্রলেখা পত্নী নহে, প্রণয়িনী নহে, কিঙ্করীও নহে, পুরুষের সহচরী। এই অপরূপ সখিত্ব দুই সমুদ্রের মধ্যবর্তী একটি বালুতটের মতো। কেমন করিয়া তাহা রক্ষা পায়! নবযৌবন কুমারকুমারীর মধ্যে অনাদিকালের যে চিরন্তন প্রবল আকর্ষণ আছে তাহা দুই দিক হইতেই এই সংকীর্ণ বাঁধটুকুকে ক্ষয় করিয়া লঙ্ঘন করে না কেন!

'কিন্তু কবি সেই অনাথা রাজকন্যাকে চিরদিনই এই অপ্রশস্ত আশ্রয়ের মধ্যে বসাইয়া রাখিয়াছেন···। একটি সূক্ষ্ম যবনিকার আড়ালে বাস করিয়াও সে আপনার স্থান পাইল না। পুরুষের হৃদয়ের পার্শ্বে সে জাগিয়া রহিল, কিন্তু ভিতরে পদার্পণ করিল না। কোনো দিন একটা অসতর্ক বসন্তের বাতাসে এই সখিত্ব-পর্দার একটা প্রান্তও উড়িয়া পড়িল না।...'[২৯]

এই প্রবন্ধের দেড় বছর পরে 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় গুচ্ছের প্রথম প্রবন্ধ 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' (পৌষ ১৩০৮)। এই প্রসঙ্গে দুটি ঘটনা উল্লেখ করার মতো। এক, এরই বছর খানেক আগে 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের সুগম্ভীর সনেটগুলির রচনা শুরু হয়েছে। প্রাচীন ভারতের সুমহান আধ্যাত্মিক আদর্শ তখন রবীন্দ্রনাথের মানসচক্ষুর সম্মুখে নিত্য-দীপ্যমান। দ্বিতীয় ঘটনা আরো একটু আগের। তখন সবে টলস্টয়ের 'What is Art' বইখানি পড়ে উঠেছেন। বইখানি যে রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে তা জানতে পারি বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে লেখা পত্রে (২৩ আশ্বিন, ১৩০৭)।[৩০] টলস্টয়ের শিল্পতত্ত্বের প্রবল নৈতিকতা, প্রবল ধর্মীয়তা 'What is Art' গ্রন্থের পাঠকমাত্রেরই সুবিদিত।

এইখানে এসেই রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা-সাহিত্য নৈতিক সমালোচনার অভিমুখে বাঁক নিয়েছে। 'নীতি' কথাটাকে সংকীর্ণ অর্থে ধরলে হয়ত ভুল হবে। এ নীতি

২৯. র/১৩/৬৬২ (৬২)

৩০. বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৫০ পৃ ৭১৪, রবীন্দ্রজীবনী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১ম খণ্ড, ৪৫৫ দ্রষ্টব্য।

জীবনের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট, এখানে জীবনবোধ থেকে নীতিবোধকে এবং নীতিবোধ থেকে জীবনবোধকে পৃথক করার উপায় নেই। যে-গভীরে এই মূল্যবোধের উৎস, আমাদের সাহিত্যবোধ কখনোই তাকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করে যায় না। অর্থাৎ সেই গভীরে সাহিত্যমূল্য জীবনমূল্য থেকে অবিচ্ছেদ্য। অন্তত 'শকুন্তলা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সেই গভীরেই গিয়ে পৌচেছেন। মহৎ সাহিত্যের মহত্ত্ব যে নিছক শিল্পমূল্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তা যে জীবনমূল্যেও মহৎ—এবং সেই জীবনমূল্য ও শিল্পমূল্য যে অবিশ্লেষ্যভাবে ঐক্যবদ্ধ, 'শকুন্তলা'র সমালোচনা আমাদের সেই ইঙ্গিতই দেয়।

সাধারণভাবে বলা চলে, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের নৈতিক বিচারে আস্থাশীল নন। সাহিত্যতত্ত্বে তিনি আনন্দবাদী। সাহিত্যসমালোচনাতেও তাই। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী জীবন-রসিকের দৃষ্টিভঙ্গী, নীতিবাদীর দৃষ্টিভঙ্গী নয়। কিন্তু এইখানে এসে তাঁর সাহিত্য-তত্ত্বে আনন্দ গৌণ হয়ে কল্যাণকে সর্বোচ্চ স্থান ছেড়ে দিয়েছে।

যথাস্থানে নৈতিক সমালোচনার মূল্যকে অবহেলা করা যায় না। 'শকুন্তলা' প্রবন্ধটির অসাধারণত্বের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু নৈতিক সমালোচনার বিপদও অনেক। তার সব থেকে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিশ্বসাহিত্যের মহামূল্যবান রত্নরাজি সম্পর্কে টলস্টয়ের অভিমত। নৈতিক সমালোচনার প্রধান বিপদ অগভীর নৈতিকতা। দ্বিতীয় বিপদ তার একদেশদর্শিতা। তৃতীয় বিপদ পরিসরের সংকীর্ণতা। এই সংকীর্ণতা থেকেই আনন্দবিমুখী সাহিত্যবিরোধী মনোভাবের জন্ম হয়। সৌভাগ্যক্রমে এই গোঁড়ামি রবীন্দ্রনাথকে স্পর্শ করেনি।

'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' প্রবন্ধের মূল কথাটি প্রথমেই সূত্রাকারে বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই দেখিয়েছেন যে, কালিদাস সৌন্দর্যসম্ভোগের কবি, এই প্রচলিত ধারণাটি ভুল। তিনি বলেছেন, '…কালিদাসের সৌন্দর্যচাঞ্চল্যের মাঝখানে ভোগ-বিরতি স্তব্ধ হইয়া আছে। …[মহাভারতকারের মতো] কালিদাসকেও একই কালে সৌন্দর্যসম্ভোগের এবং ভোগবিরতির কবি বলা যাইতে পারে। তাঁহার কাব্য সৌন্দর্যবিলাসেই শেষ হইয়া যায় নাই—তাহাকে অতিক্রম করিয়া তবে কবি ক্ষান্ত হইয়াছেন।'[৩১]

এই হ্রস্ব ভূমিকার পরেই রবীন্দ্রনাথ শকুন্তলা নাটক এবং কুমারসম্ভব কাব্যের একেবারে কেন্দ্রগত তত্ত্বে এসে উপস্থিত হয়েছেন।—

'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ধীবরের হাত হইতে আংটি পাইয়া যেখানে দুষ্যন্ত আপনার

৩১. র/১৩/৬৬২ (১০)

ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন সেইখানেই ব্যর্থ পরিতাপের মধ্যে য়ুরোপীয় কবি শকুন্তলা-নাটকের যবনিকা ফেলিতেন।··

'তেমনি এখনকার কবি কুমারসম্ভবে হতমনোরথ পার্বতীর দুঃখ ও লজ্জার মধ্যে কাব্য শেষ করিতেন।··· এখনকার সমালোচকের মতে এইখানেই কাব্যের উজ্জ্বলতম সূর্যাস্ত, তাহার পরে বিবাহের রাত্রি অত্যন্ত বর্ণচ্ছটাহীন।'[৩২]

কিন্তু কালিদাসের শকুন্তলা নাটক ব্যর্থ পরিতাপের মধ্যে শেষ হয়নি, কুমারসম্ভব কাব্যও অকৃতার্থপ্রেমের বেদনাকে চিরকাল অমর করে রাখেনি, তাকে অতিক্রম করে প্রাত্যহিক সংসারের ভূমিকা নিয়ে বিবাহের রাত্রি এসে উপস্থিত হয়েছে।—

প্রবন্ধের উপসংহারে এই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের বিবাহ-আদর্শের প্রসঙ্গে এসেছেন।—

'দেখা গেল, কুমারসম্ভব এবং শকুন্তলা কাব্যের বিষয় একই। উভয় কাব্যেই কবি দেখাইয়াছেন, মোহে যাহা অকৃতার্থ মঙ্গলে তাহা পরিসমাপ্ত ; দেখাইয়াছেন, ধর্ম যে সৌন্দর্যকে ধারণ করিয়া রাখে তাহাই ধ্রুব এবং প্রেমের শান্তসংযত কল্যাণরূপই শ্রেষ্ঠ রূপ···। ভারতবর্ষের পুরাতন কবি প্রেমকেই প্রেমের চরম গৌরব বলিয়া স্বীকার করেন নাই, মঙ্গলকেই প্রেমের পরম লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার মতে নরনারীর প্রেম সুন্দর নহে, স্থায়ী নহে, যদি তাহা বন্ধ্যা হয়, যদি তাহা আপনার মধ্যেই সংকীর্ণ হইয়া থাকে, কল্যাণকে জন্মদান না করে এবং সংসারে পুত্রকন্যা-অতিথি-প্রতিবেশীর মধ্যে বিচিত্রসৌভাগ্যরূপে ব্যাপ্ত হইয়া না যায়।

'এক দিকে গৃহধর্মের কল্যাণবন্ধন, অন্য দিকে নির্লিপ্ত আত্মার বন্ধনমোচন, এই দুইই ভারতবর্ষের বিশেষ ভাব।'[৩৩]

এই আলোচনায় আলোচ্য বিষয়ের নৈতিক মূল্য যে অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রতিপাদিত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু বিশুদ্ধ সাহিত্যমূল্যের দিকটি যে উপেক্ষিত হয়েছে তা-ও মানতে হবে। কেউ যদি একে খাঁটি সাহিত্যসমালোচনা বলে মানতে আপত্তি করেন, খুব দোষ দেওয়া যায় না।

নৈতিক মূল্য যে কখনো কখনো জীবনমূল্যের সঙ্গে এবং সেই সূত্রে সাহিত্যমূল্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ এক হয়ে যায়, নৈতিক সমালোচনা যে নৈতিক হয়েও খাঁটি সাহিত্যিক সমালোচনা হতে পারে, তার অতি দুর্লভ দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা' প্রবন্ধ (১৩০৯ আশ্বিন, ১৯০২)।

---

৩২. র/১৩/৬৬২ (১০)

৩৩. তদেব, ৬৬২ (১৬-৭)

'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা' প্রবন্ধের উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, '...দেস্‌দিমোনার আলেখ্য অধিকতর প্রোজ্জ্বল বলিয়া দেস্‌দিমোনার কাছে শকুন্তলা দাঁড়াইতে পারে না। নতুবা ভিতরে দুই এক। শকুন্তলা অর্ধেক মিরন্দা, অর্ধেক দেস্‌দিমোনা। পরিণীতা শকুন্তলা দেস্‌দিমোনার অনুরূপিণী, অপরিণীতা শকুন্তলা মিরন্দার অনুরূপিণী।'[৩৪]

'শকুন্তলা' প্রবন্ধের সূচনাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে রবীন্দ্রনাথ সুস্পষ্ট মন্তব্য করেছেন, 'শেক্‌স্‌পীয়রের টেম্পেস্ট-নাটকের সহিত কালিদাসের শকুন্তলার তুলনা মনে সহজেই উদয় হইতে পারে। ইহাদের বাহ্য সাদৃশ্য এবং আন্তরিক অনৈক্য আলোচনা করিয়া দেখিবার বি য়।

'...উভয়ের আখ্যানমূলে ঐক্য দেখিতে পাই। কিন্তু কাব্যরসের স্বাদ সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহা পড়িলেই অনুভব করিতে পারি।'[৩৫]

শকুন্তলা নাটকের প্রবেশক সূত্রটি রবীন্দ্রনাথ 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' প্রবন্ধেই আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন : মোহে যাহা অকৃতার্থ মঙ্গলে তাহা পরিসমাপ্ত, প্রথম অঙ্কের উন্মত্ত সৌন্দর্যের অত্যুজ্জ্বলতা শেষ অঙ্কের প্রশান্ত বিরলবর্ণ পরিণামেই নিজেকে চরিতার্থ করে। গ্যেটের উক্তির মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ এই কথারই সমর্থন খুঁজে পেয়েছেন।—

রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন কালিদাস কেমন অনায়াসে শকুন্তলা নাটকে মর্ত্য ও স্বর্গের স্বভাব ও ধর্মের মিলনসাধন করেছেন। 'কালিদাস তাঁহার এই আশ্রমপালিতা উদ্ভিন্নযৌবনা শকুন্তলাকে সংশয়বিরহিত স্বভাবের পথে ছাড়িয়া দিয়াছেন, শেষ পর্যন্ত কোথাও তাহাকে বাধা দেন নাই। আবার অন্য দিকে তাহাকে অপ্রগল্‌ভা, দুঃখশীলা, নিয়মচারিণী, সতীধর্মের আদর্শরূপিণী করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।... বন্ধন ও অবন্ধনের সংগমস্থলে স্থাপিত হইয়াই শকুন্তলা-নাটকটি একটি বিশেষ অপরূপত্ব লাভ করিয়াছে।'[৩৬]

শকুন্তলার আরম্ভে নিষ্কলুষ স্বর্গলোক, তারপর সেই স্বর্গে পাপের অলক্ষ্য প্রবেশ। পরে লজ্জা দুঃখ বিচ্ছেদ অনুতাপ। সর্বশেষে উন্নততর স্বর্গলোকে ক্ষমা ও শান্তি। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'শকুন্তলাকে একত্রে Paradise Lost এবং Paradise Regained বলা যাইতে পারে।'[৩৭]

---

৩৪. বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, পৃ ৮৮

৩৫. র/১৩/৬৬২ (১৭)

৩৬. তদেব, ৬৬২ (১৯)

৩৭. তদেব, ৬৬২ (২৭)

প্রায় সমস্ত দিক থেকেই টেম্পেস্ট ও শকুন্তলা পৃথক্। 'এমন স্থলে তুলনায় সমালোচনা বৃথা।…এই দুই কাব্যকে পাশাপাশি রাখিলে উভয়ের ঐক্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই বেশী ফুটিয়া উঠে।'[৩৮]

মিরন্দার সরলতা অজ্ঞানতার সরলতা, অগভীর সরলতা। শকুন্তলার সরলতা আভ্যন্তরিক সরলতা। মিরন্দার সরলতা বহির্ঘটনাগত, শকুন্তলার সরলতা স্বভাবগত। শকুন্তলা নাটকে মানুষ ও প্রকৃতি নিবিড় প্রীতিবন্ধনে বদ্ধ, টেম্পেস্ট নাটকে মানুষ বিশ্বকে খর্ব করে বড় হয়ে উঠেছে। টেম্পেস্ট নাটকে বলের দ্বারা বলকে প্রতিহত করা দেখানো হয়েছে, শকুন্তলায় প্রেমের দ্বারা, মঙ্গলের দ্বারা পাপকে একেবারে ভিতর থেকে নির্মূল করা দেখানো হয়েছে।

উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ গ্যেটের সমালোচনার পুনরুল্লেখ করেছেন, 'টেম্পেস্টে শক্তি, শকুন্তলায় শান্তি। টেম্পেস্টে বলের দ্বারা জয়, শকুন্তলায় মঙ্গলের দ্বারা সিদ্ধি। টেম্পেস্টে অর্ধপথে ছেদ, শকুন্তলায় সম্পূর্ণতায় অবসান।…গ্যেটের সমালোচনা অনুসরণ করিয়া পুনর্বার বলি, শকুন্তলায় আরম্ভের তরুণ সৌন্দর্য মঙ্গলময় পরম পরিণতিতে সফলতা লাভ করিয়া মর্ত্যকে স্বর্গের সহিত সম্মিলিত করিয়া দিয়াছে।'[৩৯]

'রামায়ণ' প্রবন্ধটিও (১৩১০ পৌষ) অনুরূপভাবে বাল্মীকির মহাকাব্যের ধর্মীয় ও নৈতিক তাৎপর্যের ব্যাখ্যা। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, এ প্রবন্ধে বিচার নেই, আছে পূজার আবেগ মিশ্রিত ব্যাখ্যা। বলা বাহুল্য, এ-ব্যাখ্যা খাঁটি সাহিত্য-ব্যাখ্যা নয়, রামায়ণের কোনো সাহিত্যগত জটিলতাকে এখানে ব্যাখ্যার সাহায্যে সরলীকৃত করা হয়নি। এ ব্যাখ্যা রামায়ণের নৈতিক তাৎপর্যের ব্যাখ্যা। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, এই নৈতিক তাৎপর্যকে বাদ দিয়ে রাময়ণের বিশুদ্ধ শিল্পগত বিচার কখনোই সম্ভব নয়।

এই প্রবন্ধের গোড়ার দিকে মহাকাব্য হিসেবে রামায়ণের স্বরূপ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। মহাকাব্য কোনো ব্যক্তিবিশেষের নয়, তা সমগ্র জাতির প্রাণের কথা— সমগ্র জাতির সম্পত্তি। রামায়ণ কোনো একলা কবির স্বগত-সংগীত নয়, রাময়ণ একটি বৃহৎ সম্প্রদায়ের অন্তরের কথা। রামায়ণ এমন কবির কীর্তি 'যাহার রচনার ভিতর দিয়া একটি সমগ্র দেশ, একটি সমগ্র যুগ আপনার হৃদয়কে, আপনার অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করিয়া তাহাকে মানবের চিরন্তন সামগ্রী করিয়া তোলে। …কালিদাসের শকুন্তলা-কুমারসম্ভবে বিশেষভাবে কালিদাসের নিপুণ হস্তের পরিচয়

৩৮. তদেব, ৬৬২ (২০)

৩৯. তদেব, ৬৬২ (২৯)

পাই। কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতকে মনে হয়, যেন জাহ্নবী ও হিমাচলের ন্যায় তাহারা ভারতেরই, ব্যাস ও বাল্মীকি উপলক্ষ্য মাত্র।'

রামায়ণে ভারতবর্ষের যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত হয়েছে, যুগ যুগ ধরে যে আদর্শকে ভারতবর্ষ পূজা করে এসেছে, এ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের আসল লক্ষ্য সেই আদর্শের দিকে।

সাহিত্যসমালোচনা কথাটাকে সুবিস্তৃত অর্থে ধরলে 'রামায়ণ' সাহিত্যসমালোচনা, এবং উৎকৃষ্ট সাহিত্যসমালোচনা। অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ অর্থে ধরলে, সাহিত্যসমালোচনা নয়, আদর্শ বিশেষের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।

৬. উপসংহার

'রামায়ণে'র আড়াই বছর পরে 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থের 'শুভ বিবাহ' প্রবন্ধ (বঙ্গদর্শন, ১৩১৩ আষাঢ়, ১৯০৬)। তার পরেই সমালোচনার জগৎ থেকে রবীন্দ্রনাথের বিদায় গ্রহণ।

বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিকতা ও গীতিকবিতার আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করা, তার প্রচার করা, তার প্রতিকূলতাকে খণ্ডন করা, অনেকটা এই উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রণোদিত হয়েই রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনার জগতে পদক্ষেপ করেন। তখন তিনি বালক। তার পর থেকে সাহিত্যতত্ত্ব তাঁর সারা জীবনের সঙ্গী। কিন্তু সমালোচনা তা নয়। বিংশ শতকে পা দেবার প্রথম কয়েক বছর পরেই রবীন্দ্রনাথের সমালোচক-জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। উত্তরপর্বের কবি-সংগীতকার-ঔপন্যাসিক-নাট্যকার রবীন্দ্রনাথকে আমরা পেয়েছি, উত্তরপর্বের সাহিত্যতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথকেও আমরা পেয়েছি, কিন্তু উত্তরপর্বের সমালোচক রবীন্দ্রনাথকে আমরা পাইনি।

সন্দেহ জাগে, তাহলে কি সমালোচনা ঠিক সেই অর্থে রবীন্দ্রনাথের স্বধর্ম নয়, যে-অর্থে কবিতা লেখা কি গান রচনা করা, উপন্যাস কি নাটক রচনা করা রবীন্দ্রনাথের স্বধর্ম— এমন কি সাহিত্যতত্ত্বচর্চা যে-অর্থে রবীন্দ্রনাথের স্বধর্ম? কিন্তু পরধর্মই বা বলি কী করে? পরধর্মে কি 'মেঘদূত' বা 'রাজসিংহে'র মতো, 'কাব্যের উপেক্ষিতা' বা 'শকুন্তলা'র মতো সিদ্ধি সম্ভব?

কবি-সমালোচকদের, শিল্পী-সমালোচকদের বোধকরি এই রকমই হয়। সমালোচনা তাঁদের সৃষ্টিশক্তিরই— তাঁদের কবিত্বশক্তিরই সম্প্রসারিত বাহু; অনেকটা প্রান্তিক বা সীমান্তবর্তী বৃত্তির মতো; ইচ্ছা করলেই স্বধর্ম, ইচ্ছা না করলেই নয়। খানিকটা

ভিতরের তাগিদ, খানিকটা বাইরের প্রয়োজনের চাপ, এই দুয়ের শুভ-সংযোগ ঘটলে তবেই তাঁরা সমালোচক, নতুবা নন। যতক্ষণ এই শুভ-সংযোগ সত্য, ততক্ষণই সমালোচনা তাঁদের স্বধর্ম, কিন্তু সংযোগ ভেঙে গেলে আর সমালোচনায় তাঁরা উৎসাহী নন।

অন্তত রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই রকমই ঘটেছে বলে মনে হয়। যে-কারণেই হোক না কেন, বিংশ শতাব্দীতে পা দিয়ে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই বাঞ্ছিত সংযোগটি ভেঙে গিয়েছে। হয়ত এরি সঙ্গে, সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকীয় দায়িত্বের অবসান, শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয়ের নতুন কর্তব্যের আহ্বান, স্বদেশী আন্দোলনের ভাঁটার টান, গীতাঞ্জলি-পর্বের প্রবল আধ্যাত্মিকতার ভার, দ্রষ্টা ও ভাবুক হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিলাভ, গুরুর পদবীতে আরোহণ— এই সব ঘটনাও এর মধ্যে কিছু ক্রিয়া করে থাকবে।

সাধারণ সমালোচকের ভূমিকা রসগ্রাহী সচেতন পাঠকের— আদর্শ পাঠকের ভূমিকা। কিন্তু যাঁরা স্রষ্টা-সমালোচক, কবি-সমালোচক, তাঁরা কখনোই নিজেদের স্রষ্টা-ভূমিকাকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হতে পারেন না। সমালোচনার কালেও তাঁরা অনেকাংশে তাঁদের নিজেদের সৃষ্টি-ক্ষেত্রের নিয়ম-কানুনের দ্বারা, রুচি-প্রবৃত্তি-প্রবণতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও অনেকটা সেই রকমই ঘটেছে বলে মনে হয়। নিজের রুচির সঙ্গে, নিজের সাহিত্য-আদর্শের সঙ্গে যেখানে মিল ঘটেছে, লেখকের ভাবদৃষ্টির সঙ্গে যেখানে সাযুজ্য ঘটেছে, সেইখানেই রবীন্দ্রনাথের সমালোচনায় আগ্রহ, তার বাইরে তিনি উদাসীন।

সম্ভবত ভাবদৃষ্টির সাযুজ্যের কারণেই কালিদাসের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধি এমন অসামান্য। সম্ভবত এর অভাবের কারণেই তরুণ বয়সের রবীন্দ্রনাথ শেক্‌স্-পীয়রের নাটককে অথবা টলস্টয়ের উপন্যাসকে অমন অবলীলাক্রমে ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। এবং বোধ করি অনুরূপ কারণেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশের ও স্বকালের অনেক বিখ্যাত সাহিত্য-কীর্তির সম্পর্কে এমন তাৎপর্যপূর্ণভাবে নীরব। বিষবৃক্ষ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ মুখর, স্বতন্ত্র প্রবন্ধ না লিখলেও, বিষবৃক্ষ সম্পর্কে বহু উপলক্ষে তিনি বহু মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথের রাজসিংহ-সমালোচনা অতুলনীয়। বুঝতে হবে, এসব ক্ষেত্রে মনের সংযোগে কোনো বাধা ঘটেনি। কিন্তু দোসরহীন উপন্যাস কপালকুণ্ডলা? যে-কোনো কারণেই হোক, কপালকুণ্ডলার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ভাব-সাযুজ্যে বাধা ঘটেছে। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ কপালকুণ্ডলা সম্পর্কে নীরব। এ-নীরবতা জাত-সমালোচকের কাছে প্রত্যাশিত নয়। কিন্তু কবি-সমালোচক সম্পর্কে তা বলা যাবে না।

শ্রেষ্ঠ সমালোচকদের কাছে আমাদের একটি প্রধান প্রত্যাশা অতীতের পুনরাবিষ্কার। এ-কাজে রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে কল্পনাতীত।

শ্রেষ্ঠ সমালোচকদের কাছে আমাদের অপর এক প্রধান প্রত্যাশা হল অবহেলিত সাহিত্যধারার প্রতি মনোযোগ, উপেক্ষিত সাহিত্য-শাখার প্রতি দৃষ্টি-আকর্ষণ। 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থটির কথা স্মরণ করলেই বুঝতে পারব, এখানেও রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ কেউ নেই।

শ্রেষ্ঠ সমালোচকদের কাছে আমাদের আরো একটা বড়ো প্রত্যাশা আছে। সেই তৃতীয় প্রত্যাশা হল সমকালের প্রতি সুবিচার; ভাবী কালের প্রতি সচেতনতা; নতুনের সম্বর্ধনা; ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনার আবিষ্কার। সমালোচকদের কাছে এ-কাজ অগ্নিপরীক্ষার তুল্য। হেমচন্দ্র এবং মধুসূদন সম্পর্কে কিছু-কিছু বিচারবিভ্রাট সত্ত্বেও, বঙ্কিমচন্দ্র এ-অগ্নিপরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গেই উত্তীর্ণ হয়েছেন। বিশেষত 'সন্ধ্যাসংগীতে'র কবি-কিশোরকে যে-প্রত্যূষে বঙ্কিমচন্দ্র মাল্যবিভূষিত করেছিলেন, তাতে বঙ্কিমচন্দ্রের রুচির উদারতা এবং সাহিত্যিক দূরদৃষ্টি আমাদের মুগ্ধ না করে পারে না।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ? সমকালের প্রতি, ভাবীকালের প্রতি রবীন্দ্রনাথ কতোখানি সুবিচার করতে পেরেছেন? এ-প্রশ্নে নিরুত্তর না থেকে উপায় নেই।

কিন্তু এখানে এ-প্রশ্ন তুলেও কোনো লাভ নেই। এ-প্রশ্ন শিল্পী-সমালোচককে, কবি-সমালোচককে স্পর্শ করে না। সমকাল বা ভাবীকাল সম্পর্কে অগ্নিপরীক্ষা, বিষম প্রতিভার আবিষ্কারের দায়িত্ব— এ-সব কাজ স্রষ্টা-সমালোচকদের জন্য নয়। এই সব বিশেষ ক্ষেত্রে আপন স্রষ্টৃত্বই তাঁদের আদর্শ ভোক্তা হবার পক্ষে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। আপন সৃজনশীলতার প্রাবল্যই সমকালের লেখকদের ক্ষেত্রে, অসদৃশ প্রতিভার অধিকারীদের ক্ষেত্রে তাঁদের দৃষ্টিশক্তিকে খানিকটা আবৃত করে রাখে। তাঁরা জাত-সমালোচক নন। তাঁদের মূল্য কম এমন কথা বলি না। এখানে শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে, স্রষ্টা-সমালোচকেরা, কবি-সমালোচকেরা সব সময় তাঁদের নিজেদের নিয়মেই চলেন, কখনোই পাঠকের প্রত্যাশার নিয়মে চলতে পারেন না।

আধুনিক বাংলা সমালোচনার রূপরেখা

রণেন্দ্রনাথ দেব

বিগত ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরে বাংলায় যে সকল সমালোচনামূলক গ্রন্থ ও নিবন্ধ রচিত হইয়াছে তাহাদের তালিকা নিতান্ত অল্প নহে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা আধুনিক বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের পরিচয় দিতে প্রয়াসী হইয়াছি, কিন্তু সকল সমালোচকের নাম ও কৃতির উল্লেখ করা প্রবন্ধের সীমাবদ্ধ পরিসরে সম্ভব নহে। আধুনিক সমালোচনা-রীতির প্রধান কয়েকটি ধারার উল্লেখপূর্বক একালের সমালোচকদের কোন্ কোন্ দান বিশেষ স্মরণযোগ্য তাহা বলিবার চেষ্টা করিব।

১.

শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তদীয় 'বাংলা সমালোচনা পরিচয়' নামক গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যে সমালোচনা-শাখার উদ্গম ও বিকাশ বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনার উপসংহারে স্বর্গত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উল্লেখ করিয়া তাঁহার গ্রন্থটি পরিসমাপ্ত করিয়াছেন। যদি তাঁহার গ্রন্থটিকে আরো একটু প্রসারিত করা যাইত তবে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের নামই প্রথম সংযোজিত হইত। স্বর্গত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে যে ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছে, মানসপ্রকৃতির বিভিন্নতা সত্ত্বেও, তিনি ইহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় সাহিত্যসমালোচনা ধারার অনুসরণে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বহু শক্তিশালী সমালোচকের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে হর-প্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি লেখকেরা এক সুস্থ বুদ্ধি-দীপ্ত বিচারপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ইঁহাদের প্রবর্তিত রীতির সার্থক অনুবর্তন করেন। অক্ষম ফেনায়িত ব্যাখ্যা ও উচ্ছ্বাস বহুলতায় এক সময় বাংলা সমালোচনার প্রবাহ রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। শ্রীকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায় সেই অপ-সমালোচনার সঞ্চিত আবর্জনাস্তূপ সরাইয়া, সাহিত্যের 'রসরূপ' উদ্ঘাটনের ব্যর্থ চেষ্টাকে বাতিল করিয়া, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী শক্তির দ্বারা সাহিত্যের মূল্য-নির্ণয়ে উদ্যোগী হন। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত সেই আদর্শকে কখনো ত্যাগ করেন নাই। সেইজন্য আধুনিক সমালোচকবৃন্দের নামের তালিকায় প্রথম দিকে তাঁহার নাম স্থাপিত হওয়ার যোগ্য।

মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র নব্যবঙ্গ সাহিত্যের এই চারিজন প্রধান স্থপতির সম্বন্ধেই সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। চারিটি গ্রন্থই যোগ্য সমাদর লাভ করিয়াছে। বিশেষত মধুসূদনের আলোচনাকালে ভারতীয় মহাকাব্য ও পাশ্চাত্য মহাকাব্যের মধ্যে নৈতিক আদর্শগত যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহা তিনি সুন্দর প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার পর তিনি আকৃষ্ট হন ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রতি। 'ধ্বন্যালোক ও লোচনে'র অনুবাদ ও সম্পাদনা তাঁহার অন্যতম প্রধান কীর্তি। ইহা ব্যতীত 'সাহিত্যপাঠের ভূমিকা' নামে তাঁহার একটি ক্ষুদ্র কিন্তু মূল্যবান গ্রন্থ রহিযাছে। সম্প্রতি তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায বিষযে আর একটি আলোচনা প্রস্তুত করিয়াছেন।

মাত্রাজ্ঞান ও পরিমিতিবোধ সুবোধচন্দ্রের সহজাত গুণ এবং তাঁহার প্রবলতম প্রতিপক্ষও স্বীকার করিতে বাধ্য ফেনিল বাগ্‌বাহুল্যে ও ভাবোচ্ছ্বাসপ্রাচুর্যে তাঁহার রচনা বিকৃত নহে। যুক্তি জ্ঞান এবং অপক্ষপাত বিচারস্পৃহা তাঁহার সমালোচনা-সাহিত্যের ভিত্তি। কিন্তু, অন্যভাবে দেখিতে গেলে, উগ্র যুক্তিবাদিতাই তাঁহার বিশ্লেষণপদ্ধতির শৃঙ্খলে দুর্বলতম গ্রন্থি। যুক্তি ও বিচারের পথে মহত্তম সাহিত্যের সকল রহস্যের চাবিকাঠি আযত্ত করা যায কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। ইংরাজি ভাষায় কল্পনাতত্ত্ব বিষযে তিনি যে গ্রন্থ লিখিযাছেন তাহাতে একে একে প্লেটো, আরিস্টটল, কোলরিজ, পেটার, মার্কস প্রভৃতি মনীষীর সাহিত্য-শিল্প বিষয়ক মতবাদ-গুলির দুর্বলতা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু ওই গ্রন্থের শেযাংশে সাহিত্যবিষয়ে তিনি স্বয়ং যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাও কি যুক্তির দ্বারা খণ্ডনযোগ্য নহে? উপরন্তু, যুক্তিবাদের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতার ফলে তিনি নিজেই মাঝে মাঝে তাঁহার অবলম্বিত রীতির অভ্রান্ততা বিষযে সন্দিগ্ধ হইয়া উঠেন। 'ধ্বন্যালোক ও লোচনে'র ভূমিকায় এবং আরো দুয়েকটি প্রবন্ধে তিনি প্রাচীন ভারতীয় ধ্বনিবাদের যে সপ্রশংস সমর্থন জানাইয়াছিলেন তাহা পাঠ করিয়া শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন করিয়াছিলেন, এই ধ্বনিবাদ তথা রসতত্ত্ব একটি হ্রস্ব গীতিকবিতার ব্যাখ্যায় সুপ্রযুক্ত হইলেও ইহার দ্বারা কোনো বৃহদায়তন মহাকাব্য বা জটিল কোনো নাটকের সৌন্দর্য নির্ণীত হইবে কি? 'সাহিত্যপাঠের ভূমিকা'য় সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রকারান্তরে ধ্বনিবাদের আপেক্ষিক সঙ্কীর্ণতা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। সম্ভবত ইহার পর হইতেই ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ ক্ষীণ হইতে থাকে। কাব্যের আত্মা ব্যঞ্জনা, এই উজ্জ্বল সত্য উদ্ধারের পর সংস্কৃত আলংকারিকেরা আর যাহা বলিয়াছেন তাহা কাব্যের জাতি-প্রজাতির বর্গীকরণ মাত্র।

সুবোধচন্দ্রের পর আরো একজন সমালোচকের রচনাতে দৃঢ় যুক্তিবাদ এবং দার্শনিক চিন্তাশীলতার প্রভাব লক্ষ করা গিয়াছিল। তিনি প্রবাসজীবন চৌধুরী। 'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যাদর্শ', 'রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যদর্শন' এবং 'সৌন্দর্যদর্শন' মাত্র এই তিনটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনার পর প্রবাসজীবন চৌধুরীর অকালমৃত্যু ঘটে। তাঁহার রচনার পরিমাণ অল্প এবং কোনো সুনির্দিষ্ট বিচারপদ্ধতির প্রতিষ্ঠা তিনি করিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু প্রকাশভঙ্গীর স্বচ্ছতা ও সংযত বিশ্লেষণকলার জন্য তাঁহার লেখাগুলি প্রত্যাশা জাগাইয়াছিল।

শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের সমালোচনামূলক প্রবন্ধাবলীতেও ভাবালুতামুক্ত যুক্তি-ধর্মী বিশ্লেষণরীতির সন্ধান পাওয়া যায়। অমূল্যধন ছন্দ-বিষয়ক গবেষণার জন্য খ্যাতনামা। সাহিত্যবিষয়ে একটি প্রবন্ধ-সংকলন এবং 'কবিগুরু' নামক একটি গ্রন্থ তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রকাব্যনিহিত চিরচঞ্চল গতিশীলতা যে কবির অন্তরে ভাব ও অভাবের সনাতন দ্বন্দ্বপ্রসূত 'কবিগুরু' গ্রন্থে তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া দেখা-ইয়াছেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধগুলিও ঋজুতা ও মননশীলতার জন্য স্মরণীয়, বিশেষত দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান বিষয়ক উপভোগ্য নিবন্ধটি। 'উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম' নামক গ্রন্থটির রচয়িতা প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্তকেও ইঁহাদের অনুবর্তী বলা যাইতে পারে। স্বচ্ছ বুদ্ধিদীপ্ত বিচারপ্রণালীর প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন এখনো তাহা বহু সমালোচককে পথ-প্রদর্শন করিতেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা সচরাচর যেসকল বই প্রকাশ করিয়া থাকেন অনেক পাঠকের কাছে সেসকল বই কেতাবী আলোচনা মাত্র। কোনো কোনো রচনা বিপুল পরিশ্রমে রচিত হইলেও পাঠ্যবস্তুর সহায়িকা হইবার অপবাদে বৃহৎ পাঠকসমাজ-কর্তৃক বর্জিত হইয়াছে। অস্বীকার করিতে পারি না, বহু রচনা অসার, ছদ্ম পাণ্ডিত্যের মোড়কে আবৃত। কিন্তু যে গ্রন্থ পাঠকের মননশীলতাকে কিছুমাত্র উদ্‌বুদ্ধ করিতে পারে তাহাকে ত্যাগ করা সমীচীন নহে।

অধ্যাপক-সমালোচকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ছিলেন স্বর্গত শশিভূষণ দাশগুপ্ত। তরুণ বয়সে তিনি 'উপমা কালিদাসস্য' গ্রন্থটি হাতে লইয়া প্রথম সমালোচনা ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। ইহার পর একে একে বাহির হয় 'বাংলা সাহিত্যের নবযুগ', 'বাংলা সাহিত্যের একদিক', 'সাহিত্যের স্বরূপ', 'ত্রয়ী', 'শিল্পলিপি', 'যতীন্দ্রনাথ ও বাংলা কাব্যে আধুনিক পর্যায়', 'ঘরে বাইরে শিল্প সমস্যা', 'টলস্টয়-গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ', 'শ্রীরাধার

'ক্রমবিকাশ', 'ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য' প্রভৃতি। শশিভূষণ দাশগুপ্ত মেধাবী ছাত্র, পরিশ্রমী ও ছাত্রবৎসল অধ্যাপক ও সুবক্তারূপে সুখ্যাত ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার সমালোচনামূলক প্রবন্ধসমূহে তাঁহার প্রতিভার উপযুক্ত ছাপ পড়ে নাই। প্রাচীন বাংলা কাব্যের পটভূমিস্থ অজ্ঞাত ও অপরিচিত ধর্মবিশ্বাসাদির তিনি যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন সম্ভবত উহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। সমালোচনামূলক প্রবন্ধে তিনি বহুস্থলে কৈশোরক উন্মাদনার বশীভূত হইয়াছেন। 'বাংলা সাহিত্যের নবযুগ' গ্রন্থের সবচেয়ে সুলিখিত প্রবন্ধ 'বঙ্কিমচন্দ্র ও সাহিত্যে আদর্শবাদ'-এ তাঁহার সমালোচনার তারটি বাঁধা হইয়া যায়। শিল্পীর শ্রেয়োবোধ ও প্রেয়োবোধ যে অবিভাজ্য, এই আদিসূত্র অবলম্বনে শশিভূষণ দাশগুপ্তের পরবর্তী সমালোচনাগ্রন্থগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। 'ত্রয়ী' বইটিতে বাল্মীকির সঙ্গে কালিদাসের এবং কালিদাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সহমর্মিতার সূত্রগুলি তিনি সরসভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং যতীন্দ্রনাথ-সংক্রান্ত গ্রন্থে যতীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রধান গ্রন্থিগুলির উন্মোচন মনোজ্ঞ।

শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শশিভূষণ দাশগুপ্তের সঙ্গে সখ্যসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন এবং ইঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী কিছুটা সজাতীয়। অসিতকুমার বৃহদাকার সাহিত্য-ইতিহাস রচনার ফাঁকে 'উনিশ বিশ' ও 'বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর' নামক দুইটি প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধে প্রাঞ্জলতা গুণ সহজেই লক্ষণীয়। রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের অধিকাংশ লেখা সাময়িকপত্রের ক্ষণস্থায়ী আসরে দেখা দিয়া বিদায় নিলেও দুয়েক স্থলে (যেমন মধুসূদন বিষয়ে) তিনি নূতন তথ্যের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন।

অধ্যাপকদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনা-নীতি কাম্যতম সিদ্ধিলাভ করিয়াছে প্রাচীন সাহিত্যের মূল্য নিরূপণে। শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীসুকুমার সেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নূতন তথ্যের আধারে পুনর্গঠিত করিতে উদ্যোগী হন। এইসময় শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' রচনা করেন। প্রাচীন সাহিত্যের শাখা বিশেষের প্রথম সুসংবদ্ধ ইতিহাস হিসাবে, কোনো কোনো কবির কাল নির্ণয়ে লেখকের বিচ্যুতি সত্ত্বেও, ইহা যেমন স্মরণীয় তেমনি সাহিত্যের মৌলভিত্তি সন্ধানে সমাজ-জীবন ও জাতীয় আচার-অনুষ্ঠান-বিশ্বাসের সহায়তা গ্রহণের জন্যও উল্লেখযোগ্য। শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য-সম্পাদিত দ্বিজ মাধবাচার্যকৃত 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' গ্রন্থটির ভূমিকা তথ্যনিষ্ঠ যুক্তিশীলতার উৎকর্ষে মূল্যবান। এমন সুসম্পাদিত প্রাচীন বাংলা কাব্য দুর্লভ। ৺সুশীলকুমার দে ও ৺ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সতর্ক তথ্যাশ্রয়ী আলোচনার একটি বলিষ্ঠ ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্যকৃত 'বাংলা চরিত সাহিত্য'

এবং শ্রীভবতোষ দত্ত-সম্পাদিত ঈশ্বর গুপ্তের 'কবিজীবনী' সেই ধারায় মূল্যবান সংযোজন। এই প্রসঙ্গে বিশ্বভারতীর শ্রীপুলিনবিহারী সেনের সম্পাদনাপদ্ধতির উল্লেখ না করিলে অন্যায় হইবে।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-প্রণীত 'রবীন্দ্রজীবনী'র কথাও এখানে আলোচিত হইতে পারে। এই বইটি কেবলমাত্র জীবনী নহে 'রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক'ও বটে। রবীন্দ্রজীবনের প্রতিটি স্তরের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রভাতকুমার রবীন্দ্র-কাব্যের বিবর্তন রেখাটিও অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। বলা হইয়া থাকে, উনিশ শতকের শেষার্ধে ডারুইন-ব্যাখ্যাত উদ্‌বর্তনবাদ বিজ্ঞানের মতো সাহিত্য-সমালোচনা পদ্ধতিকেও বিপুলভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল ; ডাউডেন-কৃত শেক্‌সপীয়রের মানস-জীবন ও শিল্পকলার বিশ্লেষণ ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। বাংলা ভাষায় 'রবীন্দ্রজীবনী'ও সাহিত্যিক উদ্‌বর্তনবাদের প্রয়োগ-নিদর্শন। প্রভাতকুমারের আলোচনাপদ্ধতির দ্বারা উদ্বুদ্ধ সমা-লোচকের সংখ্যা নগণ্য নহে। শ্রীনীহাররঞ্জন রায়-কৃত 'রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা'র জলীয় অংশ ত্যাগ করিলে আর যাহা থাকে তাহার সারভাগ ৺অজিতকুমার চক্রবর্তী ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতামতের সমীকরণ মাত্র।

আধুনিক বাংলা সমালোচনাশিল্পের বিকাশে ইতিহাসবিদ লেখকদের দান উপেক্ষণীয় নহে। স্বর্গত যদুনাথ সরকার বঙ্কিমচন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-প্রকাশিত বঙ্কিম-গ্রন্থাবলীর কয়েকটি খণ্ডের যে মূল্যবান ভূমিকা লিখিয়া দিয়া-ছিলেন তাহা বারংবার পাঠ করিবার যোগ্য। ৺বিমানবিহারী মজুমদারও প্রসিদ্ধ ইতিহাসজ্ঞ অধ্যাপক। তিনি আলোচনা করিয়াছেন প্রধানত ষোড়শ শতকের পদাবলী সাহিত্য, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের পদাবলী এবং রবীন্দ্রকাব্যে পদাবলী সাহিত্যের প্রভাব বিষয়ে। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন ইতিহাসের কৃতী ছাত্র এবং প্রখ্যাত ছন্দ বিশ্লেষক। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ 'ছন্দগুরু রবীন্দ্রনাথ'। 'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে তিনি রবীন্দ্র-নাথের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক রূপ, ঐতিহাসিক রূপ এবং সমাজ ও ধর্মগত ভাবরূপের সামগ্রিক উপলব্ধির কথা বিবৃত করিয়াছেন কয়েকটি বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধে। প্রবন্ধগুলি স্পষ্ট ও দ্বিধাহীন।

এইরূপ ভাবা সঙ্গত নহে যে অধ্যাপক-সমালোচকদের আলোচনা সর্বদা পাণ্ডিত্য-ভারে ক্লিষ্ট কিংবা নীরস। শ্রীকালিদাস রায়ের রচনায় বিশ্লেষণের ফাঁকে ফাঁকে কবিত্বের আভাস পাওয়া যায়। 'সাহিত্যপ্রসঙ্গ', 'প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য', 'বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়' ও 'পদাবলী সাহিত্যের পরিচয়' তাঁহার মুখ্য সৃষ্টি। প্রথম গ্রন্থবিধৃত 'প্রজ্ঞাদৃষ্টি-বোধদৃষ্টি-রসদৃষ্টি' প্রবন্ধটি সঙ্গত কারণেই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। প্রজ্ঞাদৃষ্টি বলিতে

বুঝায় সাধকের সেই দৃষ্টি যাহা সৃষ্টিকে সুন্দরে-কুৎসিতে শুভে-অশুভে মিশাইয়া সমগ্র-ভাবে গ্রহণ করে। বোধদৃষ্টির দ্বারা জীবনকে আমরা বুদ্ধিগ্রাহ্য রূপে গ্রহণ করি, সামাজিক মানুষ যেরূপ অহরহ করে। রসদৃষ্টি সম্পূর্ণ পৃথক ধাঁচের। ইহা বিশেষ একটি বস্তুতে নিবদ্ধ হয়। পঙ্কজের সৌন্দর্য নিরীক্ষণ ইহার লক্ষ্য, বোধদৃষ্টির মতো পঙ্কজের মূল নিহিত পঙ্কের সন্ধান রসদৃষ্টি করে না। শ্রীহরপ্রসাদ মিত্রের 'গল্পগুচ্ছের রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটি একদা নূতনত্বের আস্বাদ আনিয়াছিল ও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লেখাটির প্রশংসা করেন। ৺ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়-প্রণীত 'সাহিত্যে ছোটগল্প', 'সাহিত্য ও সাহিত্যিক' এবং 'বাংলা গল্পবিচিত্রা' বইগুলিতে কোনো মৌলিক বিচারপ্রণালী কিংবা তথ্য-সঙ্কলনের অভিনবত্ব না থাকিলেও তিনটি বইই সুখপাঠ্য।

অধ্যাপক-সমালোচকদের মধ্যে সম্পূর্ণ একক ও নিঃসঙ্গ শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। ইনি দীর্ঘকাল অধ্যাপনাকার্যে জড়িত থাকিলেও এবং বহু সমালোচনাগ্রন্থের রচয়িতা হইলেও মূলত কবি। কবিহৃদয়ের অনুভূতির আলোকে তিনি সমালোচ্য গ্রন্থকে বুঝিবার চেষ্টা করেন। 'মাইকেল মধুসূদন', 'রবীন্দ্রকাব্য-প্রবাহ', 'রবীন্দ্র কাব্যনির্ঝর', 'রবীন্দ্রনাট্য-প্রবাহ', 'রবীন্দ্রগল্প বিচিত্রা','রবীন্দ্রসরণী', 'বাংলার লেখক', 'বাংলা সাহিত্যের নরনারী', 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য', 'বঙ্কিম সরণী' প্রভৃতি গ্রন্থ ব্যতীত বহু গ্রন্থ সম্পাদনা করিয়া ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন তিনি। প্রমথনাথ বিশীর সমালোচনা-প্রবন্ধে যুক্তিশৃঙ্খল ও সুসংবদ্ধ বিশ্লেষণসূত্র খুঁজিয়া বাহির করার চেষ্টা নিষ্ফল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁহার মন্তব্যগুলিকে বালকোচিত উৎসাহপূর্ণ বলিয়া মনে হয় ('রবীন্দ্রকাব্য-প্রবাহে' তিনি রবীন্দ্রকাব্যের প্রধান দোষরূপে নির্দেশ করিয়াছেন সামান্যকথন ও অতিকথনকে)। ইংরাজি কবি ও কাব্যের যেসব উল্লেখ তাঁহার রচনায় পাওয়া যায় সেগুলি সবক্ষেত্রে অভ্রান্ত নহে। কিন্তু ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সূক্তিগুলির সৌন্দর্য কখনো কখনো চমৎকৃত করে। তাঁহার যাহা শ্রেষ্ঠধন তাহা যেন ক্ষণদীপ্তির আলোকে মুগ্ধ করিয়া 'দেখা দিয়ে মিলায় পলকে'। অপ্রত্যাশিতভাবে একটি সত্যের ইশারামাত্র দেওয়াই যেন এই সুভাষিতসমূহের কাজ। যুক্তিপারিপাট্যে তথ্যবিন্যাসে ইহাদের প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা প্রমথনাথ করেন নাই। সেইজন্য সমালোচকমণ্ডলীতে প্রমথনাথ বিশীর স্থান বিতর্কের বিষয়ীভূত হইয়া থাকিবে।

আধুনিক বাংলা সমালোচনার একটি বৃহৎ অংশ সংস্কৃত সাহিত্যের ব্যাখ্যা ও সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত বাংলা সাহিত্যের যোগবিষয়ক আলোচনায় নিয়োজিত। এই প্রসঙ্গে

অবশ্য প্রথমেই বলিতে হয় অলঙ্কারশাস্ত্রের ব্যাখ্যাতাদের কথা। গর্বের সহিত বলা যাইতে পারে বিংশ শতাব্দীতে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের সৌন্দর্য নব আবিষ্কারের প্রধান গৌরব বাঙালী পণ্ডিত ও লেখকদের। সুশীলকুমার দে আলঙ্কারিকদের ঐতিহাসিক ক্রমনির্ণয়ে অপূর্ব দক্ষতা দেখাইবার প্রায় একই সঙ্গে অতুলচন্দ্র গুপ্ত রচনা করিলেন তাঁহার অমর গ্রন্থ 'কাব্য-জিজ্ঞাসা'। অতঃপর বহু আলোচক ইঁহাদের নির্দেশিত পথে যাত্রা করেন। কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 'কাব্য পরিমিতি' নামে যে ছোট গ্রন্থটি লিখিয়াছিলেন তাহা বেশ অভিনব। তিনি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন ভাব-বিভাব-অনুভাবের সহযোগিতায় কিভাবে কাব্যে রসের পুষ্টি ঘটে। আমাদের আস্বাদিত অধিকাংশ কবিতা রসের শীর্ষে না পৌছাইলেও কেন তৃপ্তি দিতে সক্ষম তাহার হেতু নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, ভাবলোক ও বাসনালোক পরিক্রমা করিয়াই অনেক কবি ও কাব্যপাঠক তাঁহাদের কর্তব্য সমাধা করেন। ভাবসমুখ ও বাসনাসমুখ কাব্য সর্বথা নিকৃষ্ট নহে, নূতন নূতন বাংলা কবিতার উদাহরণ প্রয়োগে যতীন্দ্রনাথ এই জিনিসটিকে পরিস্ফুট করেন।

৺ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত 'কাব্যালোক' গ্রন্থে রসবাদকে আংশিকভাবে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে কাব্যরচনায় আবেগ ও চিন্তা দুয়েরই মূল্য সমান, এবং আবেগ ও চিন্তার দুই পথে দুই জাতীয় কাব্য রচিত হইয়া থাকে—দ্রুতিকাব্য ও দীপ্তিকাব্য। রসবাদের অব্যাপ্তি বিষয়ে সুধীরকুমার যে অভিযোগ আনয়ন করেন তাহা খুব যুক্তিসহ নহে এবং আবেগমূলকতা ও যুক্তিমূলকতার মধ্যে তিনি যে দুস্তর পার্থক্য কল্পনা করিয়া লইয়াছেন তাহা বাস্তব অভিজ্ঞতা বিরোধী। একজন পাশ্চাত্ত্য-লেখক সত্যই বলিয়াছেন, যে-মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিতে দুর্বল তাহার আবেগনিচয়ও অগভীর।

সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র সম্বন্ধে এ যুগে যে দুইজন লেখক প্রকৃত অর্থে মৌলিক ব্যাখ্যা দিতে পারিয়াছেন তাঁহারা দুইজনই দর্শনবেত্তা—অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক এম. হিরিয়ানা। ইঁহাদের রচনা ইংরাজি ভাষায় লিখিত। যে কয়জন ব্যাখ্যাতা বাংলা ভাষায় লিখিয়াছেন তন্মধ্যে শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের নাম পূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে। শ্রীরমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়-প্রণীত 'রস সমীক্ষা' এবং শ্রীহরিহর মিশ্র প্রণীত 'ব্যঞ্জনা ও কাব্য', 'রস ও কাব্য' গ্রন্থগুলির নামও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। অপর একজন শক্তিশালী ব্যাখ্যাতা হলেন শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য।

ইনি 'সাহিত্য মীমাংসা' ও 'ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের ভূমিকা' নামক দুইটি ছোট ছোট গ্রন্থ ছাড়া 'কাব্য কৌতুক' গ্রন্থের তিনটি প্রবন্ধে ('কাব্যের আত্মা', 'আনন্দবর্ধন ও ধ্বন্যালোক' ও 'সাহিত্যে ধ্বনিবাদ') ধ্বনিবাদের সৌষ্ঠবপূর্ণ মূলানুগত ভাষ্য রচনা

করিয়াছেন। ধ্বনিবাদের পোষকতাকল্পে তিনি রিচার্ডস্ প্রমুখ আধুনিক ইংরাজ সমালোচকদের রচনা হইতে যে সমস্ত উদ্ধৃতি দিয়াছেন সেগুলি শুধু তাঁহার অধ্যয়ন প্রাচুর্য নহে, পরন্তু সূক্ষ্মদর্শিতা ও রসগ্রাহিতারও প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সমালোচকরূপে বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের উচ্চাসন 'কাব্য কৌতুক' ও 'কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ দুইটির বিভিন্ন প্রবন্ধের দ্বারা সুচিররূপে নির্ধারিত হইয়াছে। 'কাব্য কৌতুকে' তিনি 'কর্ণকুন্তী সংবাদ', 'পরিশোধ' ও 'বিদায় অভিশাপ', রবীন্দ্রনাথের এই তিনটি কবিতার উৎস বিচার করিয়া ইহাদের বিশেষত্ব কোথায় তাহা সুন্দরভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। 'কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থভুক্ত 'রবীন্দ্রনাথ ও উপনিষদ' প্রবন্ধটিও এইক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য। উপনিষদের বাণীসমূহকে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন শাস্ত্রকারদের অনুকরণে কোনো নির্দিষ্ট প্রস্থানে বিধিবদ্ধ করেন নাই। তিনি কবির সহজাত আনন্দময় দৃষ্টিতে উপনিষদ পাঠ করিয়াছিলেন এবং উপনিষদের মধ্য হইতে তিনি 'বৈরাগ্যের শিক্ষা নয়, সন্ন্যাসের শিক্ষা নয়,···বিশ্ব প্রকৃতির বিচিত্র রহস্যকে অঙ্গীকার' করিবার শিক্ষাই গ্রহণ করেন। 'মেঘদূতে চিত্রসম্পদ' ও 'বাল্মীকি ও কালিদাস'—বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের এই প্রবন্ধ দুইটিও বিষয়নিষ্ঠ ও মূলানুসারী।

এইস্থলে অন্য একজন অপেক্ষাকৃত অপরিচিত সমালোচকের নাম স্মরণ করিতেছি। ৺নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য-লিখিত মুষ্টিমেয় কয়েকটি প্রবন্ধ সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় ছড়াইয়া রহিয়াছে। দুইটি প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কালিদাস ও জয়দেবের ভাবসাযুজ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। জয়দেব শুধু তরুণ বয়সের রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্ট করিয়াছিলেন এরকম ভাবা উচিত নহে। রবীন্দ্রসাহিত্যের পরিণত স্তরেও জয়দেবের প্রভাব প্রচ্ছন্ন-রূপে ক্রিয়াশীল। উদাহরণ স্বরূপ, রবীন্দ্রনাথের জীবনসায়াহ্নে রচিত এই সঙ্গীতটির উল্লেখ করা চলে—

> নীলাঞ্জনছায়া, প্রফুল্ল কদম্ববন,
> জম্বুপুঞ্জে শ্যাম বনান্ত, বনবীথিকা ঘনসুগন্ধ।
> মন্থর নব নীল নীরদ- পরিকীর্ণ দিগন্ত।
> চিত্ত মোর পন্থহারা কান্তবিরহকান্তারে॥

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে নরেন্দ্রনাথ 'পুরাণের পুনর্জন্ম ও রবীন্দ্রনাথ' নামে একটি মূল্যবান আলোচনা প্রকাশ করেন। মধুসূদন পৌরাণিক কাহিনীর নবরূপায়ণ করেন, কিন্তু তিনি প্রাচীন ঐতিহ্যের পরিপন্থী। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীনকে স্বীকার করিয়া তাহার নবরূপ দিয়াছেন। 'কর্ণকুন্তী সংবাদে' মহাভারতের উদ্যোগপর্বের ঘটনাকে রবীন্দ্রনাথ কর্ণ-পর্বে স্থানান্তরিত করিয়াছেন। তিনি 'মূলের অনুসরণে কর্ণের সত্যসন্ধতা,

অন্নদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা, ত্যাগ ও তিতিক্ষা, কুন্তীর উপর দোষারোপ এবং অভিমান সবই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কর্ণ কত মহৎ, কত ট্রাজিক হয়ে উঠেছেন। তাঁর ব্যথা, তাঁর বিষাদময়তা আমাদের তাঁর অন্তরাত্ম করে তোলে'।

রবীন্দ্রনাথের উপর সংস্কৃত কবিদের, বিশেষত কালিদাসের, প্রভাব সম্বন্ধে আরো দুই একজন লেখক আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য' নামক নিবন্ধটির তুলনায় এই সকল আলোচনা একান্ত নিষ্প্রভ।

৪.

আধুনিক সাহিত্যের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে কাব্য-নাটক-উপন্যাসে ঋতু-পরিবর্তন সম্ভাবনা দেখা দিলে সমালোচনায় তাহা অচিরে বিম্বিত হয়। যখনই কোনো নূতন কাব্যান্দোলন শুরু হইয়াছে সমালোচনা তাহার পক্ষসমর্থনে কুণ্ঠিত হয় নাই। 'কল্লোল' পত্রিকার লেখকগোষ্ঠী বাংলা সাহিত্যে পালাবদলের যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার তুল্য সাহসী প্রয়াস ইদানীন্তন কালে অল্পই দেখা গিয়াছে। আধুনিকতা-চিহ্নিত গল্প-উপন্যাস-কবিতাকে নিন্দা করিবার লোকের অভাব ছিল না। কিন্তু ইহার পক্ষাবলম্বী সমালোচকও অনেক ছিলেন। লেখকেরা নিজেরাও বহুবার সমালোচকের কর্তব্য পালন করিযাছেন। কোনো কাব্য আন্দোলনের আবির্ভাব ও পরিণতি এই দুই প্রান্তে যে দ্বিবিধ সমালোচনার উৎপত্তি হয় তাহাদের মধ্যে প্রভেদ দুস্তর। 'কল্লোল'-প্রভাবিত আধুনিক সাহিত্যের মূল্যনির্ণয়ে সম্প্রতি কিছু কিছু সমালোচক ব্রতী হইয়াছেন। সঞ্জয় ভট্টাচার্য 'তিনজন আধুনিক কবি' নামে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন (ইহার পরবর্তী পরিবর্ধিত সংস্করণ আশানুরূপ হয় নাই)। তাঁহার অনুসরণে আরো দুযেকজন গবেষক অগ্রসর হন। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী প্রভৃতি কবির সমালোচনাত্মক প্রবন্ধে যে সাহস, আশাবাদ ও প্রাণোচ্ছলতা পরিস্ফুট পরবর্তী লেখকদের আলোচনায় তাহা আশা করা যায় না। 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসুর লেখাতেই সর্বপ্রথম আধুনিকতা বস্তুটির সুস্পষ্ট চেতনা ধরা পড়িয়াছিল।

'কবিতা' পত্রিকার পৃষ্ঠায় বুদ্ধদেব বসু আধুনিক কবিদের কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন; সেইগুলি পরে 'কালের পুতুল' নামে গ্রথিত হয়। ইংরাজি ভাষাতেও তিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি পরিচিতি-পুস্তক লিখিয়াছেন। জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, অন্নদাশঙ্কর রায়, বিষ্ণু দে, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নিশিকান্ত—ইঁহাদের এক একটি কাব্য প্রকাশিত হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে

বুদ্ধদেব বসু 'কবিতা'য় ইহাদের উৎসাহপূর্ণ প্রাণবন্ত পরিচিতি লিখিয়াছিলেন। 'কালের পুতুলের' লেখাগুলিতে এখনো প্রথম-জানার সেই তাজা সৌরভ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। জীবনানন্দের চিত্ররচনা যে ভাবাত্মক নহে, রূপাত্মক; তিনি যে আধুনিক কবিদের মধ্যে সবচেয়ে কম আধ্যাত্মিক—বুদ্ধদেব বসুর এইসব মন্তব্য তৎকালে জীবনানন্দ পাঠকদের কতখানি সাহায্য করিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। অবশ্য বুদ্ধদেব বসুর আলোচনা আধুনিক সাহিত্যের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ তন্নিষ্ঠ আলোচনা নহে ; তিনি স্বকীয় একটি দৃষ্টি-কোণ হইতে সহগামী কবিদের কৃতিত্বকে যাচাই করিয়াছেন। 'শিল্পীর পক্ষে সজ্ঞানে শিল্পোৎকর্ষ বিসর্জন দেয়া সম্ভব নয় ;·· এমন কোনো উল্টো প্রক্রিয়া নেই যার দ্বারা নিজের কারুনৈপুণ্য বিস্মৃত হয়ে তিনি যাত্রার পালা লিখতে পারেন' (অভিভাষণ, ১৩৪৫)—এই বিশ্বাসের অক্ষদণ্ডে বুদ্ধদেব বসুর সকল সমালোচনা আবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু, ঐকান্তিক সহানুভূতির বলে, কবিদের কারুকুশলতার প্রতি প্রধানত দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াও, বুদ্ধদেব বসু আধুনিক কবিদের কৃতিত্ব নির্ণয়ে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। অন্যত্র, সমালোচনার অপক্ষপাত বিচার প্রণালীর মর্যাদা তিনি রক্ষা করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁহার দুইটি আলোচনা গ্রন্থ রহিয়াছে—'রবীন্দ্রনাথ : কথা সাহিত্য','সঙ্গ নিঃসঙ্গতা: রবীন্দ্রনাথ'। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে কাব্যগুণের প্রাচুর্যকে তাঁহার শক্তিমত্তার নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তিনি। পাঠকেরা প্রশ্ন করিতে পারেন, তাহা হইলে উপন্যাস ও কবিতার শিল্পরূপগত পার্থক্য কি কেবল বহিরঙ্গমূলক ?

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'স্বগত' ও কুলায় ও কালপুরুষের' প্রবন্ধাবলীও প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল 'পরিচয়' পত্রিকায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রন্থসমালোচনা রূপে। সুধীন্দ্রনাথের ভাষারীতি ('সংস্কৃত আর ইংরাজি ভাষার বর্ণসঙ্কর ঘটিয়ে···অস্পৃশ্য') একদা বাংলা সমালোচনাজগতে প্রবল অভিভব ঘটায়। অধুনা অনেকের ধারণা সুধীন্দ্রনাথের ভাষা-রীতি একপ্রকার সাহিত্যিক মুদ্রাদোষের—ম্যানারিজ্‌মের—অতিরিক্ত কিছু নয়। কিন্তু আমাদের শিথিলবন্ধ অর্ধসুপ্ত গদ্যরীতিতে এই রকম একটি প্রবল নাড়া দিবার দরকার ছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না। তাঁর ভাষারীতির অনুকারীদের সংখ্যা কমিয়া আসিলেও সুধীন্দ্রনাথের রচনাশৈলীর শ্রেষ্ঠ অংশটুকু আধুনিক বাংলা গদ্যের মজ্জায় মিশিয়া গিয়াছে। পাঠকদের মনোদিগন্তের বিস্তৃতি সাধনেও তাঁহার দান স্মরণযোগ্য। এলিয়ট, হপকিন্‌স্‌, ফকনর, স্ট্রেচি প্রভৃতি লেখকেরা যেকালে ইংরাজি সমালোচনাতেও সম্পূর্ণ আদৃত হন নাই তখনই সুধীন্দ্রনাথের অনুকম্পায়ী আলোচনা বাঙালী পাঠকের কাছে ইঁহাদের সৌন্দর্যলোক খুলিয়া দেয়। 'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধটিকে নব্য কাব্যান্দোলনের আদি ঘোষণাপত্র ·বলা যাইতে পারে। 'উত্তরসামরিক বিমান

বিধ্বস্ত সমাজে' সাহিত্যিক মূল্যবোধের পুনর্গঠনে সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলি নানাভাবে সহায়ক হইয়াছিল।

একটিমাত্র গ্রন্থ 'সাম্প্রতিকে' অমিয় চক্রবর্তীর সকল গদ্যরচনা সংগৃহীত হইয়াছে। তাঁহার কবিতা ও তাঁহার সমালোচনা যেন একই বস্তুর এপিঠ-ওপিঠ। একই শুভ-বিশ্বাসে ইহারা উদ্দীপ্ত, একই পটভূমিতে ইহারা সংন্যস্ত, সেই পটভূমি 'চিরসাময়িক বাংলাদেশ ও বিশ্বমানস'। ভাষারীতির মিলও সুস্পষ্ট। প্রবন্ধগুলি প্রধানত সাম্প্রতিক সাহিত্যগুরুদের কোনো না কোনো রচনার বিশ্লেষণ। একদিকে রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, ইকবাল, অন্যদিকে ইয়েটস, জয়েস, এলিয়ট, পাউণ্ড। কিন্তু কেবল লেখা নয়, লেখককেও স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন অমিয় চক্রবর্তী। সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার ব্যক্তিত্বকে মিলাইয়া দেখিলে তবেই তাঁহার দেখা হয় সম্পূর্ণ। 'নবজাতক মালা' প্রবন্ধটি অমিয় চক্রবর্তীর বিশ্লেষণরীতির উল্লেখ্য নিদর্শন। সব জড়াইয়া অমিয় চক্রবর্তী সাহিত্যের একটি শ্রেয়োধর্মী রূপকে অন্বেষণ করিয়াছেন—'অথচ সেই শ্রেয়তা সমাজের উপস্থিত ভালোমন্দের সঙ্গেও স্পষ্টভাবে যুক্ত নয়।'

জীবনানন্দ দাশের 'কবিতার কথা'য় সংকলিত পনেরোটি আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য এই যে জীবনানন্দের কবিতাকে বুঝিতে গেলে এই আলোচনাগুলি পাঠ করা অপরিহার্য। জীবনানন্দের গদ্য ভাষা স্পষ্ট , দ্রুতগামী, জড়তা মুক্ত নহে। তাহা চিন্তার জটিলতামোচনের চেষ্টায় ক্লান্ত। কিন্তু তাঁহার চিন্তা ও সিদ্ধান্ত একান্ত নিজস্ব। স্বকীয় কাব্যরচনা প্রক্রিয়াটিকেই তিনি যেম বারবার ধরিতে চাহিয়াছেন: 'কবিতার ভিতর আনন্দ পাওয়া যায়: জীবনের সমস্যা ঘোলাজলের মূষিকাঞ্জলির ভিতর শালিকের মতো স্নান না করে বরং যেন আসন্ন নদীর ভিতর বিকেলের শাদা রৌদ্রের মতো ;—সৌন্দর্য ও নিরাকরণের স্বাদ পায়।' জীবনানন্দ যখন বলেন কবির অন্তঃপ্রেরণা ইতিহাস-চেতনায় সুগঠিত হওয়া উচিত তখন তাঁহার কণ্ঠে আধুনিক সকল কবির কণ্ঠস্বর শুনিতে পাই।

এই পর্বে এমন আরো দুয়েকজন সমালোচক রহিয়াছেন যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে 'সবুজ পত্রের' ঐতিহ্য বহন করেন। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সুপণ্ডিত ব্যক্তি। 'চিন্তয়সি', 'আমরা ও তাহারা' এবং 'বক্তব্য' গ্রন্থত্রয়ে তাঁহার মুখ্য গদ্যরচনাসমূহ পাওয়া যায়। আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রসাহিত্যের পার্থক্য যে শুধু বিশ্বাস ও প্রত্যয় গ্রন্থিতে ভিন্ন তাহাই নহে, তিনি দেখাইয়াছেন রবীন্দ্রসাহিত্যে ইমেজগুলি সুপরিচিত, তাহাদের বিন্যাসে একটা সহজ প্রাঞ্জল পরম্পরা থাকে, রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যে এই প্রকার পারম্পর্য নাই। কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদ এই বিশ্লেষণে আর অগ্রসর হন নাই।

ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, বিজ্ঞান, সঙ্গীত এত বিষয়ে তাঁহার আগ্রহ ছিল যে সাহিত্য সমালোচকের ভূমিকায় তিনি তৃপ্ত থাকিতে পারেন নাই।

প্রমথ চৌধুরীর সরস উজ্জ্বল বাকচাতুর্য নবমূর্তি গ্রহণ করে অন্নদাশঙ্কর রায়ের লেখায়। 'জীবনশিল্পী', 'ইশারা', 'বিনুর বই' প্রভৃতি গ্রন্থগুলিতে সাহিত্য বিষয়ে তাঁহার অনেক আলোচনা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়াইয়া ছিল। সম্প্রতি প্রকাশিত 'প্রবন্ধ' গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে সেইগুলি বিন্যস্ত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী, মুখ্যত এই দুইজন শিল্পগুরু তাঁহাকে প্রভাবিত করিয়াছেন সর্বাধিক। কিন্তু তাঁহার মন আসলে অমিয় চক্রবর্তীর মতোই বিশ্বপথচারী। রলাঁ, গ্যেটে, টলস্টয়কে বাদ দিলে তাঁহার শিল্পলোক অপূর্ণ থাকিয়া যায়। ইহা অস্বাভাবিক নহে যে সাহিত্যের মনোহারী দিকটিকে ছাপাইয়া তাঁহার অনুরাগ ক্রমে হিতকারী দিকটির প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। প্রমথ চৌধুরী তাঁহার শিল্পকলার গুরু, কিন্তু সেই শিল্পকলা টলস্টয়ের জীবনদর্শনে অধুনা আসক্ত।

আধুনিক কাব্যান্দোলন সংশ্লিষ্ট সমালোচকমণ্ডলীতে আবু সয়ীদ আইয়ুবের একটি স্বতন্ত্র ও সম্ভ্রান্ত আসন রহিয়াছে। বিজ্ঞান ও দর্শনের কৃতবিদ্য ছাত্র আবু সয়ীদ আইয়ুব সাহিত্য সমালোচনায় নূতন অন্বীক্ষারীতির প্রবর্তন করার গৌরব লাভ করিয়াছেন। তিনিই প্রথম আধুনিক বাংলা কবিতার সংকলন গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। 'কবিতা', 'পরিচয়' ও অন্যান্য পত্রপত্রিকায় তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ প্রবন্ধ লিখিয়া থাকিলেও তাঁহার পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' মাত্র সম্প্রতি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটি যে আশ্চর্য জনসমাদর লাভ করিয়াছে তাহা সূক্ষ্ম চিন্তাশীলতার প্রতি পাঠকের স্বভাবসিদ্ধ শ্রদ্ধানিবেদনের দ্যোতক। অমঙ্গল বোধ ও সৃষ্টির মূলগত অশুভ বৈনাশিক শক্তি বিষয়ে 'অবসেসন' দ্বারা আধুনিক কালে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত উন্নত সাহিত্যে কবিশিল্পীদের চেতনা রাহুগ্রস্ত। বিশেষত পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে যাঁহারা নিষ্ণাত তাঁহারা রবীন্দ্রসাহিত্যে অমঙ্গলবোধের ব্যাপক কোনো প্রভাব দেখিতে পান না। রবীন্দ্রনাথ অশুভ শক্তির ভয়াবহ অমানবিক অন্ধকারের সহিত পরিচিত ছিলেন। তাঁহার কাব্যে উহার দৃষ্টান্ত প্রচুর। কিন্তু তাঁহার শ্রেয়োবোধ তাঁহাকে সহায়তা করিয়াছে অমঙ্গলবোধের আত্যন্তিক চেতনা জয় করিতে। আবু সয়ীদ আইয়ুব রবীন্দ্রকাব্যের এই প্রদেশটিকে তুলনা-প্রতিতুলনা ও বিশ্লেষণে অপূর্ব স্পষ্টতা দান করিয়াছেন। বইটির প্রথম অংশে প্রাক্-'মানসী' রচনা হইতে 'নৈবেদ্য' পর্যন্ত কাব্যগুলির পরিক্রমা কিছুটা দ্রুতগতিতে সমাধা করিয়া 'গীতাঞ্জলি' হইতে তিনি রবীন্দ্রকাব্যের ক্ষুরধার বিশ্লেষণ শুরু করেন এবং রবীন্দ্রনাথের অন্তিম পর্যায়ভুক্ত কবিতাগুলির চুলচেরা আলোচনায় শেষ হইয়াছে

তাঁহার সমীক্ষা। এই আলোচনা 'খেলনার মুক্তির' ন্যায় কত আপাত তুচ্ছ কবিতাকেও গূঢ়ার্থদীপ্ত করিয়া দেখাইতে পারিয়াছে ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটি প্রকাশিত হইবার পর আরো কয়েকটি প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রনাথের রূপক নাট্যনিচয়ের বিশ্লেষণ করিয়া ইহাদেরও মধ্যে কবির শুভবিশ্বাস কিভাবে মুকুরিত হইয়াছে তাহা দেখাইয়াছেন। ধৈর্যশীল বিশ্লেষণ, তথ্যনিষ্ঠা, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার, পরিশীলিত রুচি, সূক্ষ্ম মর্মগ্রাহিতা—আবু সয়ীদ আইয়ুবের রচনার এই গুণগুলির কথা স্মরণ রাখিলে তাঁহাকে আধুনিক সাহিত্য-গোষ্ঠীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক বলিতে কুণ্ঠিত হইবেন না কেহ।

৫

নব্য সমালোচনারীতির স্বাতন্ত্র্য বিশেষভাবে ধরা পড়ে শব্দ ব্যবচ্ছেদে, বাক্য ও অলঙ্কারের নিগূঢ় তাৎপর্য-সন্ধানে। শব্দের প্রয়োগবৈচিত্র্য ও ইমেজের পুনরাবৃত্তি প্রসঙ্গে নব্য সমালোচকেরা প্রায় বিজ্ঞানীর মতো বিশ্লেষণপরায়ণ। এই রীতির কিছু কিছু ত্রুটি থাকিলেও কবিতার মর্ম গ্রহণে ইহার সহায়তা গ্রহণ অপরিহার্য (এলিয়ট অবশ্য ইহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন লেবু চট্‌কানো রীতি)।

বুদ্ধদেব বসু-সম্পাদিত 'বৈশাখী' নামক বার্ষিক পত্রে (১৩৫০) শ্রীঅশোকবিজয় রাহা 'কাব্যের শিল্পরূপ' নামে একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি কাব্যের শিল্পরূপ বিচার করিয়া তিন শ্রেণীর কবিতা বাছিয়া লন—গীতধর্মী, চিত্রধর্মী ও ভাস্কর্যধর্মী। গীতধর্মী কবিতার বৈশিষ্ট্য ভাবের অনুক্রম এবং চিত্রধর্মী কবিতার বৈশিষ্ট্য ভাবের সহাবস্থান। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর কবিতা একান্ত পৃথক নহে। দ্রুতবেগে চিত্রমালা সাজাইয়া কবি ইহারই মধ্যে এক গীতধর্মী গতিময়তার সৃষ্টি করিতে পারেন। তিন শ্রেণীর কবিতা যেমন পরস্পরের মধ্যে মিশিয়া যাইতে পারে কবি তেমনি বিভিন্ন ধরনের ইন্দ্রিয়সংবেদনকেও মিশ্ররূপ দিতে সক্ষম। বিভিন্ন কাব্যাংশ উদ্ধৃত করিয়া ইহা দেখানো হইয়াছে প্রবন্ধটিতে। ক্ষোভের বিষয়, অশোকবিজয় রাহা এবিষয়ে আর অগ্রসর হন নাই এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের উপর একটি প্রবন্ধ ব্যতীত তাঁহার আর কোনো উল্লেখযোগ্য রচনা চোখে পড়ে নাই এ যাবৎ।

সাম্প্রতিককালে অমলেন্দু বসু এই জাতীয় বিশ্লেষণরীতির সার্থক প্রয়োগ করিয়াছেন। বাংলা ভাষায় তাঁহার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় 'কবিতা' পত্রিকায় (১৩৫৫)—'সমালোচক টি. এস. এলিয়ট'। অতঃপর দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি যেসব পরিশ্রমী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহার একটি সংকলন 'সাহিত্যালোক' নামে সম্প্রতি

প্রকাশ করা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত 'রবীন্দ্রায়ণ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে 'রবীন্দ্রনাথের বাক্‌প্রতিমা' নামক প্রবন্ধটি অমলেন্দু বসুর বিশ্লেষণ পদ্ধতির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। ইমেজ বা বাক্‌প্রতিমার দ্বারা কবিচিত্তকে, কবির কারুকৃতিকে আমরা যত নিবিড় ভাবে ধরিতে পারি, কবিজীবনের স্তূপীকৃত তথ্যপুঞ্জের দ্বারা তাহা কখনো সম্ভবপর নহে। বাক্‌প্রতিমার একটি সরল চিত্রময় রূপ আছে যাহা ছোট বড় প্রায় সকল কবির রচনাতেই দেখা যায়। কিন্তু মহাকবির রচনায় এই সকল বাক্‌প্রতিমা বিচিত্র জটিল আকার পরিগ্রহ করিতে থাকে। একটি প্রতিমা শত অনুষঙ্গের উদ্‌বোধন ঘটায়, একটি ইন্দ্রিয়ানুভূতি অন্য জাতের কত ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্মৃতিতে ভরপুর হইয়া উঠে। শ্রেষ্ঠ কবির বাক্‌প্রতিমা হইতে উপলব্ধ হয় 'এক ইন্দ্রিয়জ ধারণা থেকে অন্য ইন্দ্রিয়জ ধারণায় গড়িয়ে পড়ার মনঃশক্তি' কবির কতখানি তীব্র।

রবীন্দ্রকাব্যের শিল্পরূপগত বৈচিত্র্যের কয়েকটি দিক বিষয়ে অসাধারণ বিশ্লেষণ পাওয়া যায় স্বর্গত তারকনাথ সেনের একটি প্রবন্ধে। রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকীতে সাহিত্য অকাদেমি-প্রচারিত স্মারক গ্রন্থে তিনি রবীন্দ্রকাব্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। প্রবন্ধটি ইংরাজি ভাষায় লিখিত। কিন্তু ইহার উল্লেখ না করিলে আধুনিক বাংলা সমালোচনার ইতিবৃত্ত অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইতে বাধ্য।

প্রবন্ধের প্রথমাংশে বলা হইয়াছে রবীন্দ্র কবিমানসে পাশ্চাত্ত্যের কবিদের অপেক্ষা প্রাচ্যের কবিদের প্রভাব ব্যাপকতর। ইংরাজি কবিতার সঙ্গে তাঁহার কোনো কোনো কবিতার মিল থাকিলেও ইহাকে গভীর প্রভাবপ্রসূত বলা চলে না। 'কালের যাত্রার ধ্বনি' কবিতাটির সঙ্গে মার্ভেলের একটি কবিতার, 'বর্ষশেষ' কবিতার সঙ্গে 'ওড টু দি ওয়েস্ট উইণ্ড' কবিতার প্রথম দুই স্তবকের, 'দুঃসময়' কবিতার প্রথম স্তবকের সঙ্গে শেলির স্কাইলার্কের অংশ বিশেষের যে মিল খুঁজিয়া বাহির করা যায় তাহা অকিঞ্চিৎকর। এলিয়টের কবিতা অনুবাদ করা সত্ত্বেও আধুনিক ইংরাজি কবিতার কাছে রবীন্দ্রনাথের ঋণ যৎসামান্য। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য কবিদের সাদৃশ্য-সূত্র অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে। অতঃপর তারকনাথ সেন কীট্‌সের কবিতা হইতে রবীন্দ্রনাথ কি শিক্ষা লাভ করিয়াছেন তাহার কথা বলিয়াছেন। মিলযুক্ত প্রবহমান পদবন্ধের (আজাঁবা) যে রীতিটি কীট্‌সের কাব্যে বহু ব্যবহৃত রবীন্দ্রনাথ উহাকে গ্রহণ করিয়া প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের কাব্যসাধনায় অপূর্ব নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রয়োগ করিয়াছেন। 'মানসী' কাব্যের 'মেঘদূত', 'অহল্যার প্রতি', 'বিদায়' প্রভৃতি কবিতায় এই প্রবহমান ছন্দের প্রথম বলিষ্ঠ আবির্ভাব, এবং কবিজীবনের অন্তিম পর্যায় অবধি রবীন্দ্রনাথ এই ছন্দকে আশ্রয় করিয়া ছিলেন। মাঝে মাঝে চরণের মাত্রাসংখ্যা বাড়াইয়া, অথবা হ্রস্ব

বাক্‌পংক্তির অবতারণা করিয়া, রবীন্দ্রনাথ কীট্‌সের ছন্দকে অধিকতর বৈচিত্র্য ও উৎকর্ষ দান করিয়াছেন। পুরাতন পয়ার ছন্দের ক্লান্তিকরতা দূর করিবার নিমিত্ত, মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের পন্থা বর্জন করিয়া, কীট্‌সের দৃষ্টান্ত অনুসরণের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দোজগতে অনুপম ঐশ্বর্য আনয়ন করেন। তারকনাথ সেনের এই মূল্যবান বিশ্লেষণ বাংলা সমালোচনার পাঠকেরা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছেন।

কিছুকাল পূর্বে 'রবীন্দ্রকাব্যের শিল্পরূপ' বিষয়ে আরো একটি গ্রন্থ লিখিয়াছেন শ্রীগৌরীপ্রসাদ ঘোষ। ইনি মুখ্যত রবীন্দ্রনাথের গানের, সুরের দিক হইতে নহে কাব্যের দিক হইতে, গঠনগত সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটন করিতে প্রয়াসী। গ্রন্থের প্রথমভাগে রবীন্দ্র-কাব্যের পরম্পরাগত আলোচনা। শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির পাশাপাশি বহু অসার্থক কবিতাও রবীন্দ্রকাব্যে স্থান পাইয়াছে। এমন কি, তাঁহার শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির মধ্যেও শক্তির অসমানতা লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ অত্যধিক লিখিয়াছেন, এই কথা বলিলে যেন ইহার সঠিক ব্যাখ্যা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অথচ 'বিপুল সংখ্যা সত্ত্বেও এই গীতি-রচনাগুলির এক বৃহৎ অংশ পরিপূর্ণ শিল্পসার্থকতায় উত্তীর্ণ'। গৌরীপ্রসাদ ঘোষ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, 'যে কোনো কারণেই হোক, গান জাতীয় কয়েকটি পংক্তির বিচিত্র বিন্যাসে রচিত গীতিকাব্যের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তা তার স্বতঃস্ফূর্ত উন্মেষের অনুকূলতম ক্ষেত্রটির সন্ধান পেয়েছে। পরিপূর্ণ আত্মসংযোগের শুভ মুহূর্তে ছাড়া তিনি ওড্‌-জাতীয়, মহৎভাবের স্তরে স্তরে বিকশিত, নিখুঁত-সমন্বিত কাব্যরূপ সৃষ্টি করতে পারেননি। অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁর পূর্ণাঙ্গ কবিতার ভাবরাশি অনেক সময়ই বাঁধ ভাঙা নদী স্রোতের মত ছড়িয়ে পড়েছে; শিল্পসংহতির নিখুঁত খাতে প্রবাহিত হয়নি।' গৌরীপ্রসাদ সত্যই বলিয়াছেন, দীর্ঘায়তন কাব্যের অনেক পূর্বে ক্ষুদ্রকায় গীতিরচনায় রবীন্দ্রপ্রতিভা পরিণতশক্তির পরিচয় দিতে পারিয়াছিল।

৬.

গুটিকয় কলাকৈবল্যবাদী ব্যতীত আর কেহ বোধ হয় একথা বিশ্বাস করেন না যে শিল্পের বিচার কেবলমাত্র শিল্পের মানদণ্ডেই সম্ভব। কালে কালে কাব্যবিচারে কখনো সামাজিক কখনো ধর্মীয় পরিবেশের কথা বিবেচিত হইয়াছে। আধুনিক সমালোচনায়ও সাহিত্যাতিরিক্ত মানদণ্ডের প্রয়োগ বিরল নহে।

আধ্যাত্মিক আদর্শে (প্রকৃতপক্ষে হিন্দু আধ্যাত্মিক আদর্শে) কাব্যবিচার স্পৃহা ঊনবিংশ শতকেই লক্ষ করা গিয়াছিল। সাম্প্রতিককালে অন্তত দুইজন প্রবীণ সমা-লোচক এই আদর্শের অনুসরণ করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ

প্রখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। প্রথম যৌবনে তিনি দুয়েকটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন (সম্প্রতি 'সাহিত্যচিন্তা' নামে মুদ্রিত)। তরুণ বয়সের রচনা হইলেও এগুলির লিপিসৌষ্ঠব চিত্তাকর্ষী। ব্রাউনিং বিষয়ক প্রবন্ধটি ইহাদের মধ্যে নানাভাবে শ্রেষ্ঠ। হিন্দু জীবনদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে একজন ভারতীয়ের নিকট ব্রাউনিঙের কাব্য কেন সমাদরলাভের যোগ্য তিনি তাহার সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়াছেন। নলিনীকান্ত গুপ্ত পণ্ডিচেরী অরবিন্দ-আশ্রমের সঙ্গে প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল ধরিয়া যুক্ত। 'সাহিত্যিকা', 'রূপ ও রস', 'শিল্পকথা', 'কবির্মনীষী' প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার সমালোচনামূলক প্রবন্ধসমূহ সংকলিত হয়। নলিনীকান্ত হিন্দু আধ্যাত্মিকতার আদর্শে কাব্যবিচারে অভ্যস্ত হইলেও তাঁহার আলোচনাভঙ্গী হৃদয়গ্রাহী। বিশেষত ফরাসী গদ্যরীতির প্রভাব পড়ায় নলিনী-কান্তের রচনা কখনো অস্বচ্ছ বা আড়ম্বরপূর্ণ হয় নাই। গ্রীক, রোমক ও কেলটিক— ইউরোপীয় কবিত্বের এই ত্রিধারার মধ্যে কেলটিক ধারাটি রবীন্দ্রকাব্যে সূক্ষ্ম মরমী অতীন্দ্রিয়তায় প্রকাশ পাইয়াছে, ইহাই নলিনীকান্তের ধারণা। ট্রাজেডির দুঃখ ভারতীয় চিন্তার সঙ্গে কতখানি সুসমঞ্জস হইতে পারে সেবিষয়ে নলিনীকান্তের অভিমতও কৌতূহল জাগায়। স্বভাবতই আজকাল খুব কম সমালোচক হিন্দুধর্মীয় আদর্শে সাহিত্য-বিচারে উৎসাহিত হন। তবে এই পন্থা যে একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়-প্রণীত 'বঙ্কিম সাহিত্য সমাজ ও সাধনা' গ্রন্থটি তাহার প্রমাণ।

হুমায়ুন কবিরের 'বাংলার কাব্য' সামাজিক পরিবর্তন প্রবাহের পটভূমিকায় বাংলা সাহিত্যের বিকাশ-কাহিনী। দুই ১ মাত্র তথ্যসূত্র অবলম্বনে তিনি যেভাবে সামান্যসত্যে উপনীত হইয়াছেন ('সুবর্ণবণিকদের মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম এবং কাব্যের এই যে ব্যাপ্তি, তার ঐতিহাসিক কারণ…বৌদ্ধবিপ্লবের অবসানে হিন্দু অভ্যুত্থানের যুগেও এই সম্প্রদায় বৌদ্ধ ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখেছিল') তাহাতে তাঁহার বিশ্লেষণ না হইয়াছে ইতিহাস-সম্মত না সাহিত্যগুণোপেত।

উনিশ শ' চল্লিশ সালের কাছাকাছি সময়ে বাংলা সমালোচনায় মার্কসবাদী রীতির প্রভাব পড়ে। প্রকৃত মার্কসবাদী সমালোচনা কাহাকে বলে তাহা অবশ্য নির্দেশ করা সুকঠিন। সাহিত্যের মার্কসবাদী ব্যাখ্যায় যত দল উপদলের সৃষ্টি হইয়াছে গীতা-বেদান্তের ভাষ্যেও ততটা হইয়াছে কিনা সন্দেহ। আশ্চর্য হইবার কারণ নাই, বাংলা সমালোচনায় মার্কসীয়রীতির প্রয়োগে গোড়ার দিকে অতিশয় স্থূল ও রুচিহীন কয়েকটি প্রবন্ধ রচিত হইয়াছিল। সুশোভন সরকারের 'রবীন্দ্রনাথ ও অগ্রগতি' প্রবন্ধটি প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও মার্কসবাদী সমালোচকদের কোনো সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া ওঠার ইঙ্গিত মেলে না।

বাংলা সাহিত্যে মার্কসবাদী সমালোচকরূপে প্রথম খ্যাতিলাভ করেন অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায়। 'সাহিত্য বীক্ষা' তাঁহার প্রবন্ধাবলীর সংকলন। 'মেঘনাদবধ কাব্যে' সমাজবাস্তবতা বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, ফিউডালী ভারতের সহিত ধনবাদী ইংলণ্ডের সংযোগের প্রত্যক্ষ ফল মাইকেল মধুসূদন দত্ত। 'ভারতে নবাগত বুর্জোয়াচেতনার অবস্থা তখন নবজাত শিশুর মতো, 'মেঘনাদবধ' তার প্রথম সবল চীৎকার ধ্বনি।' কিন্তু রামায়ণের কাহিনী এই বুর্জোয়াচেতনার প্রকাশের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিল না। রাবণের চরিত্রবিষয়ে কবি স্বয়ং ছিলেন দ্বিধান্বিত। 'বুর্জোয়াবাদের সহিত ফিউডালবাদের সংঘর্ষের কাহিনীতে বুর্জোয়াবাদের বিজয়ে যাহা হইতে পারিত বিশ্বসাহিত্যের উপযোগী এক বিরাট এপিক, তাহা হইয়া দাঁড়াইল দুইটি ফিউডালবাদী পরিবারের অকারণ কলহের চিত্র, যাহাকে মধুসূদন বলিয়াছেন এপিকলিং।' বঙ্কিম-সাহিত্য বিচারেও সমালোচক নীরেন্দ্রনাথ রায় সামাজিক পরিবর্তন প্রবাহকে মুখ্যরূপে আশ্রয় করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র নারীর স্বাধীন প্রেমের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা সামন্তবাদী সমাজ হইতে মুক্তির ইঙ্গিতে পূর্ণ। 'ধনবাদী সমাজেই প্রথম নারী পায় তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশের ঐতিহাসিক সুযোগ।' প্রতাপের চরিত্রকেও সমালোচকের মনে হইয়াছে বাংলা সাহিত্যে প্রথম 'ধনবাদী আদর্শ অনুযায়ী বীরের চিত্র'। সমালোচক নীরেন্দ্রনাথ কাব্যবিচারে ভাষাসম্পদ ও শিল্পকৌশল বিশ্লেষণের গুরুত্ব অস্বীকার করেন নাই। মধুসূদনের শব্দসম্পদ বিষয়ে তিনি বলিয়াছেন 'সুররেয়ালিস্তদের ভাষার মতো, তাহা ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত ইংগিতে ও অনুষঙ্গে বিভ্রান্তিকর নয়; তাহা পাণ্ডিত্যের সাজে সজ্জিত হইয়াও জনসাধারণের বোধ্য ভাষা হইবার দাবি করিতে পারে।' সাহিত্য-বিচারে প্রথম বিচার্য, রচনার সাহিত্যিক উৎকর্ষ। যে সকল এক-দেশদর্শী মার্কসবাদী সমালোচক ইহা বিস্মৃত হইয়া কেবলমাত্র রাজনৈতিক মতাদর্শের মানদণ্ডে সাহিত্যের বিচার করিতে চাহেন তাঁহাদের একজনের প্রতি কটাক্ষ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, 'তাঁহার মতে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রগতিশীল সাহিত্যিক রচনা—বৌ-ঠাকুরাণীর হাট—সাহিত্যের বিচারে হয়ত যাহার মূল্য অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু বলাকাকেও তিনি প্রগতির শিবির হইতে ছাড়িতে রাজি নন। বাংলা কাব্যসাহিত্যে বলাকার শ্রেষ্ঠত্ব তর্কাতীত। কিন্তু বলাকার কোন্ কবিতায় আছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রত্যক্ষ সমর্থন?' অথচ বিস্ময়ের কথা, নীরেন্দ্রনাথ স্বয়ং কখনো কখনো মার্কসবাদী সমালোচনার উচ্চ আদর্শ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছেন। একস্থলে তিনি লিখিয়াছেন মেঘদূত কাব্য নাকি আসলে 'প্রভুশক্তির বিরুদ্ধে করুণ অভিযোগ' মাত্র।

'বাংলা সাহিত্যে মানবস্বীকৃতি', 'বাঙালী সংস্কৃতির রূপ' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা গোপাল হালদার মহাশয় মননশীল মার্কসবাদী লেখক হিসাবে খ্যাতনামা। কিন্তু তাঁহার লেখাগুলি মার্কসীয় তত্ত্বচিন্তার প্রান্ত ঘেঁষিয়া গিয়াছে বলিলে বোধ হয় সঠিক বলা হয়। অপর একজন তরুণ লেখক দাবি করিয়াছেন তাঁহার 'বঙ্কিম মানস' নামক গ্রন্থে তিনি পুরাপুরি মার্কসীয় বিশ্লেষণপদ্ধতির অনুগত: এ বিষয়ে অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায়ের অভিমত সত্য বলিয়া মনে হয় যে ইহার আলোচনাপদ্ধতি 'মার্কসবাদ অপেক্ষা পরিবেশ বাদের নিকটতর।'

আধুনিক মার্কসবাদী সমালোচকদের মধ্যে বিষ্ণু দে সম্ভবত সর্বাধিক বৈচিত্র্যপূর্ণ মনের অধিকারী। 'রুচি ও প্রগতি', 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' (প্রথমোক্ত গ্রন্থের মার্জিত ও বর্ধিত রূপ), 'মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা', 'রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা' এই চারিটি গ্রন্থে তাঁহার প্রধান প্রবন্ধগুলি লভ্য। 'রুচি ও প্রগতি' গ্রন্থের 'ঈশ্বর গুপ্ত' প্রবন্ধটি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। আধুনিক কাব্য পাঠককে তিনি ঈশ্বর গুপ্তের দুইটি গুণ আয়ত্ত করিতে বলিযাছেন—বাক্যবিন্যাসের দেশজ রীতি এবং বস্তুনির্ভর সাধারণ সুস্থবুদ্ধির সরসতা। একালের রুচিতে ঈশ্বর গুপ্তের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় বিষ্ণু দের দান নগণ্য নহে। উনিশ শতকী বেণাসার প্রেক্ষাপটে মাইকেল প্রতিভার মূল্যাযনেও তিনি দক্ষতা দেখাইযাছেন। মার্কসবাদী সমালোচকরূপে বিষ্ণু দের প্রশংসা করিলে প্রকৃতপক্ষে আধুনিক কাব্যান্দোলনেরই প্রশংসা করা হয। যে-মন যে-রুচি ও দৃষ্টি লইযা তিনি সমালোচনা র্মে আত্মনিয়োগ করেন তাহা নব্য কাব্যকলার সৃষ্টি। বস্তুত কল্লোলোত্তর কবিগোষ্ঠীর মধ্যে যাঁহারা সমালোচনাব্রতে যোগ দিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রত্যেকের রচনায় সতেজ প্রাণশক্তি, দুঃসাহস ও দুর্মর আশাবাদের বিস্ময়কর ছাপ পডিয়াছে।

আমরা বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের প্রধান ধারাগুলির উল্লেখ করিলাম। বহু শক্তিশালী ও বিদগ্ধ সমালোচকের নাম বাদ পড়িয়াছে। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে সহজেই অনুমিত হইবে আধুনিক বাংলা সমালোচনায় বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তি পূর্ব-যুগের তুলনায় অধিক। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বা রামেন্দ্রসুন্দরের মতো মহানায়ক হয়ত শীঘ্র আর আবির্ভূত হইবেন না। কিন্তু বহু সমালোচকের মিলিত প্রয়াসে যে বস্তুনিষ্ঠ কাব্যবিচার পদ্ধতি গড়িয়া উঠিযাছে সমগ্রভাবে ইহার মূল্য ও গৌরব অনুপেক্ষণীয়।

কাব্যসত্য ও জীবনসত্য ঃ আরিস্টট্‌ল

ভবতোষ চট্টোপাধ্যায়

১.

আরিস্টট্‌লের 'কাব্যনির্মাণকলা' গ্রন্থটির* রচনাকাল আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ৩৩০ অব্দ। ক্ষুদ্রকলেবর একটি পুস্তিকা, পদচারী অধ্যাপকের ভাষণের সংক্ষিপ্তসার, ইনগ্রাম বাইওয়াটারের ইংরেজী অনুবাদে তিয়াত্তর পৃষ্ঠা। গ্রন্থটি অসম্পূর্ণ, যে নিবন্ধটি আমাদের হাতে এসেছে সম্ভবত সেটি প্রথম খণ্ড। সংযত, অনুদাত্ত, নিরুত্তাপ স্বর ; ভাষা সতর্ক, বাহুল্যবর্জিত, নিশ্ছিদ্র, নিরক্ত ; কবিদার্শনিক প্লেটোর উদ্দীপক কল্পনা ও বাগৈশ্বর্য এখানে অনুপস্থিত।** 'যা কিছু আরিস্টট্‌ল স্পর্শ করেছেন তাই-ই প্রস্তরীভূত হয়েছে'—কোন বিখ্যাত অধ্যাপকের এই মন্তব্য অনধিকারীর প্রগল্‌ভ উক্তি বলে মনে হতে পারে, কিন্তু কাব্যের নীলাঞ্জনবর্জিত, গাণিতিক সূত্রের মতো নিরাভরণ, আপাতশুষ্ক এই গ্রন্থটি পাঠে রসপিপাসু পাঠার্থীর মনে এই প্রতিক্রিয়া অপ্রত্যাশিত নয়। তবু দুই সহস্রাধিক বৎসর পরেও কাব্যরহস্যানুসন্ধিৎসুর পক্ষে এটি এখনও আকর গ্রন্থ, কাব্যমীমাংসার ক্ষেত্রে ('কাব্য' শব্দটি এখানে ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত) এর আসন এখনও শ্রেষ্ঠ, এই গ্রন্থের একমাত্র সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী আনন্দবর্ধনের 'ধ্বন্যালোক'। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে গ্রন্থটির এই অনুপমেয় সজীবতা ভাষান্তরেও ক্ষুণ্ণ হয়নি, যদিও ভাষান্তর অর্থোপপত্তির অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে। (একটি দৃষ্টান্ত ঃ কবি-কৃতির গ্রীক্ প্রতিশব্দের অর্থ 'নির্মাণ'।)

এই আশ্চর্য সজীবতা, এই কালাতিক্রমী জীবনীশক্তির উৎস কি? এই প্রশ্নের একাধিক উত্তর পাওয়া গেছে। প্রথম উত্তর ঃ কাব্যাস্বাদন অনুভূতিনির্ভর এবং এই কারণেই কাব্যালোচনা কখনই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের বিমূর্ততা ও নৈর্ব্যক্তিকতায় পৌঁছতে পারে না। অথচ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের অব্যক্তিকতা ও অনড়তা না থাকলে কাব্যবিচার হবে ভিন্ন ভিন্ন পাঠকের ভিন্ন রুচির উপর অপেক্ষিত। আরিস্টট্‌লের মনীষার বিশিষ্টতা এই যে তিনি সংবেদনের বিশ্লেষণকে সংজ্ঞার্থ (definition) ও

---

* অতঃপর সংক্ষেপিত নাম 'কাব্যকলা' ব্যবহার করা হয়েছে।

** এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে আরিস্টট্‌লের প্রথম দিকের রচনায়—সেগুলির অধিকাংশই প্লেটোর অনুসরণে লিখিত—আবেগ ও কল্পনা দুইই বিদ্যমান।

তত্ত্বের স্তরে উন্নীত করেছেন। যথার্থ সমালোচনায় থাকে সহৃদয়তা ও সুবেদিতার (sensitivity) সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞানের সমন্বয়। আরিস্টট্‌লের রসজ্ঞতার প্রমাণ এই যে তাঁর গ্রন্থপাঠে আমাদের চিত্তবৃত্তি উন্মেষিত হয়, কাব্যানুভূতি তীক্ষ্ণতর হয়। কিন্তু তিনি শুধু রসবেত্তা নন, তাঁর কাব্যালোচনায় আছে বিশেষ উপলব্ধি থেকে সামান্য (universal) অনুমানে উত্তরণ। দ্বিতীয় উত্তর : মধ্যযুগে যুক্তিবাদী ও এক অর্থে সংশয়বাদী গ্রীক্ মানসতার স্থান নিয়েছিল অবিচলিত, নির্বিচার, অনক্ষ প্রত্যয়। ইতালীয় কবি দান্তের মতে আরিস্টট্‌ল জ্ঞানীদের শিক্ষক, আর মধ্যযুগের খৃষ্টীয় সন্ত ও দার্শনিকেরা আরিস্টট্‌লকে দেখেছিলেন শুধু চিন্তানায়করূপে নয়, অভ্রান্ত শিক্ষা-গুরুরূপে। আধুনিককালে জীবনদর্শনের পরিবর্তনের সঙ্গে আরিস্টট্‌লের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিবর্তন ঘটেছে। আরিস্টট্‌লের কাব্যমীমাংসা-গ্রন্থে যা আমরা সন্ধান করি অথবা যা অন্বেষণীয় তা কাব্যবিষয়ক বিভিন্ন জটিল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর নয়, যথাযথ প্রশ্ন। কাব্যালোচনায় পাঠকের জিজ্ঞাসাকে তিনি উদ্দীপিত ও চালিত করেছেন, এবং সেই অর্থে আরিস্টট্‌লের এই গ্রন্থটির সার্থক সংজ্ঞা হতে পারে ‘কাব্যমীমাংসা’ নয়, ‘কাব্যজিজ্ঞাসা’।

তৃতীয় উত্তর : কাব্যালোচনায় একটি মৌল, অমীমাংসিত প্রশ্ন, কাব্য ও জীবনের সম্পর্ক। কাব্য জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত, জীবনই কাব্যের প্রাণশক্তির উৎস, অথচ কাব্য ও জীবনের মধ্যে ব্যবধান অনতিক্রমণীয়। কাব্যসৃষ্টির রহস্য কি ? কবি কি অনুকারীমাত্র, অথবা স্রষ্টা ? কবির সৃষ্ট বা নির্মিত জগৎ কি অলৌকিক ও অনপেক্ষিত, অথবা দর্পণে বিম্বিত প্রতিচ্ছায়া ? কাব্য পাঠকের মনে যে অনুভূতির উদ্রেক করে তা কি লৌকিক অনুভবের অনুরূপ, অথবা গুণগতভাবে স্বতন্ত্র ? কাব্য যদি অলৌকিক হয় তবে লৌকিক জীবনের মানদণ্ডে কি তার বিচার বা আলোচনা সম্ভব ? আরিস্টট্‌লের গ্রন্থে এইসব প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা পাওয়া যাবে না, কিন্তু এই প্রশ্নাদির উপর তিনি তাঁর সন্ধানী আলোক—কখনও তীব্র, কখনও মৃদু অথচ দীপ্তিদায়ক—নিক্ষেপ করেছেন। এই গ্রন্থে এমন অনেক মন্তব্য আছে যাতে তাঁকে কলাকৈবল্যবাদী, বিশুদ্ধ শিল্পের প্রবক্তারূপে অভিহিত করা যেতে পারে (কাব্যশরীরের স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও ইতিহাসনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী নব্যসমালোচকেরা আরিস্টট্‌লকে তাঁদের পূর্বসূরী বলে মনে করেন), আবার তিনি কাব্যে ও শিল্পে জীবনের অবিকল প্রতিরূপের কথাও উল্লেখ করেছেন। আরিস্টট্‌লের বিভিন্ন উক্তির দ্ব্যর্থকতা কাব্যের স্বরূপ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর উভয়বলতার পরিচায়ক, কিন্তু আরিস্টট্‌লের দর্শন প্রধানত জীবনমুখী—প্লেটোর অলৌকিক, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জীবনের অতীত, ধ্রুব আদিরূপ থেকে তিনি দৃষ্টি

ফিরিয়ে এনেছেন ঐকাহিক, চঞ্চল, সজীব, বাস্তব জীবনের দিকে—এবং তাঁর কাব্যতত্ত্ব গভীর জীবনচেতনা থেকে উৎসারিত। 'জীবন' কথাটি, যার গ্রীক্ প্রতিশব্দ bios, বারবার দেখা দিয়েছে আরিস্টট্‌লের রচনায়, বিশেষ করে তাঁর 'কাব্যকলা' গ্রন্থে, এবং তাঁর বিখ্যাত উক্তি 'কবির অনুকরণের বিষয় মানুষের কর্মবৃত্তি' তাঁর প্রত্যয়ের স্বাক্ষর বহন করছে। এই প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি এম্পিডক্লিস সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য। এম্পিডক্লিসকে যে তিনি কবি হিসাবে স্বীকৃতি দেননি তার কারণ এম্পিডক্লিসের প্রতিভা ছিল মুখ্যত বৈজ্ঞানিক: তাঁর রচনা ছন্দোবদ্ধ হলেও তিনি নির্মাণক্ষমা প্রতিভার পরিচয় দেননি। কিন্তু এম্পিডক্লিসের কবিকর্ম কি শুধুই বহিরঙ্গমূলক? তাঁর প্রকৃতিবিষয়ক একটি কবিতায় আমরা পাই মহাজাগতিক নাটকের ব্যাপ্তি, এবং কবিতাটি অসম্পূর্ণ হলেও এতে এক চমৎকারী কল্পনাশক্তি পরিস্ফুট। তাঁর আর একটি কবিতার বিষয় নরক থেকে স্বর্গ পর্যন্ত মানাবাত্মার তীর্থযাত্রা, এবং কবিতাটির ভাষা ও ছন্দে সেই তীর্থযাত্রার বেদনা ও আনন্দ সার্থকভাবে পরিবাহিত। আরিস্টট্‌লের মতে কাব্যের প্রধান উপজীব্য মানুষের জীবন, মনুষ্যেতর জগৎ নয়, বিশুদ্ধ নিসর্গলোক নয়, অথবা জীবনাতীত শাশ্বতলোক নয়। এই অনুমান হয়ত অমূলক নয় যে এম্পিডক্লিসের কাব্যের মহাজাগতিক পটভূমি আরিস্টট্‌লের কাছে অলীক বলে মনে হয়েছিল, এবং সম্ভবত এই কারণেই তিনি এম্পিডক্লিসের কবিকৃতি অস্বীকার করেছেন। কবির সৃজনীপ্রতিভা বা নির্মাণকুশলতা এবং শিল্পের স্বকীয়তা ও স্বয়ম্ভরতার উপর আরিস্টট্‌ল আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, কিন্তু তিনি সমভাবেই গুরুত্ব দিয়েছেন জীবনের প্রতি শিল্পের আনুগত্যের উপর। শিল্পকর্মের স্বকীয়তা বা অনন্যপরতা ও জীবননির্ভরতা—এই দুই মেরুতে আরিস্টট্‌লের কাব্যজিজ্ঞাসা আন্দোলিত হয়েছে, এবং তাঁর বহু-আলোচিত অনুকরণতত্ত্বে তিনি এই মীমাংসায় উপনীত হয়েছেন বলে মনে হয় যে শিল্পসত্য ও জীবনসত্যের পূর্ণ সমন্বয়ের মধ্যেই শিল্পের সার্থকতা। সুবেদিতা, বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠা, তত্ত্বজ্ঞান, মৌলিক প্রশ্নের উত্থাপন—আরিস্টট্‌লের 'কাব্যকলা' বিবিধ গুণের এক বিস্ময়কর সংশ্লেষ, কিন্তু একথা বলা হয়ত ভুল হবে না যে গ্রন্থটির আশ্চর্য প্রাণশক্তির প্রধান উৎস আরিস্টট্‌লের গভীর জীবনচেতনা।

২.

'শিল্প প্রকৃতিকে অনুকরণ করে' আরিস্টট্‌লের এই মূল্যবান উক্তিটি আছে তাঁর 'আবহবিদ্যা' গ্রন্থে, এবং তাঁর 'পদার্থবিদ্যা' গ্রন্থেও অনুরূপ উক্তি পাওয়া

যায়।* এই উক্তির অর্থ উপলব্ধি করতে হলে জীবন ও প্রকৃতি সম্পর্কে আরিস্টট্‌লের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে অন্তত প্রাথমিক পরিচয় প্রয়োজন। আরিস্টট্‌ল মুখ্যত প্রয়োগবাদী ও জীববিজ্ঞানী (তাঁর বিপিতা ছিলেন চিকিৎসাবিদ্), যদিও যৌবনের প্রারম্ভ থেকে প্রায় বিশ বৎসরকাল তাঁর কেটেছিল প্লেটোর শিষ্যত্বে। অতীন্দ্রিয়বাদ থেকে প্রযোগবাদে (empiricism) এই পরিণতি দর্শনের ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ঘটনা। প্লেটোর কাছে সত্য ছিল পরিবর্তনশীল বস্তুনিচয়ের ঊর্ধ্বে শাশ্বত, অচঞ্চল আদিরূপ (archetype)—প্লেটোর মতে একমাত্র এই ধ্রুব আদিরূপেরই প্রমাজ্ঞান (valid knowledge) সম্ভব,—আর আরিস্টট্‌লের দর্শনে এই জীবন্ত বস্তুলোকই সত্য ও বাস্তব। প্রাণিজগৎ ও উদ্ভিদ্‌জগতের সমীক্ষায় যে চিন্তা তাঁকে বিশেষভাবে আলোড়িত করেছিল তা হল সৃষ্টি, বিকাশ ও বিবর্ধনের রহস্য, এবং শিল্পনির্মাণ-পদ্ধতিতেও তিনি লক্ষ্য করেছেন সেই একই প্রক্রিয়ার পুনর্বৃত্তি। একটি গাছের বীজ কিভাবে মহীরুহে পরিণত হয়? তিনি এই ক্রমবিকাশ ও পরিণতির চতুর্বিধ কারণ ('পদার্থবিদ্যা' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য) নির্দেশ করেছেন: আদি কারণ (efficient cause), সমবায়ী কারণ (material cause), অবয়বী কারণ (formal cause), ও চূড়ান্ত কারণ (final cause)।

যে কোন প্রাণী বা উদ্ভিদ্ বা মনুষ্যনির্মিত বস্তু দুই অংশে বিভাজ্য—উপাদান (matter) ও অবয়ব বা গঠনবিন্যাস (form)। তামা বিভিন্ন বস্তুর উপাদান হতে পারে; কিন্তু একই উপাদান ~.ত্ত্বও পুষ্পাধার ও দীপাধারের গঠনপ্রকৃতি ভিন্ন, এবং এই সংযুক্তিগত (structural) প্রভেদের জন্যই দুটি বস্তু দুই স্বতন্ত্র পরিণতিতে পৌঁছেছে। ঘোটক ও বৃষভের মৌল রাসায়নিক উপাদান ও তন্তু (tissue) অভিন্ন হতে পারে, কিন্তু গঠনপ্রকৃতির প্রভেদের জন্য ঘোটক ও বৃষভ দুটি স্বতন্ত্র প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। বিশেষ উপাদান বা উপাদানসমূহের মিশ্রণ পূর্বনির্দিষ্ট সংযোজন-সূত্র (structural principle) অনুযায়ী বিশেষ আকার বা অবয়ব লাভ করে, এবং এই বিশেষ অবয়বই বস্তুর স্বকীয় রূপ। উপাদানকে বস্তুর বহিরঙ্গ মনে করলে ভুল

---

* অধিকাংশ আধুনিক গবেষকের মতে 'কাব্যকলা' গ্রন্থটি আরিস্টট্‌লের শেষ পর্যায়ের রচনা। এর তাৎপর্য এই যে এই গ্রন্থে প্রতিফলিত হয়েছে আরিস্টট্‌লের সামগ্রিক জীবনদর্শন যা 'পদার্থবিদ্যা', 'আবহ-বিদ্যা' 'মনোবিদ্যা', 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান,' 'নীতিবিদ্যা' ইত্যাদি গ্রন্থে আলোচিত ও নিবদ্ধ হয়েছে। এই সামগ্রিক জীবনদর্শনের আলোকেই আরিস্টট্‌লের কাব্যতত্ত্বের বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। 'কাব্যকলা' গ্রন্থের সূচনায় আরিস্টট্‌ল বলেছেন যে তিনি আলোচনায় 'স্বাভাবিক ক্রম' অনুসরণ করবেন: এখানে 'পদার্থবিদ্যা' গ্রন্থে আলোচিত বস্তুর উৎপত্তি ও পরিণতির চতুর্বিধ কারণের ইঙ্গিত আছে।

হবে ; উপাদান সেই স্থিতিশীল অবস্থা যা পূর্ণ পরিণতি বা অবয়ব লাভ করেনি এবং যা পূর্ণ পরিণতির জন্ম অপেক্ষমান। প্রাকৃতিক জগতে জন্ম ও বিকাশের ধারায় ও শিল্পকর্মের গঠনপ্রণালীতে আরিস্টটল দেখেছেন অস্ফুট সম্ভাবনা থেকে এক নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা পরিণতির দিকে যাত্রা, এবং নির্ধারিত বা প্রকৃত লক্ষ্যে উত্তরণের মধ্যেই প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তি।* উপাদান ও অবয়বের, সম্ভাবনা ও পরিণতির এই বৈপরীত্য ও সাযুজ্য সৃষ্টিক্রিয়ার মূলসূত্র, এবং পূর্বোল্লিখিত চতুর্বিধ কারণে আরিস্টটল সৃষ্টিক্রিয়ার বিস্তৃততর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। একটি উদ্ভিদ্ বা প্রাণী বা শিল্পকর্মের উৎপত্তি ও পরিণতির পিছনে চতুর্বিধ কারণ আছে এবং এই চতুর্বিধ কারণই সম্মিলিতভাবে ক্রিয়াশীল। একটি বটগাছের কথা ধরা যাক্। বটগাছের বীজ চারাগাছে পরিণত হয়েছে এবং চারাগাছ ক্রমে মহীরুহের বিশালতা লাভ করেছে। যে বীজ থেকে বটের চারা জন্ম নিয়েছে এবং যে বীজের মধ্যে বটের অঙ্কুর ও পরিণত বটবৃক্ষের রূপ নিহিত তাকে বটবৃক্ষের সমবায়ী কারণ বলা যেতে পারে। এই বীজ বা বীজাঙ্কুর বিকাশের এক নির্দিষ্ট ধারা অনুযায়ী এক বিশেষ আকার লাভ করেছে, যার ফলে সেই বীজ অশ্বত্থ বৃক্ষের অবয়ব না পেয়ে বটবৃক্ষের রূপ পেয়েছে। একে বলা যেতে পারে অবয়বী কারণ। এই বীজ স্বয়ম্ভু নয়, অপর এক বটবৃক্ষজাত। সেই জনিতা বৃক্ষ ও তার বীজোৎপাদক ক্রিয়াকে বলা যেতে পারে আদি কারণ। বীজের উন্মেষ ও বিকাশের সমগ্র ধারা একটি বিশেষ উদ্দেশ্য বা পরিণতির দিকে অগ্রসর। সেই পরিণতি বটবৃক্ষের চূড়ান্ত কারণ। আরিস্টটলের সূত্র অনুসারে একটি ট্র্যাজিডি বা করুণরসাত্মক নাটকের উৎপত্তির চতুর্বিধ কারণ কি ? নাট্যকার—বিশেষভাবে তাঁর নির্মাণক্ষমতা—নাটকটির আদি কারণ। ভাষা, ছন্দ ও সুর এবং চরিত্র ও আখ্যানবস্তু (করুণরসাত্মক নাটক ও হাস্যরসাত্মক নাটকের আখ্যানবস্তু ও চরিত্র গুণগতভাবে প্রভিন্ন) নাটকটির সমবায়ী কারণ।** নাটক বর্ণনাত্মক নয়, ক্রিয়াত্মক, এবং নির্মাণ বা অনুকরণের এই

---

* আরিস্টটলের মতে একটি বস্তু বা প্রাণীর একটিমাত্র স্বাভাবিক পরিণতি আছে। আধুনিক অভিব্যক্তিবাদের সঙ্গে আরিস্টটলের মতবাদের মূল পার্থক্য লক্ষ্যের এই নির্দিষ্টতায় এবং বিভিন্ন প্রজাতির শ্রেণীবদ্ধীকরণে, যদিও ডারউইন আরিস্টটলের সমীক্ষাপ্রণালীর সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন।

** উপাদান (যেমন শব্দ, রঙ, সুর) ও উপকরণ (যেমন, আখ্যানবস্তু, চরিত্র) উভয়ই সমবায়ী কারণের অন্তর্ভুক্ত। আরিস্টটল উপাদান, অনুকার্য বিষয়, ও অনুকরণরীতি—এই তিনটি সূত্রদ্বারা ললিতকলাভুক্ত বিভিন্ন শিল্পের প্রভেদ নির্ণয় করেছেন (প্রথম পরিচ্ছেদ)। উপাদান বা অনুকার্য বিষয় (বা উপকরণ) সমবায়ী কারণভুক্ত, অনুকরণরীতি (যেমন, বর্ণনা, নাট্যক্রিয়া) অবয়বী কারণের অন্তর্ভুক্ত। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে করুণরসাত্মক নাটকের ছয়টি প্রত্যঙ্গের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে দুটি (ভাষা ও সুর)

বিশেষ রীতি অবয়বী কারণ।* সমগ্র নাটকটি একটি বিশেষ লক্ষ্যের পথে ক্রমোন্মিষিত—সেই লক্ষ্য অনুকম্পা ও শঙ্কা উদ্দীপক ও চিত্তশোধক বৃত্তান্তের অনুকরণ বা নির্মাণ,—এবং এই নির্মাণ বা পরিণতি নাটকটির চূড়ান্ত কারণ।** প্রাকৃতিক সৃষ্টিক্রিয়ায় ও শিল্পনির্মাণক্রিয়ায় অবয়বী কারণ ও চূড়ান্ত কারণ বা পরিণতি অভেদ, কারণ নির্দিষ্ট অবয়ব লাভই বস্তুসত্তা ও জীবসত্তার চরম উদ্দেশ্য। আদি কারণ ও অবয়বী কারণকেও এক অর্থে অভিন্ন বলা যেতে পারে। শিল্পী বা তাঁর নির্মাণক্ষমতা শিল্পকর্মের আদি কারণ; কিন্তু তাঁর লক্ষ্য একটি অমূর্ত (undetermined) অবয়বকে রূপায়িত করা, এবং এই অর্থে শিল্পীর মানসলোকে সংস্থিত এই অবয়বই শিল্পকর্মের অব্যবহিত কারণ। সুতরাং এই চতুর্বিধ কারণের মধ্যে প্রকৃত বৈপরীত্য অমূর্ত উপাদান-উপকরণ (medium and material) ও পরিণত অবয়বের (realized form) মধ্যে।

এই প্রসঙ্গে প্রকৃতি বা জীবজগতে সৃষ্টিক্রিয়া ও শিল্পনির্মাণক্রিয়ার মধ্যে তিনটি পার্থক্য উল্লেখ করা প্রয়োজন। একটি বটগাছের বীজ বিকাশ লাভ করে পরিণত বটবৃক্ষে, এবং সেই পরিণত বটবৃক্ষ নূতন বীজের সৃষ্টি করে। এক পরিণত প্রাণী অনুরূপ এক প্রাণীর জনক। কিন্তু একটি পরিণত শিল্পকর্ম অপর এক নূতন শিল্পকর্মের নির্মাতা নয়, যদিও একটি পরিণত শিল্পকর্ম শিল্পীর মনে নূতন শিল্পকর্মের উদ্দীপক হতে পারে। দ্বিতীয় প্রভেদ, উদ্দেশ্য বা চেতনার স্তরে। প্রাকৃতিক জননক্রিয়ায়, প্রাণের উন্মেষ ও বিকাশধারায় আরিস্টট্‌ল লক্ষ্য করেছেন এক অবচেতন উদ্দেশ্য, এবং এই উদ্দেশ্যবাদ তাঁর জীবনদর্শনের একটি প্রধান সূত্র। শিল্পনির্মাণের ক্ষেত্রে—বিশেষভাবে

উপাদানভুক্ত, তিনটি (আখ্যানবস্তু, চরিত্র, চিন্তন) উপকরণের অন্তর্ভুক্ত, ও একটি (মঞ্চসজ্জা অথবা রূপ-সজ্জা) অনুকরণরীতি বিষয়ক। আরিস্টট্‌ল এখানে আখ্যানবস্তু (mythos) ও নাট্যক্রিয়ার (Praxis) মধ্যে পার্থক্য করেননি। আখ্যানবস্তু নাট্যক্রিয়ায় রূপায়িত হয়; এবং আখ্যানবস্তু সমবায়ী কারণের অন্তর্গত হলেও রূপায়িত আখ্যান বা নাট্যক্রিয়া (রূপায়িত চরিত্র ও নাট্যক্রিয়া পরস্পর সম্বদ্ধ) অবয়বী কারণের অন্তর্ভুক্ত হবে।

* অনুকরণ-রীতি অবয়বী কারণের অন্তর্ভূত, কিন্তু শুধুমাত্র অনুকরণ-রীতিকে অবয়বী কারণ বললে অংশের সঙ্গে সমগ্রের পার্থক্য করা হয় না। অবশ্য ব্যাপক অর্থে অনুকরণ-রীতি ও অবয়বী কারণ সমার্থবোধক।

** অনেক সমালোচকের মতে শঙ্কা ও অনুকম্পা উদ্রেক ও উদ্রিক্ত অনুভব বা প্রক্ষোভের বহিষ্করণ-দ্বারা চিত্তশোধন ট্র্যাজিডির চূড়ান্ত কারণ। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত আরিস্টট্‌ল-সম্মত নয়। আরিস্টট্‌ল সুস্পষ্টভাবে বলেছেন (কাব্যকলা : ৬) যে যথাযথ আখ্যায়িকানির্মাণই ট্র্যাজিডির চরম লক্ষ্য।

কারুকলায়—এই উদ্দেশ্য অনেক বেশী তীক্ষ্ণ: শিল্পী সচেতনভাবে লক্ষ্যের দিকে উপাদানকে নিয়ন্ত্রিত করেন। তৃতীয় এবং সবচেয়ে মৌলিক পার্থক্য, প্রাণ বা গতির উৎপত্তিতে। প্রাকৃতিক পদার্থে প্রাণ বা গতির উৎস আভ্যন্তরিক। কৃত্রিম বা মনুষ্যনির্মিত বস্তুতে এই উৎস বাহিরিক, শিল্পী তাঁর নির্মিত বস্তুতে এই গতিবেগ সঞ্চারিত করেন।*

৩.

আরিস্টটল তাঁর জীববিজ্ঞানী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে শিল্পকর্মের মধ্যে লক্ষ্য করেছেন প্রাণধর্ম ও জীবন্ত প্রাণীর সঙ্গে সারূপ্য, এবং এই বিশেষ অর্থে শিল্প—ললিতকলা ও চারুকলা—প্রকৃতি ও জীবনের অনুসারী। প্রকৃতিতে আছে এক আশ্চর্য শৃঙ্খলা, সংহতি, সামঞ্জস্য ও পরিমিতি, এবং অনবচ্ছেদ গতি,* এবং এইসব গুণ উৎকৃষ্ট শিল্পকর্মেরও লক্ষণ।** কিন্তু শিল্প ও প্রকৃতির এই সমধর্মিতা সত্ত্বেও জৈব পদার্থের মতো শিল্পকর্মের স্বকীয়, আভ্যন্তরিক প্রাণশক্তি নেই, শিল্পকর্ম প্রাকৃতিক বস্তুনিচয়ের অনুকরণ। কিন্তু প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া কোন কিছুর অনুকরণ নয়। আরিস্টটল এখানে পিথাগোরাস ও প্লেটো কর্তৃক ব্যবহৃত 'অনুকরণ' শব্দটি নূতন অর্থে প্রযোগ করেছেন। প্লেটোব মতে অনিত্য বাহ্য বস্তুসমূহ ইন্দ্রিয়াতীত শাশ্বত আদিরূপসমূহের প্রতিচ্ছায়া। এই আদিরূপসমূহই বাস্তব, পরম সত্য, অন্যান্য রূপের সত্যতা আপেক্ষিক মাত্র। 'অনুকবণ' শব্দটি এখানে সত্য-অসত্যের সম্বন্ধনির্ণায়ক। ঈশ্বরকে যদি সত্যস্বরূপ বলা হয়, তবে প্রকৃতি বা জগৎ অনুকরণ। প্রাকৃতিক বস্তুসমূহকে যদি সত্য (আপেক্ষিক অর্থে) বলা যায়, তবে তাদের

---

* আরিস্টটলের ঈশ্বর বাহ্যবস্তুতে গতি ও প্রাণের আদি ও পবম প্রভব (Prime Mover), এবং এই অর্থে প্রাকৃতিক পদার্থেব গতিও বহিরারোপিত।

* 'অধিবিদ্যা' গ্রন্থে আরিস্টটল বলেছেন যে অপকৃষ্ট করুণরসাত্মক নাটকের বিন্যাসদোষ—যা অসম্পৃক্ত ঘটনাবলীতে প্রকট—প্রাকৃতিক বস্তুতে নেই। প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য সংসক্তি ও সন্তত গতি।

** শিল্প শুধুমাত্র 'প্রকৃতির অনুসারী নয়, পরিপূরক। প্রকৃতিব মধ্যে অসম্পূর্ণতা আছে, কিন্তু প্রকৃতি পূর্ণতার অভিসারী; এবং প্রকৃতির ধারা অবলম্বন করেই শিল্প প্রকৃতির অপূর্ণতা পূরণ করে। 'আবহবিদ্যা' গ্রন্থে আরিস্টটল এই প্রসঙ্গে রন্ধনশিল্পের উল্লেখ করেছেন: রন্ধনকুশলতা পরিপাক কার্যের সহায়ক এবং এই অর্থে প্রকৃতির উদ্দেশ্যেব সাধক।

সংসক্তি ও কার্যকাবণ সম্পর্ক প্রকৃতির নিয়ম। মানুষেব জীবনে যা কিছু ঘটে তার মধ্যে অনেক সময় কার্যকাবণ সম্পর্ক ও সংসক্তির অভাব দেখা যায়। কাব্যলোকের বিধি প্রাকৃতিক নিয়মের অনুসারী: সেখানে আপতিক ঘটনার উপস্থাপন নিষিদ্ধ, কার্যকারণ সম্পর্কের অভাব সেখানে অমার্জনীয়।

ছায়া ও প্রতিবিম্ব অনুকরণ। কারুশিল্পীনির্মিত বস্তু যদি সত্য হয়, তবে সেই বস্তুর প্রতিকৃতি অনুকরণ। প্রকৃত সত্যের রূপ উপলব্ধি করতে পারলে 'অনুকরণ' অবান্তর ও অর্থহীন হয়ে পড়ে। আরিস্টট্‌লের মতে সামান্য সত্য বিমূর্ত (abstract), আদি-রূপসমূহ একই সঙ্গে মূর্ত (concrete) আদর্শ ও সামান্য সত্য হতে পারে না। তিনি প্লেটোর আদিরূপকে বর্জন করেছেন, এবং বাহ্য জগৎকে—বাহ্য জগতের প্রত্যেকটি বস্তুকে—বাস্তব ও সত্য বলে গণ্য করেছেন। 'অনুকরণ' শব্দটিকে তিনি প্রয়োগ করেছেন সত্য-অসত্যের সম্বন্ধনির্ণায়ক রূপে নয়, প্রকৃতির সঙ্গে শিল্পকর্মের প্রভেদক রূপে।

ললিতকলা ও কারুকলা উভয় প্রকার শিল্পই অনুকরণ বা নির্মাণ। কাব্যনির্মাণ ও গৃহনির্মাণ সমধর্মী (গৃহনির্মাণ আরিস্টট্‌লের একটি প্রিয় উপমা)। কবি ও স্থপতি উভয়েই প্রাকৃতিক প্রকরণের (natural process) অনুসরণে* বিভিন্ন উপাদানের মিশ্রণে নূতন বস্তু নির্মাণ করেন, এবং এখানে তাঁদের সঙ্গে বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের প্রভেদ। আরিস্টট্‌ল বিজ্ঞানকে তিন অংশে ভাগ করেছেন ('আবহবিদ্যা' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য) : তাত্ত্বিক (theoretical), ফলিত বা ব্যবহারিক (practical), এবং উৎপাদী (productive)। প্রত্যেক বিজ্ঞানের আশু উদ্দেশ্য জ্ঞানলাভ, কিন্তু চূড়ান্ত উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের চূড়ান্ত লক্ষ্য জ্ঞানসঞ্চয়ন বা সত্যের নিরাসক্ত মনন, ব্যবহারিক বিজ্ঞানের লক্ষ্য ঘটনা ও আচরণের নিয়ন্ত্রণ, এবং উৎপাদী বিজ্ঞানের লক্ষ্য উপযোগী অথবা সুন্দর বস্তু নির্মাণ। কারুকলা ও ললিতকলা উভয়ই উৎপাদী বিজ্ঞানের অন্তর্ভূত, কিন্তু এই দুই প্রকার শিল্পের মধ্যে মৌলিক প্রভেদ আছে। প্রথম প্রভেদ নির্মাণ বা উৎপাদনের লক্ষ্যে। কারুশিল্পে বস্তুর নির্মাণই চরম লক্ষ্য নয়, কারণ নির্মিত বস্তু ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন সাধন করে। ললিতকলায় নির্মাণকার্যই মুখ্য উদ্দেশ্য (কবি-কৃতি শুধু নির্মাণ নয়, একটি কর্ম, এবং আরিস্টট্‌লের মতে কর্মের চূড়ান্ত লক্ষ্য কর্মসাধন), এবং কবিকর্ম যদি অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধন করে—যেমন চিত্তশোধন, বা বোধসম্পাদন (আরিস্টট্‌লের মতে এই বোধ বা জ্ঞান প্রত্যভিজ্ঞাজাত),—সেই উদ্দেশ্য গৌণ বা আনুষঙ্গিক। লক্ষ্যের বা চূড়ান্ত কারণের এই প্রভেদ ছাড়াও দুই শিল্পকর্মের মধ্যে আছে উপাদানগত বা সমবায়ী কারণের প্রভেদ। সূত্রধর একটি কাষ্ঠাধারের অনুকরণে আর একটি কাষ্ঠাধার নির্মাণ করে ; কিন্তু দুই কাষ্ঠাধারের উপকরণ ও অবয়ব অভিন্ন, এবং এখানে অনুকরণের প্রকৃত অর্থ নূতন নির্মাণ নয়, অনুকৃতি। ললিতকলায় শিল্পী বস্তুর অবয়বকে মূল থেকে বিশ্লিষ্ট করে তাঁর শিল্পের উপাদানে আরোপিত করেন : বস্তু

* আরিস্টট্‌ল মনে করেন যে প্রথম গৃহনির্মাতা প্রাকৃতিক গুহার অনুকরণ করেছিল।

বা প্রাণীর স্বকীয় অবয়ব ও নূতন উপাদানের এই সংশ্লেষের ফলে এক নূতন রূপের সৃষ্টি হয়। প্লেটোর মূর্ত আদিরূপকে কবি-কল্পনা আখ্যা দিয়ে আরিস্টটল উপস্থাপিত করেছেন এই নূতন তত্ত্ব যে প্রত্যেক বস্তু বা প্রাণীর মধ্যে সংস্থিত আছে তার স্বকীয় রূপ, এবং এই রূপ—যা জড় উপাদান ও অবয়বের সংশ্লেষ—প্রত্যেক বস্তু বা প্রাণীর নিজস্ব সত্তা। ললিতকলাশিল্পীর প্রধান উদ্দেশ্য ভিন্ন মাধ্যম বা উপাদানে* (medium) এই সত্তার স্বরূপ উপলব্ধি ও প্রকাশ। তিনি বস্তুর অবয়বকে নূতন আধারে সংস্থাপিত করেন, যদিও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে চারুশিল্পে যে অবয়বের প্রকাশ ঘটে তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ মাত্র, বস্তুর প্রকৃত অবয়ব নয়। উপাদানের এই প্রভেদের ফলে কবির বা চারুশিল্পীর অনুকরণ কখনই বস্তু বা প্রাণীর অবিকল অনুকৃতি হতে পারে না, অনুকরণ এক নূতন সৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয়। মাধ্যম বা উপাদানের উপর এই আলোক -নিক্ষেপ কাব্যতত্ত্বে আরিস্টটলের এক মৌলিক কীর্তি, এবং এখানে প্লেটোর মতবাদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য লক্ষণীয়। প্লেটোর মতে কাব্য বা ললিতকলা অলীক**—সত্যস্বরূপ নিত্য আদিরূপ থেকে তৃতীয় স্তরে এই শিল্পের অবরোহণ—কারণ কবি বা চিত্রশিল্পী অনিত্য ও অসত্য বাহ্য বস্তুসমূহের অনুকারী। প্লেটো 'অনুকরণ' শব্দটিকে 'প্রতিচ্ছায়া' (copy) ও 'অনুকৃতি' (mimicry) অর্থে প্রয়োগ করেছেন, উপাদানের প্রভেদের ফলে শিল্পকর্মে বস্তুর যে রূপান্তর ঘটে তা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। আদর্শরাষ্ট্র-সম্বন্ধীয় সংলাপ-গ্রন্থের ('প্রজাতন্ত্র') দশম প্রস্তাবে তিনি কবি, সূত্রধর, ও শয্যাধারের চিত্রকরের তুলনামূলক বিচার করেছেন। ঈশ্বর শয্যাধারের এক ও অদ্বিতীয় আদিরূপের স্রষ্টা (এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে একমাত্র এখানেই প্লেটো নির্মিত বস্তুর আদিরূপের কল্পনা করেছেন), এবং এই আদিরূপই নিত্য ও সত্য। সূত্রধর একটি বিশেষ শয্যাধারের নির্মাতা ; এই বিশেষ শয্যাধার সদ্‌বিম্ব (real) নয়, ঈশ্বরসৃষ্ট আদিরূপের প্রতিবিম্ব,† এবং সেই অর্থে অসত্য। চিত্রশিল্পী সূত্রধর নির্মিত শয্যাধারের অনুকারী। প্লেটো সূত্রধর নির্মিত শয্যাধারকে অসত্য মনে করলেও সূত্রধরকে নির্মাতার সম্মান দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর মতে চিত্রশিল্পী নির্মাতা নয়, সে কিছু সৃষ্টি করে না।†† কবি

---

* কাব্যের উপাদান শব্দ ও ছন্দ (নাটকের উপাদান শব্দ, ছন্দ ও সুর), সঙ্গীতের উপাদান সুর ও ছন্দ, নৃত্যের উপাদান ছন্দ, চিত্রকলার উপাদান রঙ, ভাস্কর্যের উপাদান ধাতু প্রস্তর।

** প্লেটো কারুশিল্পকে উচ্চতর মর্যাদা দিয়েছেন।

† প্লেটো কারুশিল্পীনির্মিত বস্তু ও প্রাকৃতিক পদার্থের মধ্যে পার্থক্য করেননি।

†† এই গ্রন্থের ষষ্ঠ প্রস্তাবে জ্ঞানের চতুস্তরবিশিষ্ট সোপানের কথা বলা হয়েছে। নিম্নতম স্তরে আছে বাহ্য বস্তুনিচয়ের বহিরাবয়ব ও তাদের সংবেদজ চিত্ররূপ (চিত্রশিল্প, কাব্য)। তৃতীয় স্তরে কঠিন অথচ

(প্লেটো এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে করুণরসাত্মক কাব্যের* রচয়িতার কথা বলেছেন) চিত্রশিল্পীর মতোই অনুকারী, এবং সত্যের স্তর থেকে দূরবর্তী তৃতীয় স্তরে কবির অবস্থান।** এখানে প্লেটো চিত্রিত শয্যাধারকে সূত্রধরনির্মিত শয্যাধারের অবিকল প্রতিকৃতি বিবেচনা করেছেন। অন্য উপাদানে, রঙের মাধ্যমে, শয্যাধারের অবয়ব সংস্থাপন করে চিত্রকর যে নূতন রূপের সৃষ্টি করেন তার কোন স্বীকৃতি প্লেটোর সংলাপে নেই। চিত্রশিল্প ও কাব্যের উপাদানের প্রভেদের কথাও তিনি উল্লেখ করেননি।

'প্রজাতন্ত্র' গ্রন্থের তৃতীয় প্রস্তাবে বর্ণনা ও অনুকরণের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে : কোন কবিতায় আছে ঘটনার বর্ণনা,কোন কবিতায় আছে সংঘটনের অনুকৃতি। ঘটনার অনুকৃতি অর্থে প্লেটো অবশ্যই ভেবেছেন নাটকের কথা, এবং নাট্যকার প্রাথমিক অর্থে অনুকারী হলেও অনুকরণের অব্যবহিত কারক নাটকের পাত্রপাত্রী, অথবা সেই অভিনেতৃবৃন্দ যারা পাত্রপাত্রীর চরিত্র রূপায়িত করছে। অভিনেতা একটি চরিত্র অনুকরণ করে মুখ্যত কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে, এবং এই অনুকরণ-প্রকরণে উপাদান বা মাধ্যম অভিন্ন। (অনুশাসন-সংক্রান্ত সংলাপ-গ্রন্থের সপ্তম প্রস্তাবে প্লেটো বলেছেন যে অভিনয় সংক্রামক এবং হাস্যরসাত্মক নাটকের চরিত্রাভিনয় বিপজ্জনক। যে ব্যক্তি জীবনে গুরু ভূমিকা নিতে চায় তার পক্ষে লঘু ভূমিকায় অংশগ্রহণ অকর্তব্য, এবং সেই কারণে ক্রীতদাস ও ভাড়াটে লোকদের দিয়ে হাস্যরসাত্মক নাটকের অভিনয় করানো উচিত।) অনুকরণ-প্রক্রিয়ায় আরিস্টটল্ জোর দিয়েছেন উপাদানের প্রভেদের উপর, যে প্রভেদ অনুকরণকে সৃষ্টির স্তরে উন্নীত করে, কিন্তু অনেকক্ষেত্রে তিনিও কাব্যসম্মত 'অনুকরণ' (যাকে 'অনুবর্তন' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে) ও 'অনুকৃতি' (mimicry, যেখানে

পরিবর্তনশীল বাহ্য বস্তুসমূহের (যেমন, শয্যাধার) প্রত্যক্ষ ও নির্ভরযোগ্য জ্ঞান। সোপানের দ্বিতীয় স্তর মননলোক, এবং এই স্তর দুই অংশে বিভাজ্য—গণিতশাস্ত্র ও বিশুদ্ধ নৈয়ায়িক মননক্রিয়া (প্লেটোর মতে এই মননক্রিয়া গণিত-বিজ্ঞানের চর্চা অপেক্ষা শুদ্ধতর, কারণ মননের লক্ষ্য পরম সত্য, এবং এই প্রক্রিয়ায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অঙ্কপাতন বা চিত্ররূপের প্রয়োগ নেই)। প্রথম বা সর্বোচ্চ স্তর আদিরূপের স্বজ্ঞা (intuition) ও প্রমাজ্ঞান।

* প্লেটোর অনুশাসন-সংক্রান্ত সংলাপ-গ্রন্থে অনুশাসন-প্রণেতার সঙ্গে করুণরসাত্মক নাটকের রচয়িতার তুলনা করা হয়েছে। এই তুলনা থেকে বোঝা যায় যে উপাদানের উপর প্লেটো কোন গুরুত্ব দেননি।

** ইংরেজ-সমালোচক ফিলিপ সিডনীর মতে কবি নিত্য আদিরূপের অনুকারী, প্রাকৃতিক পদার্থ বা মনুষ্যনির্মিত বস্তুর নয়, এবং এই অর্থে কাব্য সত্যস্বরূপকেই প্রকাশ করে। সিডনী নব্য প্লেটোপন্থীদের মতবাদ অনুসরণ করে প্লেটোর যুক্তি খণ্ডন করেছেন।

উপাদান অভিন্ন)—এই দুইয়ের মৌল পার্থক্য বিস্মৃত হয়েছেন। 'কাব্যকলা' পুস্তিকার তৃতীয় পরিচ্ছেদে কাব্যে তিন প্রকার অনুকরণের কথা বলা হয়েছে : কবি বর্ণনাত্মক রীতিতে রচনা করতে পারেন ও স্বয়ং আখ্যায়কের ভূমিকা নিতে পারেন, অথবা নাটকোচিত প্রক্রিয়ায় এমনভাবে ঘটনাকে উপস্থাপিত করতে পারেন যাতে বৃত্তান্তটি বিভিন্ন চরিত্রের কার্যকলাপের মাধ্যমে ঘটমানতা ও সজীবতা লাভ করে, অথবা কবির অনুকরণ হতে পারে বর্ণনা ও নাটকোচিত ক্রিয়ার মিশ্রণ।* এখানে বর্ণনা ও কবির কথনকেও অনুকরণের অন্যতম রীতি গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদে আরিস্টটল দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে কবি যখন স্বয়ং আখ্যায়কের ভূমিকা নেন তখন তিনি আর কবি বা অনুকারী থাকেন না। আরিস্টটলের দুই উক্তির মধ্যে বৈপরীত্য অনস্বীকার্য, এবং এটাও স্পষ্ট যে নাটকোচিত ক্রিয়াকেই তিনি প্রকৃষ্ট অনুকরণ মনে করেছেন—হোমারের শ্রেষ্ঠত্ব এই যে তিনি বর্ণনাত্মক মহাকাব্য লিখলেও তাঁর রচনায় নাটকোচিত গুণ বর্তমান।

এই প্রশ্ন আর একটি জটিলতর প্রশ্নের দিকে আমাদের নিয়ে যায় : নাট্যক্রিয়ার আদি কারণ কি ? অন্যভাবে প্রশ্নটি উত্থাপন করা যেতে পারে : নাটকে রূপায়িত আখ্যানের অনুকারী কি নাট্যকার, না নাটকের পাত্রপাত্রী ? রঙ্গমঞ্চে অভিনয় যদি নাটকের প্রধান ধর্ম হয় তবে প্রকৃত অনুকারী কে ? পাত্রপাত্রী ? নট-নটী বা অভিনেতৃবৃন্দ ? অভিনেতৃবৃন্দ অনুকারী হলে 'অনুকরণ' প্রায় 'অনুকৃতি'তে (mimicry) পরিণত হয়, এবং নাটকের পাত্রপাত্রীকে অনুকারী বলা হলেও 'অনুকরণ' বহুলাংশে 'অনুকৃতি'র স্তরে থেকে যায়। আরিস্টট্‌ল এই ত্রিবিধ অনুকারীর প্রকারভেদ নিয়ে বিশদ বিশ্লেষণ করেননি, কিন্তু এই প্রকারভেদের ইঙ্গিত তাঁর আলোচনায় আছে। প্রথম পরিচ্ছেদে কণ্ঠস্বরকে অন্যতম উপাদানরূপে অভিহিত করা হয়েছে। সপ্তদশ পরিচ্ছেদে আরিস্টট্‌ল বলেছেন যে সংলাপের সাহায্যে আখ্যানটি রূপায়িত করার সময় নাট্যকার ঘটনার সমগ্র রূপ মানসলোকে প্রত্যক্ষ করবেন, এবং (দর্শকের উপস্থিতি কল্পনা করে) স্বয়ং নাটকটির প্রত্যেকটি চরিত্র যথোচিত অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে অভিনয় করবেন। করুণরসাত্মক নাটকের অন্যতম প্রত্যঙ্গ দৃশ্যমানতা (মঞ্চসজ্জা, অথবা অভিনেতৃদের রূপসজ্জা ?)। আরিস্টট্‌ল বলেছেন (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ) যে কাব্যনির্মাণ প্রক্রিয়ায় দৃশ্যপট বা রূপসজ্জার স্থান গৌণ এবং দর্শকসাধারণের সমক্ষে অভিনয় ছাড়াও রসসৃষ্টি সম্ভব (বিশেষভাবে করুণরসের কথা এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে), কিন্তু তিনি পূর্বাপর

* প্লেটোর রচনাতেও—'প্রজাতন্ত্র' গ্রন্থের তৃতীয় প্রস্তাবে—এই ত্রিবিধ রীতির উল্লেখ আছে। প্লেটো এই প্রসঙ্গে একমাত্র নাট্যক্রিয়াকেই 'অনুকরণ' আখ্যা দিয়েছেন।

জোর দিয়েছেন নাট্যক্রিয়ার ঘটমানতা বা দৃশ্যমানতার উপর। লেখকের ও পাঠকের মানসলোকে নাটকের ঘটনা ও চরিত্র প্রত্যক্ষভাবে রূপায়িত হবে, এবং ঘটনাকে প্রত্যক্ষীভূত করা কবির নির্মাণক্ষমতার পরিচায়ক। আরিস্টট্‌ল স্পষ্টভাবে বলেছেন যে নাট্যরসসৃষ্টিতে অভিনেতার ভূমিকা অপ্রধান (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ), কিন্তু লেখক ও পাঠককে কি তিনি অভিনেতার ভূমিকায় কল্পনা করেননি? কবি বা নাট্যকার জীবনের অনুকারী—তাঁর কাজ জীবনের স্বরূপকে নূতন আধার বা উপাদানে সংস্থাপিত করা,—কিন্তু নাট্যনির্মাণক্রিয়ায় তিনি চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তোলেন প্রকৃত বা কল্পিত অভিনয়ের মাধ্যমে, এবং এই শেষোক্ত অনুকরণ 'অনুকৃতি'র স্তরভুক্ত। নাট্যনির্মাণ প্রকরণে অপর এক প্রকার অনুকরণের কথা আরিস্টট্‌ল বলেছেন ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে: নাটক একটি ক্রিয়া বা কর্মবৃত্তির অনুকরণ, এবং নাটকের পাত্রপাত্রী সেই ক্রিয়াকে রূপায়িত করে; নির্মাণপ্রক্রিয়া থেকে স্বতন্ত্র এই রূপায়ণও 'অনুকরণ'। পাত্রপাত্রী নাট্যবৃত্তান্তকে রূপায়িত করে প্রধানতঃ কথা ও অঙ্গভঙ্গীর মাধ্যমে, এবং এই রূপায়ণ অনেকাংশে 'অনুকৃতি'র সমগোত্রীয়। কাব্যনির্মাণ অনুকৃতি নয়, অনুবর্তন। কিন্তু প্রত্যক্ষতা কাব্যের প্রধান গুণ, এবং প্রত্যক্ষতার সঙ্গে দৃশ্যমানতা বা অভিনয় (মঞ্চে অথবা কবি ও পাঠকের মানসলোকে) অবিচ্ছেদ্য। এই কারণে কাব্য—বিশেষভাবে নাট্যকাব্য—কখনই সম্পূর্ণভাবে অনুকৃতির স্তর ছাড়িয়ে উঠতে পারে না। 'অনুকৃতি' জীবনের সঙ্গে কাব্যের গভীর সংসক্তির প্রমাণ, এবং আরিস্টট্‌ল কাব্যের স্বতন্ত্র ধর্মের উপর আলোকপাত করলেও এ কথা কখনই বিস্মৃত হননি যে জীবন ও কাব্য নিত্য সম্বন্ধ-বিশিষ্ট।

৪.

আরিস্টটলের মতে সংবেদন (sensation) বা সংবেদজ চিত্র (sensory image) মননের (intellection) ভিত্তি ('মনোবিদ্যা' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)—প্লেটোর অতীন্দ্রিয়বাদী চিন্তার সঙ্গে তাঁর প্রখ্যাত শিষ্যের প্রয়োগবাদী দর্শনের এটি এক মৌলিক পার্থক্য—কিন্তু আরিস্টটল কল্পনাশক্তি ও সংবেদনের মধ্যে প্রভেদের স্পষ্ট রেখা টেনেছেন। কল্পনাশক্তির সঙ্গে সংবেদনের (ও মননের) যোগ আছে, কিন্তু কল্পনার ভিত্তি শিথিল, সত্য-মিথ্যার বৈপরীত্য দ্বারা শাসিত নয়। সংবেদন বস্তুনিষ্ঠ, কিন্তু কল্পনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অলীক, ইচ্ছাপূরণ ও কল্পনা প্রায়শই সমাসক্ত। কবির অবাধ কল্পনা ও অনিয়ন্ত্রিত উদ্ভাবন আরিস্টটলের কাব্যতত্ত্বে পরিবর্জিত,* এবং 'অনুকরণ' শব্দটিকে

* ইউরিপিডিস রচিত 'মিডিয়া' নাটকের শেষে সূর্যের রথে মিডিয়ার অন্তর্ধান চরিত্রসম্ভূত ঘটনা নয়,

তিনি ব্যবহার করেছেন 'কল্পনা'র বিপরীতার্থক বিকল্প রূপে। কাব্য বাস্তবানুগ—আরিস্টট্‌লের মতে ললিতকলার অনুকার্য বিষয় মনুষ্যক্রিয়া,—কিন্তু 'অনুকরণ' কি শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ বা দৃশ্যমান প্রতিরূপ? প্লেটো 'অনুকরণ' শব্দটিকে দুই অর্থে প্রয়োগ করেছেন, অনুকৃতি ও প্রতিচ্ছায়া, এবং তাঁর বিভিন্ন উপমান দৃশ্যমানঃ গুহাপ্রাচীরে প্রতিফলিত ছায়া, জলে, দর্পণে, মসৃণ, চিক্কণ ভূপৃষ্ঠে প্রতিবিম্বিত ছায়া। আরিস্টট্‌ল প্রত্যক্ষতা ও সাদৃশ্যধর্মী প্রতিকৃতির উপর জোর দিয়েছেন, কিন্তু অনুকরণ ও দৃশ্যমান প্রতিরূপ তাঁর মতে সমার্থক নয়ঃ অবাধ উদ্ভাবন ও অবিকল অনুকৃতি এই দুই প্রান্তীয় পন্থাকেই তিনি বর্জন করেছেন। কিন্তু আরিস্টট্‌ল এই দুইয়ের মধ্যে কি কোন অনড় সীমারেখা টানতে পেরেছেন? তাঁর কাব্যতত্ত্বে কি আমরা কোন সুস্পষ্ট মধ্যকের নির্দেশ পাই?

অনুকরণ-প্রক্রিয়াকে আরিস্টট্‌ল অবিকল প্রতিবিম্বন থেকে উর্ধ্বতর স্তরে নিয়ে গেছেন, কিন্তু অনুকরণ ও মূল বস্তুর সমরূপতার কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। 'কাব্যকলা' গ্রন্থের পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে তিনি ত্রিবিধ অনুকরণের কথা বলেছেন। বাস্তবের যথাযথ উপস্থাপন এই ত্রিবিধ অনুকরণের অন্যতম, এবং এই একই পরিচ্ছেদে তিনি কবিকে চিত্রকর ও অনুরূপ আলেখ্য-নির্মাতার সঙ্গে তুলিত করেছেন। চতুর্থ পরিচ্ছেদে তিনি বলেছেন যে বাস্তব অভিজ্ঞতায় যা কিছু বেদনা ও অসুখকর অনুভূতির উদ্রেক করে—যেমন শব ও মনুষ্যেতর অবর প্রাণী—তাদের অবিকল চিত্ররূপ আনন্দদায়ক (আরিস্টট্‌লের মতে অনুকরণে আনন্দলাভ মানুষের সহজাত চিত্তবৃত্তি)। সপ্তদশ পরিচ্ছেদে কাব্যে প্রত্যক্ষতার আলোচনা প্রসঙ্গে আরিস্টট্‌ল একটি নাটকের এক দৃশ্যের অসংগতির উল্লেখ করেছেন (নাটকটি লুপ্ত): একটি চরিত্র মন্দির থেকে বেরিয়ে আসছে, কিন্তু ইতিপূর্বে সে মন্দিরে প্রবেশ করেনি। পূর্বাপরতার এই অভাব দৃশ্যটিকে অবাস্তব করে তুলেছে এবং রসসৃষ্টির প্রতিকূল হয়েছে। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে করুণরসাত্মক নাটকের চরিত্রচিত্রণে চতুর্বিধ গুণের সমন্বয় সাধনের কথা বলা হয়েছেঃ উত্তম প্রবৃত্তি, ঔচিত্য বা সংগতি (স্ত্রীলোকের পুরুষোচিত

এই দৃশ্যে শুধু যান্ত্রিক কলাকৌশলের পরিচয় আছে। এই ধরনের উদ্ভাবন আরিস্টট্‌ল অনুমোদন করেননি (পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। নাট্যকারের সৃজনীশক্তির পরিচয় আখ্যানভাগ নির্মাণে, বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে পারম্পর্যের সেতুবন্ধনে। হাস্যরসাত্মক নাটকে আখ্যানভাগ কল্পিত, এবং করুণরসাত্মক নাটকে সাধারণত পুরাকাহিনী বা ঐতিহাসিক কাহিনী আখ্যানের ভিত্তি। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই কবি নির্মাতা ও স্রষ্টা। নাটকের কাহিনী বাস্তব ঘটনা বা ইতিহাস থেকে আহৃত হলেও কবি তাঁর সৃজনীক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেন দৃঢ়বদ্ধ, সংহত আখ্যায়িকা রূপায়ণ বা নির্মাণের মধ্য দিয়ে (নবম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

শৌর্য বা প্রাখর্য অসংগত), সাদৃশ্য (বাইওয়াটার পাদপূরণ করে লিখেছেন, বাস্তব-সদৃশতা), পৌর্বাপর্য। এই গুণাবলীর প্রকৃত অর্থ নিয়ে মতান্তর আছে, কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে সাদৃশ্য ও ঔচিত্য বাস্তবজীবন ও অভিজ্ঞতাসম্ভূত।

এইসব মন্তব্যে অনুকরণ-প্রক্রিয়ার যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তা অনেকাংশে বহিরঙ্গমূলক, এবং আরিস্টট্‌লের মনীষার শ্রেষ্ঠত্ব এই যে অনুকার্য বিষয়ের আলোচনায় তিনি মানবজীবনের বাহ্যপ্রকৃতি থেকে গভীরতর স্তরে, অন্তর প্রকৃতিতে পৌঁছেছেন। কবি যা অনুকরণ করেন তা সংবেদজ বহিরাবরণ নয়—যদিও বাহ্যরূপ ও কাব্যের আধারে বিধৃত রূপের সদৃশতা বাঞ্ছনীয়। কবির অনুকার্য মানুষের অন্তর্লোক—মানুষের চরিত্র, অনুভূতি, ও ক্রিয়া (প্রথম পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)। আরিস্টট্‌ল বাহ্যরূপের অবিকল প্রতিকৃতি নিম্নস্তরের অনুকরণ বলে মনে করতেন, এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থে তিনি বলেছেন যে অবিকল প্রতিকৃতিতে আমরা যে আনন্দ ও বেদনা অনুভব করি মূলবস্তুও আমাদের মনে সেই একই অনুভূতির সঞ্চার করে : তাঁর বক্তব্যের ব্যঞ্জনা এই যে প্রাকৃতিক বস্তুর অবিকল প্রতিরূপ অবান্তর। অনুকরণ-ক্রিয়াকে আরিস্টট্‌ল যে গভীর তাৎপর্য দিয়েছেন তার পরিচয় পাওয়া যায় পূর্বোল্লিখিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থে সংগীত-সংক্রান্ত আলোচনায়। সংগীত, আরিস্টট্‌লের মতে, সর্বাধিক অনুকারী শিল্প,* যদিও বহিরাবরণের প্রত্যক্ষ অনুকরণ সংগীতে সম্ভব নয়। ছন্দ ও সুর গতিসূচক এবং গতিক্রিয়া নৈতিক চরিত্র প্রতিফলিত করে : আলেখ্য বা প্রতিকৃতি নির্মাণ থেকে অন্তঃস্থ নৈতিক বৃত্তির প্রতিফলন—অর্থের এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আরিস্টট্‌ল 'অনুকরণ' শব্দটিকে নূতন ব্যঞ্জনা দিয়েছেন। 'কাব্যকলা' গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে ললিতকলাকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে—একদিকে চিত্রকলা ও ভাস্কর্য, আর একদিকে কাব্য, সংগীত, ও নৃত্য। উপাদানের প্রভেদের জন্য এই দুই শ্রেণীর স্বকীয় ধর্ম ভিন্ন : চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের ধর্ম স্থানিক বিস্তার (spatial extension); কাব্য, সংগীত, ও নৃত্যের ধর্ম গতি বা প্রবহমানতা।** সংগীত যা প্রতিফলিত করে বা অনুকরণ করে তা মানুষের আন্তর অনুভূতি এবং এই অনুভূতির সংহত গতির সঙ্গে প্রাকৃতিক জগতের নিয়মাধীন গতির সামঞ্জস্য আছে। অনুকরণের অর্থ যদি প্রত্যক্ষ প্রতিকৃতি নির্মাণ হয় তবে তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন ভাস্কর্য ও চিত্রকলা, এবং

* সম্ভবতঃ 'সর্বাধিক' বলতে আরিস্টট্‌ল 'প্রকৃষ্ট' বুঝেছেন।

** কাব্য, সংগীত, ও নৃত্য—এই তিনটি শিল্পেরই সাধারণ উপাদান ছন্দ। নাটকে স্থানিক প্রত্যক্ষতার কথা আরিস্টট্‌ল উল্লেখ করেছেন ; কিন্তু নাটকের প্রধান ধর্ম গতি ও ঘটনার পারম্পর্যের প্রতিফলন, স্থানিক প্রত্যক্ষতার স্থান গৌণ।

অনুকরণের অর্থ যদি আন্তর অনুভূতি ও ক্রিয়ার প্রকাশ হয় তবে তার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত সংগীত। এই দুই শ্রেণী শিল্পের দুই প্রান্তীয় মেরুতে অধিষ্ঠিত, এবং কাব্য—বিশেষভাবে করুণরসাত্মক নাটক—এই দুই ভিন্নধর্মী শিল্পের সমন্বয়। কাব্যে আছে বাস্তবসদৃশতা, চলমানতা, ও নৈতিক প্রবৃত্তির প্রতিফলন ; এবং যদিও আরিস্টট্‌ল রাষ্ট্র-বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থে সংগীতকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন, তথাপি একথা বললে বোধহয় ভুল হবে না যে 'কাব্যকলা' গ্রন্থে তিনি করুণরসাত্মক নাটকের শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্পূর্ণতা স্বীকার করেছেন।

ললিতকলায় অনুকরণ-প্রক্রিয়ার আরিস্টট্‌লসম্মত ব্যাখ্যা এই যে বস্তুর অবয়ব ভিন্ন উপাদানে বিধৃত হয়ে নূতন রূপ পরিগ্রহ করে। এই অবয়ব কি বস্তুর বহিরঙ্গ, অথবা আন্তর রূপ বা স্বরূপ ? চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের বিশেষ ধর্ম বহিরাবয়ব চিত্রণ (আরিস্টট্‌লের মতে—রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য—এই দুই শিল্প গতিহীন, এবং মানুষের আবেগ ও নৈতিক প্রবৃত্তি প্রতিফলনে সাধারণত অক্ষম)। সংগীতের স্বকীয় ধর্ম আন্তর প্রকৃতির প্রকাশ। বহিরাবয়বের বন্ধন থেকে সংগীত মুক্ত—এই অর্থে ভাস্কর্য ও চিত্রকলার সঙ্গে বস্তুলোকের বন্ধন দৃঢ়তর,—কিন্তু সংগীত অনপেক্ষিত স্বয়ম্ভর শিল্প নয়, কারণ জীবনের আন্তর সত্যকে সে প্রকাশ করছে। কথা, সুর ও ছন্দের মাধ্যমে করুণরসাত্মক নাটক জীবনের বাইরের রূপ ও অন্তঃপ্রকৃতি (অনুভূতি ও নৈতিক প্রবৃত্তি) দুইই প্রকাশ করে। অবয়ব—বহিরঙ্গ ও আন্তর প্রকৃতি—জীবন থেকে সমাহৃত, এবং এখানেই বাস্তব জীবনের সঙ্গে কাব্যের বন্ধন। কিন্তু কাব্যের উপাদান মনুষ্যদেহের উপাদান থেকে ভিন্ন, এখানেই কাব্যের মুক্তি ও স্বাতন্ত্র্য। তাই কাব্যের সত্য সামগ্রিকভাবে লৌকিক সত্য নয়, কিন্তু কাব্যের সত্যকে লোকাতীত সত্যও বলা যাবে না। কাব্যলোকের স্বকীয় ধর্ম আছে, কিন্তু কাব্য জীবনের গভীর সত্যকে প্রকাশ করে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে অনুকরণ বা কাব্যনির্মাণ ক্রিয়ায় আরিস্টট্‌লের সূত্র ও নির্দেশা-বলীর আলোচনা করা প্রয়োজন। কাব্যের ধর্ম ভিন্ন উপাদানে মানবজীবনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন, এবং এই কারণে কবির লক্ষ্য—এখানেই কাব্যের সঙ্গে ইতিবৃত্তের পার্থক্য—কোন বিশেষ ব্যক্তির চরিত্রের উপস্থাপন নয়, কোন বিশেষ চরিত্রের মাধ্যমে সামান্য সত্যের প্রকাশ। কাব্য কোন দার্শনিক তত্ত্ব প্রকাশ করে না, এবং কাব্যের লক্ষ্য ব্যক্তি-সত্তাবর্জিত জাতিরূপ (type) সৃষ্টি নয় : সামান্য সত্যের অর্থ সাধারণ সত্য নয় যা একাধিক বিষয় বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিধেয় হতে পারে। আরিস্টট্‌ল-নির্দেশিত সূত্র অনুযায়ী কাব্যের সামান্য সত্যের অর্থ অবশ্যম্ভাবিতা (necessity) বা সম্ভাব্যতা

(probability) [নবম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]। ইতিহাসের বিবরণে আকস্মিক ঘটনার সন্নিবেশের ফলে কার্যকারণসম্বন্ধ পরিস্ফুট হয় না। কাব্যে, বিশেষভাবে করুণরসাত্মক নাটকে, আমরা উপলব্ধি করি পরিণতির অনিবার্যতা, চরিত্র ও ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক, ঘটনার গতি ও পরিণতির উপর চরিত্রের* নিয়ামক প্রভাব। কাব্যে উপস্থাপিত কোন ব্যক্তির** কথা ও কাজের সঙ্গে তার চরিত্রের সম্বন্ধ সম্ভাব্য অথবা অবশ্যম্ভাবী হবে ; এবং এই নিয়মবদ্ধতাই সামান্য সত্য।† সম্ভাব্যতাকে অবশ্যম্ভাবিতার বিকল্পরূপে ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ মানুষের মনের প্রতিক্রিয়া প্রকৃতির নিয়মের মতো সম ও অভিন্ন নয় : এই বিকল্পের তাৎপর্য এই যে এক বিশেষ শ্রেণীর ও চরিত্রের লোকের এক বিশেষ পরিস্থিতিতে যে প্রতিক্রিয়া হয়, সেই শ্রেণীভূত ও চরিত্রসম্পন্ন অধিকাংশ লোকেরই অনুরূপ পরিস্থিতিতে অনুরূপ প্রতিক্রিয়া হবে। বাস্তব ঘটনার অনুকরণ নয়, অবশ্যম্ভাবী বা সম্ভাব্য†† ঘটনার অনুকরণই কবির কাজ, এবং এখানে বাস্তব সত্য ও কাব্যসত্যের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। সফোক্লিসের 'রাজা ইডিপাস' নাটকে করিন্থ্‌ রাজ্যের দূতের প্রবেশ আপতিক ঘটনা : ইডিপাসের নির্দেশে সে আসে নি এবং ইডিপাসের চরিত্রের সঙ্গে তার আগমনের কোন কারণিক সম্পর্ক নেই। কিন্তু এই জাতীয় ঘটনা জীবনে ঘটে, এবং এখানেই সম্ভাবনা ও কাব্যোচিত সম্ভাব্যতার পার্থক্য। আরিস্টট্‌ল আর এক অর্থে 'সম্ভাব্যতা' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন—কাব্যের বিশেষ অনুষঙ্গে প্রতীতিবোধের উৎপাদন (ষোড়শ ও অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

---

* আরিস্টট্‌ল 'চরিত্র' অর্থে বুঝেছেন নৈতিক বৃত্তি ও প্রবণতা যা ক্রিয়ায় রূপায়িত হয়।

** আরিস্টট্‌ল 'কোন বিশেষ শ্রেণীর ব্যক্তি'র উল্লেখ করেছেন, এবং এই বাক্যাংশটি থেকেই অনেক সমালোচক—কবি-সমালোচক কোলরিজ এঁদের অন্যতম—'সামান্য' অর্থে জাতিরূপের কথা বলেছেন।

† কার্যকারণসম্বন্ধ ও নিয়মবদ্ধতা আখ্যানের ঘটনা ও ঘটনার পারম্পর্য নিয়ন্ত্রিত করবে, কিন্তু কারণতার সঙ্গে অপ্রত্যাশিত ঘটনার সংযোগ না হলে চমৎকারিতা সৃষ্টি হয় না, এবং চমৎকারী ঘটনায় আনন্দলাভ মানুষের সাহজিক প্রবৃত্তি। কাব্যলোকে নিয়মবদ্ধতার উপর আরিস্টট্‌ল জোর দিয়েছেন, কিন্তু তিনি যান্ত্রিক ভবিতব্যতায় বিশ্বাসী নন। মিশ্র আখ্যানে ঘটনার পারম্পর্য বিস্ময়বোধক—এই চেতনা আমাদের অভিভূত করে যে মানুষ যে উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে কার্যের পরিণতি সেই উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত হতে পারে। কিন্তু সার্থক করুণরসাত্মক নাটকে—সফোক্লিসের 'রাজা ইডিপাস' এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত—ঘটনাবলীর বিন্যাস এমনভাবে করা হয় যে অপ্রত্যাশিত পরিণতিও কারণতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় (নবম, দশম ও একাদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

†† সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের সমালোচকেরা সম্ভাব্যতাকে নৈতিক ঔচিত্যের অর্থে প্রয়োগ করেছেন। তাঁদের মতে কাব্যে উপস্থাপিত হবে নীতিসম্মত পরিণতি : সাধু পুরস্কৃত হবে এবং অসাধু ব্যক্তি দণ্ডিত হবে।

জীবনে যা ঘটে না কাব্যে তার স্থান হতে পারে, যদি কবি পাঠকের মনে প্রতীতি উৎপাদন করতে সক্ষম হন। সম্ভব অসম্ভাব্যতা অপেক্ষা কাব্যে অসম্ভব সম্ভাব্যতা শ্রেয়ঃ (চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ), এবং কাব্যে সত্য-অসত্যের বিচার বাস্তব অভিজ্ঞতার মাপকাঠিতে হবে না। কোন চিত্রকর শৃঙ্গহীনা হরিণীর ছবি আঁকলে সে ত্রুটি বা অজ্ঞতা ক্ষমার্হ, কিন্তু তিনি যদি এমন প্রতিকৃতি আঁকেন যাতে হরিণীর স্বকীয় রূপ অপরিস্ফুট তবে তা অনেক বেশী দূষনীয় (পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ)। অপ্রয়োজনে বাস্তব সত্য থেকে ব্যত্যয় বাঞ্ছনীয় নয়, কিন্তু কাব্যসত্যের প্রয়োজনে বাস্তব সত্যকে উপেক্ষা করা যেতে পারে। আরিস্টট্লের এইসব মন্তব্যে স্পষ্ট স্বীকৃতি আছে যে জীবনসত্য ও কাব্যসত্য অভেদ নয়, অথচ কাব্য জীবনকে অনুসরণ করে এবং জীবনের স্বরূপকে রূপায়িত করে। এখানে হরিণীর আলেখ্য সম্পর্কে আরিস্টট্লের বক্তব্য স্মর্তব্য : হরিণীর প্রতিকৃতিতে হরিণীর স্বকীয় রূপ প্রকাশিত হবে ; কিন্তু এই রূপায়ণের অর্থ অনুকৃতি নয়, শৃঙ্গহীনা হরিণীও সার্থক শিল্প হতে পারে। কবির প্রধান লক্ষ্য শিল্পসম্মত অবয়ব নির্মাণ, যা জীবন্ত প্রাণীর সঙ্গে তুলনীয়, যে অবয়বে প্রত্যেকটি অংশ বা প্রত্যঙ্গ আবশ্যিক ও সমগ্রের সঙ্গে সংসক্ত, যে অবয়বের গঠন-বিন্যাসে বিভিন্ন অংশের সম্বন্ধ ও পারম্পর্য কঠিন নিয়মশৃঙ্খলায় আবদ্ধ। কিন্তু এই সংহত, সুষম অবয়ব নির্মাণের মধ্য দিয়ে কবি জীবনের গভীরতম সত্যকেও প্রকাশ করেন।

৫.

ললিতকলায় ভিন্ন উপাদানে জীবনের স্বরূপ বিধৃত হয়, এবং উপাদানের এই পার্থক্যের জন্য জীবন ও কাব্যের মধ্যে অনতিক্রমণীয় ব্যবধান। জীবন ও কাব্যের এই বিশেষ সম্পর্ক—এই সারূপ্য ও প্রভেদ, নিকটত্ব ও দূরত্ব—আর একটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করে : বাস্তব জীবনের অনুভব ও কাব্যসঞ্জাত অনুভব কি অভেদ না স্বতন্ত্র ? দুঃখকর ঘটনা যে কাব্যে আনন্দদায়ক হতে পারে সেকথা প্লেটো স্বীকার করেছেন ('প্রজাতন্ত্র' গ্রন্থের দশম প্রস্তাব), কিন্তু সাধারণভাবে প্লেটোর কাব্যতত্ত্বে জীবন ও কাব্য, লৌকিক অনুভূতি ও কাব্যিক অনুভূতির মধ্যে পার্থক্য স্বীকৃত হয়নি। প্লেটোর মতে সত্যে উত্তরণের একমাত্র পথ বিশুদ্ধ মনন, আবেগ ও চিত্তপ্রক্ষোভ সত্যানুসরণের প্রতিবন্ধী। কিন্তু কাব্য পাঠকের মনে ভাবাবেগ ও কামনা উদ্রিক্ত করে, এই অশুভ ফসলে জলসিঞ্চন করে তার বিকাশ ও বিবর্ধনে সহায়তা করে ('প্রজাতন্ত্র' গ্রন্থের দশম প্রস্তাব) : প্লেটো বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যৌন আকাঙ্ক্ষা, ক্রোধ, সর্ববিধ বাসনা, দুঃখ ও সুখের অনুভূতি। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর সমালোচকেরাও—যাঁরা

সুনীতিসম্মত কাব্যের পক্ষে রায় দিয়েছেন—লৌকিক অনুভব ও কাব্যিক অনুভবের মধ্যে পার্থক্য করেননি।* তাঁদের মতে কাব্য ভালো ও মন্দ, শুভ ও অশুভের স্বরূপ ও পরিণতি সম্পর্কে আমাদের চেতনা জাগরিত করে, এবং এই জ্ঞান যথাযথ বা নীতি-সম্মত কার্য সম্পাদনে প্রেরণা দেয়। সুতরাং কাব্যের ফল সৌন্দর্যের বিশুদ্ধ আস্বাদন বা নিরাসক্ত উপলব্ধি নয়; কাব্যের আশু ফল জ্ঞানলাভ, যে জ্ঞান পাঠক বা দর্শককে নীতিসম্মত কার্যে প্রণোদিত করে। কাব্যতত্ত্বের এই মৌলিক প্রশ্নে আরিস্টট্‌লের বক্তব্য কি?

করুণরসাত্মক নাটকের ফল আনন্দ, এবং এখানেই জীবন ও কাব্যের বৈপরীত্য। জীবনে যা দুঃখকর ও ক্লেশকর (ভাষণ-রচনাসংক্রান্ত গ্রন্থে আরিস্টট্‌ল বলেছেন যে শঙ্কা ও অনুকম্পা ক্লেশকর অনুভূতি) কাব্যে তা আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে; এর তাৎপর্য এই যে কাব্যিক ও লৌকিক অনুভব অভেদ নয়। প্রত্যেক চারুশিল্পের স্বতন্ত্র আনন্দ বা আস্বাদনের কথা আরিস্টট্‌ল উল্লেখ করেছেন, এবং এই স্বতন্ত্রতা উপাদান-উপকরণ, অবয়ব, ও চূড়ান্ত লক্ষ্যের পার্থক্য থেকে উদ্ভূত। হাস্যোদ্দীপক নাটকের চরিত্র আপেক্ষিকভাবে অধম এবং এই জাতীয় নাটকের চূড়ান্ত কারণ হাস্যোদ্দীপক আখ্যান নির্মাণ। করুণরসাত্মক নাটক ও মহাকাব্যের মধ্যে সমবায়ী ও অবয়বী কারণের পার্থক্য। মহাকাব্যের উপাদানে গীত ও মঞ্চসজ্জা (বা অভিনেতাদের রূপসজ্জা) নেই এবং এই জাতীয় কাব্য আগাগোড়া ষট্‌মাত্রিক দীর্ঘ ছন্দে রচিত। মহাকাব্য সাধারণত বর্ণনাত্মক এবং এর আয়তন নাটকের আয়তন অপেক্ষা দীর্ঘ। আরিস্টট্‌ল মহাকাব্যের বিশেষ আস্বাদন বিশ্লেষণ করেননি, কিন্তু ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে তিনি বলেছেন যে রূপায়িত আখ্যানের পূর্ণাঙ্গ, সুঠাম গঠন ও সংহতি থেকেই মহাকাব্যের বিশেষ আস্বাদনের উদ্ভব।** 'কাব্যকলা' গ্রন্থে করুণরসাত্মক নাটকের আস্বাদনের বিস্তৃততর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়: চতুর্দশ পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে যে অনুকরণের মাধ্যমে অনুকম্পা ও শঙ্কা উৎপাদনের দ্বারা এই বিশেষ আনন্দ সৃষ্টি হয়। এই দুটি মন্তব্য থেকে মনে হয় যে চারুকলা বা কাব্য যে আনন্দ উদ্রেক করে তা প্রধানত অবয়বগত। প্রত্যেক শিল্পের (অর্থাৎ চারুশিল্পের) নিজস্ব ধর্ম ও অবয়ব আছে, এবং এই বিশিষ্ট ধর্ম ও অবয়ব বিশেষ আনন্দ বা আস্বাদন সৃষ্টি করে। জীবনের সঙ্গে এই অবয়বের মিল

* আধুনিককালে প্রখ্যাত সমালোচক আই. এ. রিচার্ডস লৌকিক অনুভূতি ও কাব্যিক অনুভূতির পার্থক্য স্বীকার করেননি।

** এখানে মনে রাখা দরকার যে মহাকাব্যের ছন্দ, আয়তন, ও বর্ণনাত্মক রীতি মহাকাব্যের গঠন বা অবয়বকে নিয়ন্ত্রিত করে।

আছে, কিন্তু উপাদানের ভিন্নতার জন্য এর স্বরূপ স্বতন্ত্র। আস্বাদনের বিশেষত্ব সম্পর্কে আরিস্টটলের এইসব উক্তির মধ্যে এই ইঙ্গিত আছে যে কাব্যের অনুভূতি ও লৌকিক অনুভূতি সমধর্মী নয়। কিন্তু আরিস্টট্‌লের অন্যান্য মন্তব্যে কাব্য ও জীবনের দূরত্ব অপেক্ষা নিকটত্বের উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। করুণরসাত্মক নাটক অনুকম্পা ও শঙ্কা উদ্রেক করে, এবং এই অনুকম্পা ও শঙ্কা বাস্তব জীবনে অনুভূত অনুকম্পা ও শঙ্কার অনুরূপ। চতুর্থ পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে যে অনুকরণ থেকে আমরা যে আনন্দ লাভ করি তার অন্যতম কারণ প্রত্যভিজ্ঞা (recognition), এবং এই আনন্দ মনন-গত (intellectual)। অনুকরণের মধ্য দিয়ে আমরা পরিচিত প্রাণী বা ব্যক্তিকে নূতনভাবে প্রত্যক্ষ করি ; আমরা এই জ্ঞান লাভ করি যে একটি বিশেষ ব্যক্তি বা প্রাণী এক বিশেষ প্রজাতি ও গণের অন্তর্ভুক্ত, এবং এইভাবে আমাদের জীবনবোধ সামান্য অনুমান (inference) বা প্রকৃত জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হয়। অন্যান্য পরিচ্ছেদে এই ইঙ্গিত আছে যে কাব্য আমাদের জীবনচেতনা তীক্ষ্ণতর করে, আমরা উপলব্ধি করি মানুষ কেন ও কিভাবে কাজ করে। এইসব মন্তব্যে লৌকিক ও কাব্যিক অনুভবকে সমগোত্রীয় বিবেচনা করা হয়েছে। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে কাব্যলোকের স্বরূপ সম্পর্কে যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় আছে, আরিস্টট্‌লের রচনায় তার অভাব অনস্বীকার্য। কিন্তু সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে কাব্য ও জীবনের মধ্যে সম্পর্ক ক্ষীণ : কাব্যের সত্য অলৌকিক, এবং যদিও লৌকিক সত্য কাব্যের ভিত্তি—প্রদীপশিখা যেমন আলোকের ভিত্তি—তবু এক স্বতন্ত্র, উর্ধ্বতন লোকে কাব্যসত্যের অধিষ্ঠান। কাব্যলোকের স্বাতন্ত্র্য আরিস্টট্‌ল অস্বীকার করেননি, কিন্তু তাঁর কাব্যতত্ত্বে কাব্য ও জীবনের মধ্যে সম্পর্ক নিকট ও ঘনিষ্ঠ।

মার্কস্‌বাদের সাহিত্যদৃষ্টি

গোপাল হালদার

'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং'—রসাত্মক বাক্যই কাব্য—কথাটা আমাদের সুপরিচিত। এক সময়ে যাকে 'কাব্য' বলা হত আমরা একালে তাকেই বলি 'সাহিত্য'। তখন কাব্য পদ্যেও লেখা হত গদ্যেও লেখা হত; সাহিত্যও তাই হয়। গদ্য, না পদ্য, এ প্রশ্ন প্রায় অবান্তর। এহ বাহ্য। আসল কথাটা হল রস। বাক্যই যে সাহিত্যের সম্বল সে কথা না বললেও চলে। কারণ, সাহিত্য তো সঙ্গীত নয়, নৃত্য নয়, চিত্র নয়, ভাষাই তার দেহ—যে দেহ রচিত শব্দার্থযুক্ত বাক্য দিয়ে। তবে সাহিত্যের ভাষা এমন ভাষা যা শুধু কাজ চালায় না—মনে ভাব লাগায়, রস জাগায়, যাতে আনন্দ জন্মে। সাহিত্য পড়ি,—ভালো হলে বলি 'ভালো লেগেছে', অথবা 'খুসী হয়েছি' বা 'আনন্দ পেয়েছি'। আবার ওই ভাবটা প্রকাশ করতেই বলি 'রস উপভোগ করেছি', কিম্বা 'ভাব ফুটেছে' (নবেল নাটক সহ চরিত্রপ্রধান সাহিত্য হলে 'চরিত্র ফুটেছে' এও বলি)। রস ও আনন্দ মনে জমে উঠলে বলে ফেলি—'সুন্দর', 'চমৎকার'! মোট কথা, 'রস,' 'ভাব', সৌন্দর্য', 'আনন্দ'—এ সবই আমরা মনে করি সার্থক সাহিত্যের পরিচয় বহন করে। অথচ কথাগুলি অর্থের দিক দিয়ে এক নয়, তাদের বিশিষ্ট অর্থ আছে। আমরা সাধারণ পাঠকেরা একটা সামান্যীকৃত অর্থেই শব্দগুলিকে প্রয়োগ করি,—সে অর্থ এই, আনন্দ লাভ করেছি। রস, ভাব, সৌন্দর্য যাই মনে জাগুক সে সকলেরই পরম দান—আনন্দ। আনন্দ পাই বলেই তো সাহিত্য পড়ি। আর, উল্টিয়ে বলতে পারি—যে লেখা আনন্দ দিতে পারে না তা সাহিত্য নয়। তা শাস্ত্র হতে পারে, নীতি কথা হতে পারে, অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য তা থেকে জানতে পারি, অনেক গভীর তত্ত্ব থাকতে পারে—যাই থাকুক, কিন্তু তাতে যদি আনন্দবোধ না জাগে তবে তা সাহিত্য নয়।

আনন্দ অবশ্য অনেক জাতের—হিপিদের গঞ্জিকা-সেবনে আনন্দ। অর্থলাভে যশোলাভে প্রায় সকল মানুষেরই আনন্দ—লেখকদেরও পাঠকদেরও। বলা নিষ্প্রয়োজন—সাহিত্যের আনন্দ এ জাতের নয়। এমন কি, মায়ের সন্তানলাভে যে আনন্দ—নিশ্চয়ই তা পরম আনন্দ—তবু সাহিত্য কিম্বা শিল্পকলা থেকে যে আনন্দলাভ

হয় তার তুলনায় ওই সন্তানলাভের আনন্দও স্থূল—অনেকটাই তা মাতার দেহগত, জৈব এবং মায়ের একান্ত। কিন্তু শিল্প-সাহিত্য উপভোগের আনন্দ সে তুলনায় দেহগত নয়, জৈব নয়, অন্তরের রসবোধের, এবং অধ্যাত্মানুভূতির।

প্রসঙ্গত কথাটা একটু পরিষ্কার করা প্রয়োজন : অধ্যাত্মানুভূতি বলতে কি বোঝায়? আমরা তা দ্বারা এখানে অলৌকিক অমানবীয় কোনো অনুভূতির কথা বলছি না। অধ্যাত্ম হচ্ছে চৈতন্যের উচ্চ প্রকাশস্তর, অবাস্তব অলৌকিক কিছু নয়। শিল্প-সাহিত্যের আস্বাদনে মানুষ এরূপ উচ্চস্তরে পৌছয়—তার চৈতন্য সমুন্নত হয়। হয়ত অধ্যাত্মবোধের আরও পথ আছে। যেমন, বিজ্ঞানের নিঃস্বার্থ চর্চা কিম্বা বিশ্ববোধ (cosmic feeling), এমনি আরও কোনো কোনো পথ।

আকাশভরা সূর্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান॥

এরূপ বিশ্ববোধে মানুষের আত্মবোধ বিকশিত হয়—চৈতন্য প্রস্ফুরিত হয় : লাভ হয় গভীর আনন্দ। এই আনন্দের সহোদর সেই আনন্দও যা শিল্প-সাহিত্য যোগায়। এ জন্য যাঁরা অলৌকিক বা অপ্রাকৃতিক সত্যে বিশ্বাসী তাঁরা মনে করেন কাব্যের রস হচ্ছে 'লোকোত্তর',—'ব্রহ্মস্বাদসহোদর' : তাঁদের মতে তাই সাহিত্যের আনন্দও ব্রহ্মানন্দের সগোত্র। তাঁদের অভিধানে অধ্যাত্ম অর্থ হচ্ছে ওরূপ অপ্রাকৃত কোনো রহস্য—এবং অধ্যাত্ম আনন্দও অ-মানবীয় অপ্রাকৃত আনন্দ। কিন্তু আমাদের মতো যাঁরা ব্রহ্মকে জানেন না, তাঁরা ব্রহ্মস্বাদ কেমন তাও জানেন না, ব্রহ্মানন্দও বোঝেন না—অধ্যাত্মরস তাঁদের কাছে শ্রেষ্ঠ মানবীয় রস। মানবরহস্যও তাঁদের কাছে কম রসবস্তু নয়, আবার অধ্যাত্মানন্দও নয় কম মানবীয় সম্পদ।

মার্কস্‌বাদী দৃষ্টিতে এই রসানুভূতি, সৌন্দর্যানুভূতি মানব চৈতন্যের এক নিঃস্বার্থ প্রকাশ—আকাশ থেকে তা পড়ে না, ভগবৎ কৃপায়ও জন্মে না। মানুষের জীবন ও জগতের যোগাযোগে তার উদ্ভব, সমাজ-চেষ্টিতে ক্রমবিকাশ, বাস্তব জগতের ঘাত-প্রতিঘাতে (শ্রম-সাধনায়) সুষমাবোধের, সৌন্দর্যবোধের উন্মেষ ; (reflex of purpose) রূপরস সৃষ্টির উদ্দেশ্যও সেই চৈতন্যের আত্মবিকাশ।

প্রথম কথাটায় তা হলে ফিরে যাই—রসাত্মক বাক্য নিয়ে সাহিত্য, এবং সাহিত্য আনন্দময় বাণীরচনা। 'বাণীরচনা' কথাটায় 'রচনা'র বা সৃষ্টির আভাস আছে—সৃষ্টি-প্রতিভার যোগেই বাক্য রসাত্মক হয়, রসসৃষ্টি হয়, আর যথার্থ রসসৃষ্টি হয়েছে কি হয় নি তার অবিসংবাদিত প্রমাণ ওই আনন্দ। অবশ্য আমরা মার্কস্‌বাদের কথা মেনে

নিয়েছি যে ওই রসবোধ সমাজের নিয়মেই উদ্ভূত, সামাজিক মানুষের তা স্বাভাবিক। সাধারণভাবে যারা পাঠক বা শ্রোতা, তাদের রসগ্রহণের স্বাভাবিক শক্তি আছে, 'সহৃদয়তা'র অভাব নেই। আবার সামাজিক যোগাযোগে সাহিত্য বা শিল্প বুঝবার মতো তাদের 'অক্ষরজ্ঞান'ও হয়েছে—বিশেষ ভাষার সাহিত্যের বা বিশেষ ধারার সঙ্গীতের বর্ণপরিচয় আছে, রুচিও কিছুটা জন্মেছে। কদাচ এর ব্যতিক্রম দেখা যায়—কিন্তু সে ব্যতিক্রমই। সাধারণভাবে সাহিত্য পড়লে পাঠক তা বোঝেন, লেখা রসযুক্ত বলে তার রসগ্রহণ করতে পারেন, এবং তাতে আনন্দ লাভ করেন। পাঠকের এই সামান্য (common) অধিকার আছে বলে রসসৃষ্টির মধ্য দিয়ে লেখকে-পাঠকে যোগাযোগ (communication) ঘটে—যোগাযোগ না ঘটলে সে লেখা অসার্থক। তাতে রসসৃষ্টি যদি ঘটেও থাকে, তাহলেও তা নিষ্ফল ; কারণ লেখকে-পাঠকে যোগাযোগ না ঘটলে আনন্দবোধ জাগে না। সাহিত্যের শেষ প্রমাণ আনন্দ।

সাহিত্যতত্ত্ব নন্দনতত্ত্বেরই অন্তর্ভুক্ত। সাহিত্য যখন গড়ে ওঠে তখন তা আস্বাদন করে মানুষের জিজ্ঞাসা জাগে—কী এর তত্ত্ব,—কী তার রসের স্বরূপ, ভাব বা সৌন্দর্য কী। এ আনন্দ কেমন আনন্দ, কী দিয়ে এই আনন্দের সৃষ্টি।—বাক্য নিয়েই যখন সাহিত্য তখন কেমন এই সাহিত্যের বাক্য, রস জন্মে কোন প্রক্রিয়ায়, কী তার শব্দের ধ্বনিগত বৈচিত্র্য, কী বা তার অর্থগত বৈভব—ইত্যাদি, ইত্যাদি শত রকমের প্রশ্ন, বিচার, বিতর্ক আমাদের দেশে ভরতমুনির কাল থেকে আজ পর্যন্ত চলছে। 'চলছে, চলবে।' এ সব বিচার-বিতর্কের শেষ নেই।—কারণ, সাহিত্য যে সৃষ্টি—সৃষ্টি অর্থই নতুন। একটা আবির্ভাব। কারণ, কাল বদলায়, যুগ বদলায়, ধ্যানধারণাও বদলায়। সৃষ্টির ভঙ্গিমা নতুন থেকে নতুনতর হয়ে ওঠে। 'সাহিত্য' 'তত্ত্বে'র পরে জন্মে না, তত্ত্বই জন্মে সাহিত্যের পরে। সৃষ্টির পরেই ত সৃষ্টিতত্ত্ব সম্ভব। তাত্ত্বিকদেরও এজন্য 'তত্ত্ব'কে বদলাতে হয়। জীবনের এই গতিময়তা মনে রাখলে বোঝা যায়—সব দেশেই কেন নন্দনতত্ত্বের বিচার-বিতর্কের শেষ নেই,—এবং কোনো যুগের প্রধান তত্ত্ববিচার যেমন মিথ্যা নয়, তেমনি সৃষ্টির নতুন নতুন প্রকাশে কোনো তত্ত্বই একেবারে সর্বাংশে সার্থক মনে হয় না। পাশ্চাত্ত্য দেশে এ্যারিস্তোতল্ থেকে সাহিত্য-জিজ্ঞাসা আরম্ভ হয়েছিল দেখা যায়। এ্যারিস্তোতলের অনেক কথাই এখনো চলে। সাহিত্য তাঁর মতে অনুকরণ (মাইমিয়োসিস্) ; আমাদের কাব্য-তাত্ত্বিকরাও তা জানতেন—'লোক বৃত্তানুকরণ', 'ভাবানুকীর্তন' জগতের বাহ্য রূপের ও ভাবরূপের শুধু 'অনুকরণ' নয়—যা হতে পারে, হওয়া সম্ভব, তাও,—এই মূল কথাটা নবেল-নাটকে যতটা গ্রাহ্য, আজকের গীতিকবিতায় বা খণ্ড কবিতায় (যেমন

রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতায়) কি তার 'ভাবানুকীর্তন' অত সহজে মেনে নেওয়া যায় ? নাটকে 'ইউনিটি'র তত্ত্ব কোথায় উবে গিয়েছে। রূপায়ণ বা প্রকাশকলার সম্বন্ধে পুরনো গবেষণা তো মনে হয় আরও বাতিল। কিন্তু সত্যই কি এ সব কথা ভ্রান্ত ?

ব্যাপারটা এই—পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে আধুনিক যুগে প্রায় বিপ্লব ঘটেছে। শুধু বিপ্লব 'ঘটে' নি ; বিপ্লব শেষও হয়নি। শিল্পজগতে এ এক মহাবিপ্লব, পার্মানেণ্ট রিভোল্যুশন। রিনাইসেন্সের সময় ডিভিনিটিজ-এর প্রতিপত্তি কাটিয়ে প্রথম হিউম্যানিটিজ্-এর উদ্ভব হয়েছিল।—জীবন ও ভাবনা-চিন্তা ভগবৎ-কেন্দ্রিক না থেকে মানব-কেন্দ্রিক হয়ে উঠতে লাগল, সাহিত্য বিশেষভাবেই স্বর্গ থেকে বিদায় নিয়ে কার্যত পৃথিবী ও পৃথিবীর মানুষের কথা হয়ে উঠল। সমাজের ধ্যান-ধারণার এসব পরিবর্তনের সঙ্গে সাহিত্যেরও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটল—সৃষ্টিতেও এল এই নতুন দৃষ্টির প্রতিফলন। তাই সাহিত্যের বিষয় (content) ও তার প্রকাশকলায় (form) এল নতুনত্ব। শুধু নতুনত্ব নয়, নিত্য নতুনত্ব।—একশ বৎসরের মধ্যে য়ুরোপীয় সাহিত্যে যে পরিবর্তন ঘটেছে, তা কি—আগেকার পাঁচশ বৎসর পূর্বে কেন, তিনশ বৎসর পূর্বে শেক্সপীয়র বেন জনসনের আমলে কেউ ভাবতে পেরেছে ? তাই য়ুরোপের সেই চিরায়ত এ্যারিস্তোতলীয় নন্দনতত্ত্বে আর তো থেই পাওয়া যায় না এ যুগের য়ুরোপীয় সাহিত্যের। আমাদের দেশের কাব্যবিচার ও অলঙ্কারবিচারও যে আমাদের বর্তমান যুগের সাহিত্যের জিজ্ঞাসায় সম্পূর্ণ তৃপ্তিদায়ক হবে তা নয়। কারণ, আমাদের বর্তমান শিল্প-সাহিত্য আধুনিক যুগের শিল্পাদর্শে ও সাহিত্যধারাতেই নির্মিত হচ্ছে। নানাদিক থেকে আধুনিক শিল্পতত্ত্ব নতুন করে ঢেলে সাজা হচ্ছে। ফ্রয়েড, ই-য়ুং-এর দৃষ্টিক্ষেত্র, সেমাণ্টিক্স্-এর ক্ষেত্র, ক্রোচে প্রমুখ দার্শনিকের দৃষ্টিক্ষেত্র, নানা খান থেকে বিচার হয়। তাতে খুব যে থেই পাওয়া যাচ্ছে তাও নয়। কারণ, সাহিত্যসৃষ্টিতে এত নতুনত্ব ও বৈচিত্র্য আসছে প্রতিদিন যে একটি সাহিত্যতত্ত্ব প্রণীত হতে না হতেই কিছু না কিছু তার অসম্পূর্ণতা চোখে পড়ে, সে তত্ত্বের সংস্কার করাও প্রয়োজন হয়। মার্কস্‌বাদী সাহিত্যজিজ্ঞাসাও এই সত্যেরই একটা প্রমাণ। সে আধুনিক যুগেরই একটা নতুন জিজ্ঞাসা সবে তার ভিৎ-রচনা হয়েছে। মার্কস্‌বাদের সাহিত্যদৃষ্টি তাই এখনো সুস্থির ও বিচক্ষণ হয়নি।

মাত্র একশ বছরের কিছু বেশী হল মার্কস্‌বাদের প্রথম আবির্ভাব। সাহিত্য তার ক্ষেত্র নয়। তার প্রধান ক্ষেত্রটা সমাজ। কিন্তু তার সমাজদর্শন দাঁড়াল এক বিশ্ব-বীক্ষার (Weltenschaung) ভিত্তিতে, এক জীবনদর্শন অবলম্বন করে। ফলে সাহিত্যও মার্কস্‌বাদের জিজ্ঞাসার ক্ষেত্র, সাধনার ক্ষেত্র, না হয়ে পারে না। যতই সমাজে

মার্কস্‌বাদের প্রতিষ্ঠা বাড়ছে ততই সাহিত্যও তার জিজ্ঞাস্য হয়ে উঠছে। আবার সে জিজ্ঞাসা ও সাধনা যথার্থভাবে আরম্ভ হতে না হতেই সেই মার্কস্‌বাদী সাহিত্যতত্ত্বেরও খণ্ডন-মণ্ডনের দাবী দেখা দিয়েছে। কে সনাতনী, কে শোধনবাদী?

জাঁ-পল-সার্ত্রের মতো, অর্নেষ্ট্ ফিশারের মতো, রজার গারোদির মতো কি অন্যেরা মার্কস্‌বাদ বলবে? কে খাঁটি মার্কস্‌বাদী, কে ভুয়ো মার্কস্‌বাদী, কী সাচ্চা, কী মেকি, তাও বলা দুরূহ। আজ যে লুকাচ্ (Lukacs) তিরস্কৃত কাল তিনিই আবার সম্মানিত—যা একজনার কাছে সোশ্যালিষ্ট রিয়ালিজম্ আর একজনার কাছে তা 'কুফেরি', এও দেখা যাচ্ছে। এ জন্য অবশ্য কতকটা মার্কস্-এঙ্গেলস্-লেনিন প্রভৃতি মার্কসবাদের প্রবক্তারা ও সাধকেরাও দায়ী। এঁরা প্রধানত সমাজবিপ্লব নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। রাজনৈতিক সাহিত্য, সমাজনৈতিক সাহিত্য—এ সব তাঁরা তৈরী করেছেন। যা সৃষ্টিমূলক সাহিত্য— যার কথা আমরা প্রথমেই আলোচনা করেছি—যা আমাদের আলোচ্য—তা তাঁরা আলোচনা করবেন কখন? শিল্প-সাহিত্যের প্রশ্নে এই জ্ঞানী কর্মবীরেরা গভীরভাবে মনোযোগ দিতে পারেননি। প্রয়োজনমতো ও প্রসঙ্গত, কিছু কিছু লিখেছেন, বলেছেন। কিন্তু বিশেষ context, উপলক্ষ্য ও লক্ষ্য বিস্মৃত হয়ে তাঁদের প্রত্যেকটি উক্তিকে 'বেদবাক্য' করে তোলা মার্কস্‌বাদীদের একটা বিষম দুর্বলতা। সৃষ্টির দাবী মনে রেখে সৃষ্টিমূলকভাবে মার্কস্‌বাদ প্রযোগ না করলে আক্ষরিক অর্থে মার্কস্-এর 'বাক্য-মানা' হতে পারে, কিন্তু মার্কস্‌বাদের মূল সত্যই তাতে অগ্রাহ্য হয়। কারণ, মার্কস্‌বাদ 'গ্‌মা' নয়। আর বিচারে, প্রয়োগে তার ভুল ঘটেছে, ঘটছে এবং ঘটবে—এ কথা গুরুরাও জানতেন। এই মূল কথাটা মনে রেখেই মার্কস্-বাদী দৃষ্টিতে জীবন-জিজ্ঞাসা যেমন করতে হয়, তেমনি করা প্রযোজন সাহিত্য-জিজ্ঞাসা। তাতে ভুল ঘটছে, ঘটতে পারে—'A Marxist should not be afraid of making mistakes' —এ কথা মনে রেখে করা উচিত শিল্প-সাহিত্য আলোচনা—সেই মূল দর্শনকে যতটা সম্ভব বুঝে ও মেনে নিয়ে।

মার্কস্‌বাদী মূল দর্শনটা কী, Dialectical Materialsm কী বলে, Historical Materialism ভুল না শুদ্ধ, এ বিচারও তাই মার্কস্‌বাদী সাহিত্য-বিচারে একটা মূল কথা। কিন্তু সেই দার্শনিক বিচার এই একশ বছরেও শেষ হচ্ছে না, দু-এক খানা বইতে শেষ হবে না। সাহিত্য-জিজ্ঞাসায় মার্কস্‌বাদী তাত্ত্বিক পুঁথিপত্র কম, কিন্তু তর্ক-বিতর্ক কম নয়। তার বৈচিত্র্যই কি কম! মার্কস্, এঙ্গেলস্, লেনিন-এর শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক উক্তি এ উদ্দেশ্যে মূল আশ্রয়। যেমন, মার্কস্-এর Critique of Political Economy-র Preface, The German Ideology, Eighteenth Brumaire,

Engels-এর চিঠিপত্র, লেনিনের তলস্তয়সম্বন্ধীয় লেখা। তারপর বেলিন্‌স্কি, চার্নিসেভ্‌স্কি প্রভৃতি প্রাক্তন রুশ তাত্ত্বিকদের বক্তব্যও বিবেচ্য। গর্কি, লুনাচারস্কি, লেফ্‌শিৎস্ প্রভৃতি সোভিয়েত সাহিত্যিকদের নানা ব্যাখ্যানও স্মরণীয়। একেবারে হাল আমলের পাউস্তোভ্‌স্কির সাহিত্যক্লাশের বক্তৃতা (The Golden Rose) ও সোভিয়েত নন্দনতত্ত্বের নানা আলোচনাসংকলন (Problems of Modern Aesthetics, Progress Publishers, Moscow, 1969) প্রভৃতি বই-এ নতুনত্ব আছে। এ সকলের সংক্ষিপ্তসার দিতে গেলেও তো পৃষ্ঠায় কুলোয় না। বই পড়তে গেলে তো আয়ুতেও কুলোবে না। তবে ক্রিষ্টোফার কড্‌ওয়েল (বিশেষ করে Illusion and Reality, Studies in a Dying Culture), র‍্যাল্‌ফ্‌ ফক্স্‌ (Novel and the People), অধ্যাপক জর্জ টম্‌সন্‌ (Aeschylus and Athens) প্রভৃতি ইংরেজ মার্কস্‌বাদীদের সাহিত্যবিচার আমরা কোনো কারণেই ভুলতে চাই না। কারণ তাঁদের কথা আমরা বেশি বুঝতে পারি।—আর তাঁদের আলোচনা সাহিত্য-নিদর্শন ধরে আলোচনা—তাই তার প্রয়োগ বোঝা সহজ। তাঁদের আলোচনার সংক্ষিপ্তসার দিতে গেলে সেই একই সমস্যা—'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই।'—অতএব, মার্কস্‌বাদের মূল দর্শন মেনে নিলে সাহিত্যকে কী ভাবে দেখতে হয়, সংক্ষেপে তাই এখানে বলে বক্তব্য শেষ করছি।—তা নির্ভুল হবে এমন কথা বলা চলবে না। সংক্ষিপ্ত আকারে লিখলে বরং ভুল করবার ও ভুল বুঝবার অবকাশ বেশি থেকে যায়। কেউ ভুল বুঝতে না চাইলেই লেখকের সৌভাগ্য।

মার্কস্‌বাদী দর্শনের মূল যে দুটি তত্ত্ব সাহিত্যালোচনায় মনে রাখা চাই তা এই :—প্রথমত, **মার্কস্‌বাদ বাস্তববাদ** (materialism), বাস্তববাদ 'জড়বাদ' নয় ; তবে, 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' এই তত্ত্বের প্রায় উল্টো দিক। ব্রহ্ম কোথায়? জগৎ-ই সত্য, এবং বস্তু ('জড়' নয়) আগে, চৈতন্য পরে। কারণ, চৈতন্য ছাড়াও বস্তু আছে, কিন্তু বস্তু ছাড়া চৈতন্যের প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই বাস্তববাদে সাহিত্য হচ্ছে এই বাস্তব জগৎ ও জীবনের অনুকরণ। বাস্তব জগতের সঙ্গে মানুষের জীবনের সক্রিয় যোগাযোগ অচ্ছেদ্য সেই মানব-প্রয়াসের সূত্রেই জীবনেরও স্ফূর্তি, মানুষের চৈতন্যেরও স্ফূর্তি, সেই চেষ্টার তাগিদেই ক্রমপরিণতি, বিকাশ সুষমাবোধের ও সৌন্দর্যসৃষ্টি চেষ্টার। জগৎ ও জীবনের এই সম্পর্ক সাহিত্যিকের চিত্তে নানাভাবে প্রতিফলিত হয়, তা আশ্রয় করেই মানুষের ভাবনা-কল্পনার নানাবিধ প্রকাশ। সৃষ্টিরও তাই মূল।

দ্বিতীয় তত্ত্ব : নীতিনিয়মের কথা। তা দ্বান্দ্বিক সমন্বয় (Dialectics)—হেগেল থেকে নেওয়া। বিশ্বনীতি হচ্ছে দ্বন্দ্বসমন্বয়ের নীতি। বস্তুতেও তাই, চৈতন্যেও তাই।

বস্তুর মধ্যে শাশ্বত আবহমান চলছে বিপরীত (opposites) শক্তিসমূহের দ্বন্দ্ব (struggle); দুয়ের সঙ্গে দুয়ের কেবলি আড়াআড়ি, জড়াজড়ি (interpenetration) এবং আবার দুয়ের সমন্বয়। এই প্রক্রিয়াতেই সব চঞ্চল, বিশ্বভুবন গতিময়, নিত্য নবায়মান। কারণ, এই দ্বন্দ্বের সমন্বয়ে দেখা দেয় তৃতীয় কিছু। সে নতুনের মধ্যেও আবার ফুটে ওঠে দ্বন্দ্ব—আবার তাই দেখা দেয় নতুনতর সমন্বয়।—এমনি দ্বান্দ্বিক সমন্বয়।—থিসিস্—অ্যান্টিথিসিস্—সিন্থেসিস্—অস্তি-নাস্তি সমন্বয়—বিশ্বপ্রপঞ্চের এই হল মূল ধর্ম। সত্য হল এই dialectics, তাতেই বস্তু থেকে জীব সৃষ্টি, জীব থেকে আবার সেই দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ে অধিক থেকে অধিকতর চেতন জীব—মানুষ—মানুষও আবার সেই নিয়মে জীবনের তাড়নায় চলছে। বস্তুর সঙ্গে জীবের, জীবের সঙ্গে চৈতন্যের, আবার বস্তুর সঙ্গে বস্তুর, জীবের সঙ্গে জীবের, চৈতন্যের মধ্যেও ভাবনার সঙ্গে ভাবনার—ভেতরে বাইরে এই দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ে জগৎ ও জীবন আশ্চর্যরকমের জটিল ও চঞ্চল। এই দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ে মানুষের ইতিহাসও বিকশিত (Historical materialism হল এর নাম)—বিশেষ করে মনুষ্যসমাজ জীবিকার্জনের সূত্রে লেগেছে জীবিকা-উৎপাদনে। উৎপাদনের সূত্রে সমাজ বিভক্ত হয়েছে শাসক ও শাসিতে, শোষক ও শোষিত দুই শ্রেণীতে (class)। এই হল শ্রেণী-দ্বন্দ্ব (class struggle)। এই শ্রেণী-দ্বন্দ্বেই ইতিহাস গতিময়—উৎপাদনের স্তর অনুযায়ী নানা ধাপ সে উত্তীর্ণ হচ্ছে একে একে, আর সঙ্গে সঙ্গে সে স্তরের বা সমাজের ভাবনা-চিন্তা, দর্শন-শিল্প-সাহিত্য, রাষ্ট্র, আইনকানুন, সবই হচ্ছে সে রূপে পরিবর্তিত—দ্বন্দ্বের দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত। এই শ্রেণী-দ্বন্দ্বের সমন্বয় আবার শ্রেণী-বিপ্লবে—তাতে শোষণহীন সমাজ হবে শেষে প্রতিষ্ঠিত। সাহিত্যেরও তাই সামাজিক উদ্দেশ্য হবে এই সংগ্রাম ও বিপ্লব। মার্কস্-এঙ্গেলস্-লেনিন প্রভৃতির প্রধান উদ্দেশ্য ও সাধনা ছিল সেই শোষণহীন সমাজকে এগিয়ে আনা—সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত করা। তাই সামাজিক বিপ্লবের দিক থেকেই সাহিত্যকে তাঁরা সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।—সাহিত্যের নিজের মধ্যে ভাষার সঙ্গে ভাবের, বা ধ্বনির সঙ্গে অর্থের, অথবা এদের প্রত্যেকটিরই মধ্যে যে দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের নীতি সক্রিয়, এবং কী ভাবে তা সক্রিয়,—এ চিন্তা তাঁরা বেশি করবার অবকাশ পাননি।—শিল্পসৃষ্টির প্রক্রিয়া (creative process) পরিষ্কার করে তাঁরা দেখিয়ে যাননি—তার ইঙ্গিত রেখে গেছেন বেশ কিছু। সাহিত্যও ডায়েলেক্‌টিক-এর নিয়মেই চলছে; এবং আর্থিক উৎপাদন-চেষ্টাতেই ঘটেছে কল্পনার, ভাবনার, সৌন্দর্যবোধেরও বিকাশ। তা অবার ভিন্ন করে বুঝিয়ে বলতে হবে কেন? মার্কস্‌বাদী নন্দনতত্ত্বের এইটি হল গোড়ার তত্ত্ব। কিন্তু মার্কস্-এঙ্গেলস্ প্রধানত বলেছেন সাহিত্যের সামাজিক প্রকৃতির

কথা ও সামাজিক দায়িত্বের কথা।—ঠিকই তো, সাহিত্য জগৎ ও জীবনের অনুকৃতি এবং সাহিত্য সমাজসত্যকে প্রকাশ করে। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে সাহিত্য প্রধানত উৎপাদনে অগ্রগামী শ্রেণীর ভাবনা-ধারণার (মূলত তাদের স্বার্থের) পরিপোষক। শ্রেণী-সংগ্রাম যখন তীব্র হয় তখন সাহিত্য হয় সেই সংগ্রামের হাতিয়ার। পতনোন্মুখ সামাজিক শ্রেণীর সাহিত্যে থাকে পতনের প্রশ্রয়, উদীয়মান শ্রেণীর সাহিত্যে থাকে উদয়পথের আহ্বান।—সমাজের আর্থিক সংকটের সঙ্গে সমাজের সাহিত্যের মধ্যেও তাই দেখা দেয় সংকট—তবে এই সংকটটা অনেক বেশি জটিল, যতটা প্রকট তার চেয়েও বেশি প্রচ্ছন্ন। সাহিত্যের বিচার করতে হবে তবু এই মাপকাঠি দিয়ে—শ্রেণী-সম্পর্কের ছাপ তা কীভাবে বহন করছে, শ্রেণীবিপ্লবের দিক থেকে তা বিপ্লবকে এগিয়ে দিচ্ছে, না পিছিয়ে দিচ্ছে।

সংক্ষেপে তাই বলা যেতে পারে—(১) মার্কস্‌বাদী সাহিত্যতত্ত্ব প্রথমত এক ধরনের বস্তুবাদ (realism)। (২) সেই সঙ্গে তার বিচার এক ধরনের সমাজ-তাত্ত্বিক (sociological) বা আর্থিক-সামাজিক (socio-economic) বিচার। শ্রেণী-সংগ্রামের হাতিয়াররূপে সে বিচার। (৩) সাহিত্য তাই উদ্দেশ্যহীন নয়—আর্ট ফর আর্টস্ সেক্—একটা মিথ্যা তত্ত্ব—মূল উদ্দেশ্য অবশ্য সামাজিক শিক্ষাদীক্ষা ও সমাজ-উন্নতি। আবার (৪) কম করে হলেও ঐতিহাসিক (historical) ধারায়ও মার্কস্‌বাদী সাহিত্যকে বিচার করেন।—সেখানে নৃ-বিজ্ঞান (anthropology) থেকে শিল্প-সাহিত্যের ক্রম-বিকাশের ইতিহাস তাঁর আলোচ্য (অধ্যাপক জর্জ টম্‌সনের Aeschylus and Athens, বা ছোট পুস্তিকা Marxism and Poetry বিশিষ্ট অথচ সুলভ গবেষণা। এফ. ডি. কিলিংগেণ্ডার-এর Marxism And Modern Art ওরূপ ছোট পুস্তিকা, তা বিশেষ করে শিল্পে আধুনিক ফর্ম্যালিজ্‌ম্-এর বিশ্লেষণ) —যে আদিম মানবসমাজের উপাদন-সম্পর্কিত আনুকরনিক (imitative) যাদু-চেষ্টার (magic rites) উপকরণ ছিল নাচ-গান-কবিতা, কেমন করে উৎপাদন-বিবর্ধনের সঙ্গে তাই সঙ্গীত, নৃত্য ও ভাষা-ভিত্তিক সাহিত্যরূপে ধাপে-ধাপে পৃথক-পৃথক বিদ্যায় বা শিল্পে পরিণত হয়েছে—এ সব। সেই উৎপাদন-সম্পর্কিত অনুকৃতি-মূলক যাদুবিদ্যার কথা এখন প্রায় বিস্মৃত, কিন্তু শিল্পের সঙ্গে সমাজের উৎপাদন-গত সম্পর্ক এখনো বিলুপ্ত নয়, এখনো প্রচ্ছন্ন আছে।

এবার পুরনো কথাটায় ফিরে আসা যাক। রসসৃষ্টি, সৌন্দর্যপ্রকাশ, আনন্দদান, এসব কথাগুলি মার্কস্‌বাদী দৃষ্টিতে কতটা সত্য?—মার্কস্‌বাদের দার্শনিক চিন্তায় এ সবের স্থান কী হতে পারে, তা দেখেছি। কিন্তু সরাসরি এ মর্মের কথাগুলি নিয়ে

আলোচনা তাতে কম—এখনো বেশি নয়। তবে সাহিত্যের বিশিষ্ট অস্তিত্ব মার্কস্‌বাদীরা বরাবরই মেনে নিয়েছে—Literature of Power, রসসাহিত্যকে Literature of Knowledge and Information-এর থেকে ভিন্ন করেও দেখে। রস-সাহিত্যই বিশেষ অর্থে সাহিত্য। তা শ্রেণী-সমস্যার বিশ্লেষণ নয়,—এমন কি, 'অনুকরণ' বলে সমাজসম্পর্কের আক্ষরিক প্রতিলিপিও নয়। তেমন হুবহু বাস্তবতা বা ন্যাচারালিজম্‌ ভুল পথ। রস-সাহিত্য মানবসভ্যতার একটা বিশিষ্ট সৃষ্টি। তা না হলে সাহিত্যিক বলতে মার্কস্‌কেই বোঝাত, গ্যয়টে-হাইনেকে নয়। লেনিনই হতেন সোভিয়েত সাহিত্যের পক্ষে যথেষ্ট, গর্কির দরকার পড়ত না। তলস্তয়কে নিয়েও লেনিন-এর উৎসাহ হত অর্থহীন। ইস্‌ক্রা, প্রাভদা, ইজভেস্তিয়া তো আছে—আবার সোভিয়েত 'সাহিত্য-পরিষদ' কেন—কবিতা কেন, গল্প কেন, উপন্যাস কেন? শেক্স্‌পীয়র, রবীন্দ্রনাথ, কালিদাস নিয়েই বা মার্কস্‌বাদী সোভিয়েত সমাজে অত মাতামাতি কেন? পাস্তেরনাক, সোলজেনিৎসিনকে নিয়ে তর্ক-বিতর্ক কেন? প্রশ্নের উত্তর প্রশ্নেই রয়েছে।—মার্কস্‌বাদের দৃষ্টিতেও একথা মূলেই স্বীকৃত—সাহিত্যকে প্রথম সাহিত্য হতে হবে—রসসৃষ্টি হতে হবে, সৌন্দর্যসৃষ্টি হতে হবে, আনন্দদায়ক হতে হবে।—তার পরে তার অন্য বিচার, অন্য বিশ্লেষণ, সামাজিক মূল্যায়ন, শ্রেণীবিপ্লবগত উপযোগিতা বিচার ইত্যাদি।

আগে এই মাপকাঠিতে সাহিত্যকে দেখতে হবে, মার্কস্‌বাদ তা ধরেই নেয়। তারপর মার্কস্‌বাদী অন্য মাপকাঠিতে করে মূল্যায়ন। অবশ্য মার্কস্‌বাদীরা অনেকে তা বিস্মৃত হয়ে এমন উগ্রভাবেই তাদের অন্য মাপকাঠির প্রয়োগ করে যাতে মনে হবে তাদের বিবেচনায় যা মার্কস্‌বাদের সামাজিক উদ্দেশ্যসম্মত নয়, তা বুঝি সাহিত্যও নয়। কিন্তু সাহিত্য হলে যা শ্রেণী-সংগ্রামের বা সামাজিক প্রগতির বিরোধী, তাও সাহিত্য। এমন কি, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে নানা ভুয়োঁ ধারণা, ও অবাস্তব আদর্শবাদের ধোঁয়া ছড়ায় যে সাহিত্য তাও সাহিত্য। অথবা 'আর্ট ফর আর্টস্‌'-এর নামে যা কলাবিলাস যোগায় তাও সাহিত্য,—হোক তা সামাজিক মূল্যায়নে অপসৃষ্টি। কিন্তু—সাহিত্য যদি হয়—তা সৃষ্টিই।

অবশ্য একটা কথা মানতে হবে—যা মহৎ-সাহিত্য, এমন কি সত্যই সৎ-সাহিত্য, তা অপসৃষ্টি হয় না—মার্কস্‌বাদের এইটাও একটা কথা—আর তা সত্যকথা। কিন্তু সব সাহিত্য মহৎ-সাহিত্য নয়, সব তেমন সৎ-সাহিত্যও নয়। মানুষের চৈতন্যকে বিশেষ প্রসারিত করে না, কিন্তু দুদণ্ডের মতো মানুষকে খুসী করে, এবং সেভাবে তাকে প্রভাবিত করে—এমন সাহিত্যও আছে। তার 'আনন্দ' হচ্ছে entertainment-এর

আনন্দ—হয়ত ডুদণ্ডের মতো মানুষ তাতে সংঘাতের জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলে থাকতে পারে—মন relaxed হয়। এ রকম সাহিত্যের গুরুত্ব ডুদণ্ডের গুরুত্ব। আরও, মন্দও হতে পারে সাহিত্য—এমন ভুয়ো আনন্দও সাহিত্য যোগাতে পারে যা হয়ত মদ-গাঁজায় যোগায়। সস্তা রঙ্গব্যঙ্গ যোগানো থেকে ইন্দ্রিয়ের সুড়্‌সুড়ি দেয়—এমন অনেক লেখা আছে—সে সব এ জাতের সাহিত্য। মার্কস্‌বাদ অমন 'আনন্দ'ও অগ্রাহ্য করে, অমন সাহিত্যও অগ্রাহ্য করে। কারণ সাহিত্য হিসেবেও তার গুরুত্ব নেই। মার্কস্‌বাদের মতে সাহিত্য L. S. D. বা মারিজুয়ানার বিকল্প নয়। মার্কস্‌বাদের মতে আসলে জীবনের জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলবার জন্য শিল্প ও সাহিত্য নয়। বরং সে জ্বালা-যন্ত্রণা বাস্তব বলে স্বীকার করে, সে বাস্তবকে রূপায়িত করে, তাকে বুঝবার, চিনবার, তার বিরুদ্ধে মানুষকে দাঁড়াবার ও তা জয় করবার মতো আনন্দই সাহিত্যের উদ্দিষ্ট আনন্দ। যে সাহিত্য যত সৎ তা ততই এরূপ criticism of life, ততই শুধু entertainment বা recreation নয়, মানব চেতনার তা উজ্জীবন (heightening of consciousness); সাহিত্য হিসাবে শুধু নিজেই তা সৃষ্টি-কর্ম (creative activity) নয়, নতুনতর সৃষ্টি-প্রেরণা (re-creation of life and social forces)।

বোঝা যায়, সাহিত্যে তাই বাস্তববাদই (realism) মার্কস্‌বাদসম্মত সৃষ্টিধারা। কল্পনাবিলাস, স্বপ্নবিলাস নিয়ে জীবন থেকে পালানো, তাতে অগ্রাহ্য। রোম্যান্টি-সিজ্‌ম্‌-এ মার্কস্‌বাদের অবিশ্বাস—তা অবাস্তব পলায়নীবৃত্তির আশ্রয়। কিন্তু মার্কস্‌বাদসম্মত সাহিত্যিক বাস্তববাদের (realism) স্বরূপ বোঝা দরকার। এক দিকে তা 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং'—ধরনের বাস্তববাদের বিরোধী। ও হচ্ছে যে-বস্তুবাদ বস্তুর বাহ্যরূপ দেখে। তা হবে এক ধরনের ন্যাচারালিজ্‌ম্‌—জীবনের সমাজের নিগূঢ় সত্য তা বোঝে না—শুধুই বাহ্য-বিশ্লেষণ করে। সৃষ্টি হচ্ছে নিগূঢ় সত্যের উন্মোচন ('ঘটে যা তা সব সত্য নয়')। শুধু উন্মোচন নয়, অবান্তর বাহ্য বস্তুর জঞ্জাল সরিয়ে সেই নিগূঢ় উপকরণের সংশ্লেষণ; তাকে রূপদান, রূপান্তর সাধন—তারই নাম 'সৃষ্টি'। এতে চাই শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টি (intuition); অন্তত বস্তু-ভিত্তিক কল্পনাশক্তি (imagination); বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক বা কলাকৌশলও এরূপ অন্তর্দৃষ্টি বা কল্পনাতেই সংশ্লিষ্ট, সমন্বিত ও একাত্ম হয়ে ওঠে। কল্পনামাত্রই অগ্রাহ্য নয়—তার সহায়ে যদি সত্যকে প্রকাশিত করা যায়, তবে তা 'আক্ষরিক' অর্থে বস্তুবাদী না হলেও 'সত্যবাদী'। সেরূপই রোম্যান্টিসিজ্‌ম্‌ মাত্রই কল্পনার ফানুস নয়। বিপ্লবী রোম্যান্টিসিজ্‌ম্‌-এর কিছু পরিচয় আমরা বঙ্কিমের আনন্দমঠের মতো উপন্যাসে পাই

বলেই এত গভীরভাবে তা আমাদের নাড়া দেয়। সার্থক রোম্যান্টিক কবিতায় তো এই অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় আরও স্পষ্ট—যেমন শেলীর 'প্রমিথিয়ুস আন্‌বাউণ্ড'।

মার্কস্‌বাদের দৃষ্টিতে সাহিত্যের 'বাস্তববাদ' হচ্ছে আসলে বস্তুনিষ্ঠা ও জীবন-নিষ্ঠা—রোম্যান্টিসিজ্‌ম্, রিয়ালিজ্‌ম প্রভৃতি 'বাদ'গুলিকে তাই 'আক্ষরিক' অর্থে গ্রহণ করা চলে না। এজন্য একজন সোভিয়েত কবি বলেছেন—'Truth is the hero of Soviet literature'।

ভালো কথা। কিন্তু কী সেই সত্য? কোন্ সত্য তবে সাহিত্য প্রকাশ করে?—অবাঙ্‌মনসগোচরম্ কোনো সত্য নয়; ঝাপ্‌সা আইডিয়ালিজ্‌ম্-এর সত্যও নয়।—এ সত্য আপাত সত্য নয়—তাও দেখেছি। এ সত্যকে আমরা বলতে পারি জীবন-সত্য, সমাজ-সত্য ও মানব-সত্য। এই তিনের মধ্যে ঝোঁকের বশে মার্কস্‌বাদীরা সমাজ-সত্যের উপরই জোর বেশি দেন। শ্রেণী-সত্য বা শ্রেণী-সম্পর্কের বাস্তব রূপকেই তাঁরা একমাত্র সত্য বলে দেখেন। কিন্তু এঙ্গেলস্-এর চিঠি (Selected Letters) থেকে আমরা জানি—একভাবে না একভাবে শ্রেণী-সম্পর্কের ছাপ শিল্পে সাহিত্যে পড়ে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু (এঙ্গেলস্ বলছেন) অনেক সময়ে সে ছাপ থাকে প্রচ্ছন্ন। বরং যে সাহিত্য যত সার্থক তাতে সেই শ্রেণী-সম্পর্কের ছাপ ততই প্রচ্ছন্ন, প্রায় দুর্নিরীক্ষ্য। সমাজ-সত্য স্পষ্ট না দেখালেই মার্কস্‌বাদীরা মনে করেন বুঝি সমাজ-সত্য দেখানো হয় না। এ অত্যন্ত বড় ভুল। চোখে আঙুল দিয়ে পাঠককে যে লেখক শ্রেণী-সম্পর্ক দেখাতে ব্যস্ত, তিনি ভুলে যান চোখে আঙুল দিলে চোখ কিছুই দেখতে পায় না। রসসৃষ্টি সর্বত্রই ওরূপ আপাত বাস্তবে বা উৎকট বাস্তবতায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। সমাজ-সত্য ওভাবে সৃষ্টি করা যায় না।—ওরূপ উৎকটতায় আর দুটি সত্য নিশ্চয়ই ফাঁক পড়ে যাবে—জীবনসত্য, মানবসত্য। সমাজসত্য থাক বা না থাক, ও দুই সত্য না থাকলে সকল সাহিত্যই মূল্যহীন।

জীবন যে বিচিত্র ও অপরিসীম, মানুষও যে এক পরম আশ্চর্য সত্য,—এ কথা সাহিত্য চিরকালই মানত। কিন্তু এই চেতনাটা আধুনিক যুগের আগে সাহিত্যে এত পরিস্ফুট হয়ে উঠতে পারেনি। আধুনিক সাহিত্যের এ দুটিই প্রাণস্বরূপ— তার জন্যই সাহিত্যকে এ যুগে বলে Criticism of life, আর বলা চলে revelation of humanism। আগের যুগের মতো সাহিত্যকে শুধু রসসৃষ্টি, সৌন্দর্যসৃষ্টি, এবং আনন্দের উদ্দীপক প্রভৃতি বললেও এখন আমাদের অতৃপ্তি থেকে যায়—সব বলা হল না। এ যুগের সাহিত্যে প্রধান কথা—সাহিত্য জীবন-সত্যের প্রকাশ, মানব-সত্যের পরিচায়ক, এবং মার্কস্‌বাদী মতে, জীবন-সত্যের প্রকাশ বলেই আবার সমাজ-সত্যেরও প্রকাশ।

এ জন্যই পুরনো দিনের রস-বিশ্লেষণকেও আমাদের মনে হয় অনেকটা অবান্তর বা গৌণ—মূল দুটি রস যেন তখনকার রসতাত্ত্বিকরা বুঝেই উঠতে পারেননি—জীবন-রস ও মানব-রস। এ যুগের লিরিকধর্মী বা ভাবকল্পনাপ্রধান কাব্যে আমরা এই জীবন-রসের আস্বাদন পাই নিবিড়ভাবে ; আখ্যানকাব্যে আস্বাদন পাই বিশেষ করে মানব-রসের—'অনুকরণে'র মধ্য দিয়ে জীবনের রূপপ্রধান দিকের। কারণ, আখ্যানকাব্যের উপজীব্য মানব-জীবনের ও সমাজ-জীবনের রূপ, এবং সামাজিক মানুষ—যাদের নাম 'চরিত্র' (নবেলের 'চরিত্র', নাটকের 'চরিত্র') আধুনিক কালের পূর্বে মানুষের ব্যক্তি-সত্তার এত গুরুত্ব ছিল না—সেদিনের সাহিত্যতত্ত্বে 'চরিত্র' বিষয়ে আলোচনাও নেই। আধুনিক কালের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগে ব্যক্তি-চরিত্র চাই, চরিত্রসৃষ্টি ও মানব-রস—তাই এখন প্রধান এক আলোচ্য বিষয়। রসের দিক থেকে শৃঙ্গার রস, করুণ রস, অদ্ভুত রস প্রভৃতি রসের তত্ত্ব মনে হয় গৌণ ; আধুনিক সাহিত্যে পাই জীবন-রসের আস্বাদন। —যে জন্য এ সাহিত্যের লক্ষণ বলা হয় expression of significant experience—বিশিষ্ট জীবনাভিজ্ঞতার প্রকাশ।—অবশ্য এ নাম মার্কস্‌বাদের দেওয়া নয়, কিন্তু এ কথার সঙ্গে মার্কস্‌বাদের বিবাদ নেই।—মার্কস্‌বাদের বক্তব্য—সেই experience-ই significant যা social experience বা class experience। জীবন-সত্য হচ্ছে সমাজ-সত্যেরই নির্যাস। তেমনি সংগ্রামী নায়ক মানব-সত্যের মুখপাত্র।

ঘুরে ফিরে মার্কস্‌বাদ তাদের এই মাপকাঠিকে প্রাধান্য দেবে—আর তাই সাহিত্য তত্ত্ব হিসাবে প্রাধান্য দেবে—বিশেষ বিশেষ সমাজের বিকাশ মতো—critical realism, socialist realism প্রভৃতি realism-এর নীতিকে।

এই কথাও তা হলে বোঝা যায়—বিষয়বস্তু (content) ও রূপায়ণ (form) বা প্রকাশকলা—যে দু'য়েতে মিলে সাহিত্য রচিত হয়—তার মধ্যে মার্কস্‌বাদীরা রিয়্যালিজম্-এর ভক্ত বলে প্রাধান্য দেয় বিষয়বস্তুতে (content), প্রকাশকলাকে মনে করে সে তুলনায় গৌণ। অবশ্য বিষয়বস্তুকেও দুটো ভাগ করা যায়—একটা প্রকট বস্তু, আর একটা ভাববস্তু—একটা যা আমাদের আলঙ্কারিকরা বলবেন 'বাচ্য' আর একটা 'ব্যঙ্গ্য'। মার্কস্‌বাদী বলবেন এ দু'য়েরও দ্বন্দ্বাত্মক সমন্বয়ে (dialectical মিলনে) বিষয় হয় সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু। 'বাচ্যার্থ' ও 'ব্যঙ্গ্যার্থে' দ্বন্দ্ব থেকে গেলে ভাব জমে না, রস জমে না, আনন্দ জন্মে না।

কিন্তু, প্রকাশকলা সার্থক না হলেও বিষয়বস্তু প্রকাশিত হয় না, লেখা 'সৃষ্টি' হয়ে ওঠে না। প্রকাশকলা সার্থক হয় যদি তা বিষয়বস্তুর অনুরূপ হয়। আমাদের অলঙ্কার-শাস্ত্র, এবং অনেক দেশের অনেক সাহিত্য-তত্ত্বেই, এই প্রকাশকলার কোনো-না-কোন

দিক নিয়ে আলোচনা। মার্কস্‌বাদীরা মনে করে ওটা একপেশে করে, এমন কি, প্রধান করে দেখা একটা ভুল।—শিল্পে-সাহিত্যে formalism হচ্ছে জীবনবোধ ও সমাজবোধের দিক থেকে দৈন্যের প্রমাণ, এমন কি, আত্মছলনা, বা সামাজিক অবক্ষয়েরই লক্ষণ। প্রকাশ ও বিষয় অচ্ছেদ্য। সহজেই আমরা বুঝতে পারি—'বলাকা'র বক্তব্য (বাচ্যার্থ), সামান্য ব্যঙ্গ্যার্থের সঙ্গে তা সম্মেলিত। 'বলাকা'র বাণীসম্পদ্‌, শব্দবিন্যাস, ধ্বনি-বৈভব, ব্যঞ্জনা, রূপকল্প ইত্যাদি ছেড়ে দিলে কী দাঁড়ায়? গতিবাদের ভাববাদী statement মাত্র। আর, সেই অন্তর-সত্য (জীবনের গতিবাদ) বাদ দিয়েই কি 'বলাকা'র ছন্দ, বাক্যরচনার কথা ভাবা যায়?—ভাবা যায় না। মার্কস্‌বাদী তার দ্বন্দ্বসমন্বয়ের দর্শন প্রয়োগ করে বলবেন—এই দ্বন্দ্বসমন্বয়ের নীতি বিশ্বব্যাপী প্রসারিত, সাহিত্যও তারই প্রকাশ। তাতে বাস্তব (সামাজিক) দৃষ্টির সঙ্গে ঘটে ব্যক্তির মানসিক বোধের দ্বন্দ্বসমন্বয়—বাস্তব ও ভাবনার দৃষ্টিতে জন্মায় শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টি (aesthetic intuition), আবার তা সার্থক হয় বিষয়বস্তুর সঙ্গে প্রকাশকলার দ্বন্দ্ব সমন্বয়ে। 'ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ, রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া'।—এমন কি, রূপায়ণ বা প্রকাশকলারও মধ্যে উপাদানের মিলন চাই, শব্দালঙ্কার ও ভাবালঙ্কারে চাই দ্বন্দ্বসমন্বয়। যে শিল্পে বা সাহিত্যে এই নানাবিধ উপকরণের ভেতরের মিলন, এবং বিষয়বস্তুর ও প্রকাশভঙ্গির সার্বিক দ্বন্দ্বসমন্বয় যত সম্পূর্ণ, সে শিল্প বা সাহিত্যসৃষ্টি তত সম্পূর্ণ, তা তত সার্থক—যাতে সার্বিক সমন্বয় যত অসম্পূর্ণ তার সৃষ্টিও ততই অসম্পূর্ণ, তার শিল্প-সার্থকতাও ততই খণ্ডিত। পৃথিবীতে সেরূপ আংশিক সার্থক সাহিত্যও কম নয়। খুব অল্প শিল্প-সাহিত্যই সমগ্র দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ। তবে মার্কস্‌বাদ কোনো শিল্প-সাহিত্যের নিদর্শনকে 'সম্পূর্ণ' বলবে না—যদি তা জীবন-সত্য ও মানব-সত্যের সঙ্গে সমাজ-সত্যের (শ্রেণী-সত্যেরও) মিলন ঘটিয়ে সম্পূর্ণতা লাভ না করে। কিন্তু যা আংশিক সার্থক তাকেও সাহিত্য বলে স্বীকার করবে,—আর বিশ্লেষণ করবে তার অসম্পূর্ণতা; ও অগ্রাহ্য করবে তার মানবমূল্য। দস্তয়েভস্কি, প্রুস্ত্‌, জয়েস্‌, সার্ত্র প্রভৃতিকে নিয়ে মার্কস্‌বাদের এই বিপদ।

সংক্ষেপে যতটা সম্ভব মার্কস্‌বাদের দৃষ্টিতে সাহিত্যবিচারের কয়েকটি দিক আলোচিত হল। মোটেই তা সম্পূর্ণ নয়, ভ্রম-প্রমাদশূন্যও নয়। কবিতা, উপন্যাস, নাটকের বিশেষ বিশেষ উপযোগিতা ও কিছু নিদর্শন নিয়ে আলোচনা করলে হয়ত বক্তব্য আরো একটু পরিষ্কার হত। কিন্তু এ পরিসরে তা আর সম্ভব নয়। শেষে একটা কথা বলতে চাই—মার্কস্‌বাদী সাহিত্যদৃষ্টিতে যে অজ্ঞতা ও উগ্রতা দেখা যায় —তার চেয়ে তার বিরোধী সমালোচনায় বিজ্ঞজনদের অজ্ঞতা ও অপটুতা অনেক সময়

কম নয়। কিন্তু বর্তমান লেখক অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনায় সমালোচনায় অনুশীলনপটুতার সঙ্গে বিপুল বিজ্ঞতার ও সেই সঙ্গে সহিষ্ণু জিজ্ঞাসার পরিচয় পেত, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সে কথাটা এখানে উল্লেখ করা অন্যায় হবে না।

বেনেদেত্তো ক্রোচে (১৮৬৬-১৯৫২)*

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

১.

ক্রোচে আধুনিক কালের একজন বড় দার্শনিক। আলোচনার সুবিধার জন্য পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক সমাজকে মোটামুটিভাবে দুই সম্প্রদায়ে ভাগ করা যাইতে পারে—ভাববাদী (Idealist) ও বস্তুবাদী (Realist)। প্রথম শ্রেণীর দার্শনিকদের মধ্যে আধুনিক কালে সবচেয়ে প্রখ্যাত নাম বোধ হয় হেগেলের। হেগেলের কথা প্রারম্ভেই উল্লেখ করা প্রয়োজন, কারণ ক্রোচের চিন্তার উপর হেগেল খুব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। অনেকে তাঁহাকে হেগেলপন্থী বলিয়া সংজ্ঞিত করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ বর্ণনা এক-দেশদর্শী হইবে এবং কেহ কেহ বলেন, হেগেলের পথে ক্রোচের দর্শনের বিচার করিলে সেই বিচারে ভুল হইবে। তাঁহার একখানি গ্রন্থের নাম : 'হেগেল দর্শনে যাহা প্রাণবন্ত এবং যাহা অবলুপ্ত' (*What is Living and What is Dead in Hegel's Philosophy*)। এই নামকরণ হইতেই বোঝা যাইবে যে, হেগেলের দ্বারা প্রভাবিত হইলেও তিনি ঠিক হেগেলপন্থী নহেন। হেগেলকে অনুসরণ করিয়া ক্রোচে চৈতন্যের কর্মময়তায় বিশ্বাস করেন। কিন্তু হেগেল দর্শন ও আর্টের মধ্যে তুলনা করিয়া দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এমন কি আর্টের সম্ভাব্য মৃত্যুর কথাও বলিয়াছেন। কিন্তু ক্রোচের মতে, ইহারা স্বতন্ত্র ; সুতরাং ইহাদের মধ্যে বড়-ছোট বিচার সম্ভব নয়।

ক্রোচে নামকরা দার্শনিক হইলেও তিনি প্রথম শ্রেণীর দার্শনিক কিনা সেই সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের কথা স্মরণ করিলেই মনে হইবে যে বের্গসঁ, উইলিয়াম জেম্‌স, বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রভৃতি তাঁহার অপেক্ষা অনেক বেশি প্রভাবশালী। রাসেল তাঁহার বহুল প্রচারিত *History of Western Thought*-গ্রন্থে তাঁহার নামোল্লেখই করেন নাই। ক্রোচের প্রাধান্য

---

* ক্রোচের মূল ইতালীয় রচনার সঙ্গে আমার পরিচয় নাই। তাঁহার প্রধান প্রধান রচনা সবই ইংরেজিতে অনূদিত হইয়াছে। আমি সেই সকল অনুবাদ অবলম্বন করিয়াই ক্রোচের শিল্প ও সাহিত্য-চিন্তার বিশ্লেষণ ও বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। মাঝে মাঝে যে সব ইংরেজি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহারা উল্লিখিত অনুবাদগ্রন্থ হইতে নেওয়া এবং তাহাদিগকেই মূল বলিয়া ধরিতে হইবে। এই সকল পারিভাষিক শব্দের যে বাংলা প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে তাঁহাদের নির্বাচনের দায়িত্ব আমার।

নন্দনতত্ত্বে এবং তাঁহার অগণিত রচনার মধ্যে ঈস্‌থেটিক-গ্রন্থই যে শীর্ষস্থানীয় সেই বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। এই গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদক ক্রোচেকে ঈস্‌থেটিক শাস্ত্রের আবিষ্কারক কলম্বস বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহা অত্যুক্তি, কিন্তু ভিত্তিহীন অত্যুক্তি নয়। আমার মনে হয় অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স-গ্রন্থের পর ইউরোপীয় নন্দনশাস্ত্রে এইরূপ সারবান্ রচনার পরিচয় পাওয়া যায় না। এই কথাটাই জনৈক রসবেত্তা অন্যভাবে আমাকে বলিয়াছিলেন। ১৯৫২ সালে ক্রোচে যখন লোকান্তরিত হইলেন, তখন তিনি মন্তব্য করিয়াছিলেন, 'ভাবিলে অবাক্ হইতে হয় যে ক্রোচে আমাদের শতাব্দীরই লোক ছিলেন। সাহিত্যালোচনার সময় এই বিভ্রম সঞ্চারিত হয় যে, তিনি প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের সমসাময়িক।'

২.

দার্শনিকদের মধ্যে অনেকেই সমস্ত বৈচিত্র্য এক সূত্রে গাঁথিয়া জগৎপ্রপঞ্চের ব্যাখ্যা করেন। বিশেষ করিয়া ভাববাদী দার্শনিকরা এই চেষ্টা করিয়াছেন। ক্রোচের দর্শনকে বলা যাইতে পারে, অ্যাব্‌সল্যুট আইডিয়ালিজম্ বা সার্বিক ভাববাদ; কাজেই তিনিও যে এই পথের পথিক হইবেন তাহা ধরিয়াই লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঈস্‌থেটিক বা নন্দনতত্ত্ব-আলোচনায় ক্রোচের প্রধান কৃতিত্ব পৃথকীকরণ; যে প্রতিভার বলে কবি ও শিল্পী সৃষ্টি করেন তিনি তাহাকে অন্য সকল শক্তি ও বৃত্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিয়াছেন। কাব্য ও শিল্পের রূপ ও বিষয়বস্তু ঠিক কি তাহা অপেক্ষা ইহা ঠিক কি নয় সেই লক্ষণ নির্ণয়ই তাঁহার প্রধান অবদান। এই শাস্ত্রে তাঁহার আলোচনা খুব সূক্ষ্ম অথচ স্পষ্ট, মার্জিত; ইহা পরিচ্ছিন্ন বলিয়াই পরিচ্ছন্ন। তাঁহার পন্থা অনুসরণ করিয়াই একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে তাঁহার মতবাদ ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব।

বাঙ্গালী পাঠকমাত্রই রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতার সঙ্গে পরিচিত আছেন। নীচে তাহার দুই স্তবক উদ্ধৃত করিতেছি:

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা ধান-কাটা হল সারা,
ভরা নদী ক্ষুরধারা খরপরশা।
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা॥

একখানি ছোটো খেত, আমি একেলা,
চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।
পরপারে দেখি আঁকা তরুছায়ামসীমাখা,
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা প্রভাতবেলা।
এ পারেতে ছোটো খেত, আমি একেলা॥

—এই কবিতাটি যে খুব ভাল কবিতা তাহা এখন সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু ইহার তাৎপর্য ও কাব্যসৌন্দর্য লইয়া অনেক বিতর্ক হইয়াছে এবং সেই বিতর্কের এখনও পরিসমাপ্তি হয় নাই। এই কবিতার মধ্যে কি আছে, তাহার পূর্বে বলিতে হইবে ইহার মধ্যে কি নাই।

(ক) প্রথম কথা, ইহা বাস্তব জীবনের ছবি নহে। বহুদিন পূর্বে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় আপত্তি তুলিয়াছিলেন, বর্ষাকালে ধান কাটা হয় না; যে ক্ষেতের চার দিকে জল তাহা চর, চরে ধান হয় না এবং বর্ষাকালে তাহা জলে ডুবিয়া যায়। তরুছায়ামসী-মাখা গ্রামখানির চিত্রও স্ববিরোধী, কারণ মেঘেঢাকা গ্রামে তরুর ছায়া হয় না, আর ওপার হইতে তাহা দেখাও যাইবে না। দ্বিজেন্দ্রলালের আপত্তি সত্ত্বেও ইহা উৎকৃষ্ট কবিতা অথচ দ্বিজেন্দ্রলালের আপত্তিও অখণ্ডনীয়। ইহা স্পষ্ট যে, কবি যাহা লিখিয়াছেন তাহা কোন বাস্তব ঘটনার বিবরণ নহে, সুতরাং ইহা ইতিহাসের অঙ্গ নহে। ইহা ইতিহাসের অনুকরণও নয়, কারণ বাস্তবে এইরূপ ব্যাপার সম্ভবই নয়।

(খ) কবি যাহা লিখিয়াছেন তাহা দর্শনও নয়। অনেকে এই কবিতার দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন, কবি নিজেই ইহার মর্মার্থ বুঝাইতে চাহিয়াছেন এবং তাঁহার সেই ব্যাখ্যাও দর্শনঘেঁষা। কিন্তু প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে, তত্ত্বকথা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে, অথচ কাব্য প্রমাণশাস্ত্র নহে। যদি তত্ত্বকথা বলাই কাব্যের উদ্দেশ্য হইত, তবে কবি কাব্যের কুহেলিকাচ্ছন্ন রাজ্য ছাড়িয়া যুক্তিতর্কের রাজপথ ধরিতেন। যদি বলা যায় যে, গূঢ় তত্ত্বকথাকে সুন্দর সাজে সজ্জিত করাই কাব্যের কাজ, তাহা হইলে প্রশ্ন থাকিয়া যাইবে, কাব্যের কাব্যত্ব কোথায়—তত্ত্বকথায় না বাহিরের আভরণে, যদি তত্ত্ব-কথায় কাব্যত্ব থাকিত, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যুক্তিতর্কের দ্বারা অপ্রমাণিত তত্ত্বকথার মূল্য সামান্যই। আর যদি বহিরঙ্গের আভরণই সৌন্দর্যের উৎস হয়, তাহা হইলে আমাদের প্রাথমিক প্রতিজ্ঞাই সমর্থিত হইল—কাব্য তত্ত্বকথা বা দর্শন নহে। আলোচ্য কবিতাটি সম্পর্কে বলা যাইতে পারে, ইহাকে তত্ত্বকথার বাহন মনে করা হইয়াছে বলিয়াই প্রধানত ইহার বিরুদ্ধে অস্পষ্টতার অভিযোগ আনা হইয়াছে।

(গ) যদি বলা হয় যে, কাব্যের ছবিগুলি কোন গুহাহিত, রহস্যময় ভাবের দ্যোতক তাহা হইলেও ঠিক হইবে না। ক্রোচের মতে রূপের আড়ালে কোন রূপক থাকিতে পারে না। আমার জনৈক ক্রোচেপন্থী অধ্যাপক বলিতেন, 'The substance of a poem is the poem itself'। যাঁহারা কাব্যের symbolist বা রূপকাশ্রিত ব্যাখ্যা দেন, তাঁহারা বস্তুত কাব্যকে বিজ্ঞানের সামিল করিয়া দেখেন। জ্যামিতিতে ও অন্যান্য বিজ্ঞানে কোন কিছু বুঝাইতে হইলে ছবির প্রয়োগ করা হয়। একটি ছবি—যেমন কোন ত্রিভুজ—ত্রিভুজত্ব প্রভৃতি general বা সামান্য তত্ত্বের প্রতীক। কিন্তু কাব্যে ব্যক্তির ছবি ও নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্ব অন্যোন্যাশ্রয়।

(ঘ) কেহ কেহ কাব্যের মিষ্টিক ব্যাখ্যা দিয়া বলেন, কাব্য রহস্যময়, অনির্বচনীয়, অবাঙ্‌মানসগোচর। শব্দ তাহার আভাস দিতে পারে, কিন্তু তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথও এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং প্রাচীন আলংকারিক-দিগকে এই মতের সমর্থক বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠ আলংকারিক আনন্দবর্ধন ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছেন যে, অন্তত 'অনির্বচনীয়' শব্দের দ্বারা রস বাচ্য। রবীন্দ্রনাথও অজস্র রচনার সাহায্যে কাব্যের অনির্বচনীয়তার ব্যাখ্যা দিয়াছেন। কথিত আছে, চল্লিশ ভল্যুমে মিষ্টিক কার্লাইল নীরবতার বাণী প্রচার করিয়াছেন! ক্রোচের মতে, মিষ্টিকরা প্রকৃতপক্ষে ভাষার শক্তিতে অবিশ্বাসী, তাহারা কর্মবাদী, নৈঃশব্দের প্রবক্তা। তাই তাঁহারা কাব্যসমালোচনায় অনধিকারী, কারণ কাব্যের প্রাণ ভাষা, ভাষার শক্তিতে বিশ্বাস রাখেন বলিয়াই কবি কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন।

(ঙ) শিল্প ও কাব্যের সঙ্গে কর্মজগতের সম্পর্ক নাই বলিয়া ইহারা নীতিশিক্ষা দেয় না। আমেরিকায় 'টমকাকার কুটীর'-উপন্যাস দাসব্যবসায় উৎসাদিত করিতে সাহায্য করিয়াছিল এবং আমাদের দেশে বিপ্লবীরা আনন্দমঠ হইতে প্রেরণা পাইয়াছিলেন। পুরাকাল হইতে নীতিশিক্ষার জন্য সাহিত্য রচিত হইয়াছে এবং সর্বকালে পাঠক-সম্প্রদায় সাহিত্যে নীতির সন্ধান করিয়াছে। কিন্তু—রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—কাব্য ও শিল্পের সঙ্গে প্রয়োজনের জগতের কোন সম্পর্ক নাই। ক্রোচের মতে, দর্শন ও আর্টে জ্ঞানার্জনী বৃত্তি ক্রিয়াশীল, কর্মজগৎ জ্ঞানের উপরে নির্ভর করে, কিন্তু জ্ঞানার্জনী বৃত্তি তত্ত্বজগতের বা থিওরির বাহিরে দৃষ্টি দেয় না।

(চ) আর্ট এক ধরনের জ্ঞান, কিন্তু তাহা বিজ্ঞান নহে। বিজ্ঞান বস্তুজগৎকে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে তাহার সূত্র রচনা করে। ইহার পদ্ধতি হইল ব্যবচ্ছেদ ও বিশ্লেষণের পদ্ধতি। তাই স্থূল পদার্থ লইয়া কারবার করিলেও এবং ব্যবহারিক জীবনে বৈজ্ঞানিক তথ্যের বহুল প্রয়োগ থাকিলেও বিজ্ঞান অবচ্ছিন্ন বা অ্যাবষ্ট্রাক্ট

অর্থাৎ আংশিকতাদোষদুষ্ট। শিল্প ও কাব্য কংক্রীট ; ইহাদের প্রধান গুণ সমগ্রতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা।

(ছ) আর্ট বিজ্ঞান নয়, দর্শন নয়, নীতিশাস্ত্র নয়, তবে কি ইহা খেয়ালী কল্পনার স্বচ্ছন্দ বিলাস ? কিন্তু তাহাও ঠিক নয়। খেয়ালী কল্পনা (fancy) বৈচিত্র্যের সন্ধানে ছবির পর ছবি আঁকিয়া যায়, সেই ছবিগুলি হাল্‌কা মেঘের মতো উড়িয়া বেড়ায়। কিন্তু আর্টের প্রধান গুণ সংসক্তি ; ইহার বিভিন্ন অংশ দৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ। আর্ট কল্পনার লীলা হইতে পারে, কিন্তু কল্পনার খেলা নয়। আলোচ্য কবিতা কতকগুলি ছবির সমষ্টি, কিন্তু তাহাদের দৃঢ় সংসক্তিও অনস্বীকার্য।

(জ) সাহিত্য ও শিল্প আনন্দবিধানের জন্য সৃষ্ট হয়, এই মত সাধারণ্যে প্রচলিত হইয়াছে এবং আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথের রচনায় এই মত খুব জোরাল অভিব্যক্তি পাইয়াছে। যে কোন শিল্পকর্ম হইতে আমরা আনন্দ পাই, কিন্তু আনন্দ শিল্পসৃষ্টির বা রসোপলব্ধির অনুষঙ্গমাত্র, তাহার সংজ্ঞা নহে। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে যাহা কিছু আনন্দ দান করিত তাহাই শিল্পের লক্ষণাক্রান্ত হইত। কর্মী কর্মে আনন্দ পান, বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানে আনন্দ পান, খেলোয়াড় ও দর্শক খেলিয়া ও খেলা দেখিয়া চমৎকৃত হন, মাতা পুত্রলাভ করিয়া আনন্দ পান। এইসব আনন্দের সঙ্গে কাব্যানন্দের কোন মৌলিক সাদৃশ্য নাই। সুতরাং আনন্দরূপম্ যদ্বিভাতি বলিলে আর্টের সংজ্ঞা দেওয়া হইবে না।

(ঝ) সচরাচর বলা হইয়া থাকে, কাব্য ও শিল্প ভাবের বা অনুভূতির প্রকাশ, কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে, ইহাও ঠিক নয়। যাহার ধান অপরে লইয়া গিয়াছে, যে নির্জন চরে পরিত্যক্ত হইয়াছে, সে হা হুতাশ করে, ছন্দোবদ্ধ ভাষায় প্রকৃতির রূপ বর্ণনা করে না। কামমোহিত ক্রৌঞ্চ চীৎকার করিয়া প্রিয়বিয়োগব্যথা প্রকাশ করিয়া থাকিবে, অনুষ্টুপ ছন্দে কাব্য রচনা করে নাই। আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন যে, বাল্মীকির কাব্যে শোক শ্লোকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, শোক প্রকাশিত হইয়াছে এমন কথা বলেন নাই। একটি বিশেষ বা উপচরিত অর্থেই বলা যাইতে পারে, আর্ট ভাবের অভিব্যক্তি।

৩.

এই উপচরিত অর্থের মধ্যেই ক্রোচের নন্দনতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য নিহিত আছে। ক্রোচে ঈসথেটিককে বলিয়াছেন অভিব্যক্তিতত্ত্ব (science of expression) এবং তিনি বলিয়াছেন ঈসথেটিক বা linguistic বা ভাষাতত্ত্বের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

আমাদের মনে যখন অনুভূতি বা সংবেদন (sensation) সঞ্চারিত হয় তখন সেগুলি থাকে অস্পষ্ট এবং আমরা তাহাদের দ্বারা নিপীড়িত, অভিভূত, আচ্ছন্ন বোধ করি। এই অবস্থায় আমাদের চৈতন্য থাকে নিষ্ক্রিয়, কিন্তু সে পরিপূর্ণরূপে জাগ্রত হইয়া এই অস্ফুট, এলোমেলো অনুভব ও সংবেদনের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া তাহাদিগকে সংহত করে এবং স্পষ্ট রূপ দান করে। ক্রোচের মতে ইহাই অভিব্যক্তি বা expression ; ক্রোচের দর্শনে ইহার পারিভাষিক নাম ইন্‌টুইশন বা প্রতীতি, কারণ এই প্রক্রিয়া জ্ঞানাত্মিকা। আমাদের প্রাচ্য সাহিত্যচিন্তায়ও ইহার অনুরূপ পরিকল্পনা আছে। অভিনব গুপ্ত প্রভৃতি বলেন, আমাদের চৈতন্য নানা অবান্তর বস্তুতে আবৃত থাকে ; কবি সেই আবরণ উন্মোচিত করিয়া চৈতন্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেন। তাই রসপ্রতীতিকে তাঁহারা বলিয়াছেন 'ভগ্নাবরণা চিৎ'।

আইডিয়ালিষ্ট দার্শনিকদের মতো ক্রোচে চৈতন্যকে একমাত্র সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু তিনি ইহার মধ্যে চারটি সুনির্দিষ্ট কক্ষ্যা দেখিতে পাইয়াছেন। ইহাদের পার্থক্যনির্ণয়ই তাঁহার মতবাদের গোড়ার কথা ; এইজন্য অনেকে তাঁহার দর্শনের নাম দিয়াছেন philosophy of distincts বা স্বতন্ত্রতাবাদ। চৈতন্যের ক্রিয়াকে মোটামুটিভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে— জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ। কর্ম জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল ; আমরা অনেক সময় এমন সব কর্মচঞ্চল লোক দেখি যাহারা কোন কিছু চিন্তা না করিয়া কর্মে ঝাঁপাইয়া পড়ে। কিন্তু এইসব হঠকারী ব্যক্তিও সাময়িক ভাবনার উপর নির্ভর করিয়াই কর্মে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদের চিন্তা সুশৃঙ্খল নয়, কিন্তু চিন্তার অভাবে কোন কর্ম হয় না। অনেক সময় দেখা যায় যে,খুব ধীর স্থির, চিন্তাশীল লোক হঠাৎ এমন কাজ করিয়া ফেলে যাহার সঙ্গে তাহাদের চিন্তাধারার সংযোগ নাই ; তাহারা নিজেরাই বলিবে, না ভাবিয়া তাহারা হঠাৎ এই কাজ করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু আকস্মিক কাজের অন্তরালে আকস্মিক চিন্তা থাকে। এমনও হইতে পারে যে এই চিন্তা মনের কোণে আত্মগোপন করিয়া ছিল, হঠাৎ কর্মে রূপান্তরিত হইয়াছে।

কর্মযোগের কথা ছাড়িয়া দিয়া জ্ঞানযোগের কথা বলা যাক্, কারণ ক্রোচের মতে কবিপ্রতিভা জ্ঞানার্জনী বৃত্তি। চৈতন্য যে শক্তির দ্বারা অস্পষ্ট, হালকা মেঘের মতো সঞ্চরণশীল, বিক্ষিপ্ত, বিশৃঙ্খল অনুভব ও সংবেদনকে সংসক্ত করিয়া রূপ দান করে তাহা স্বয়ংক্রিয় ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। অনুভব ও সংবেদন ইহার বিষয়বস্তু, সেই হিসাবে ইহা স্থূল, কংক্রীট ; ইহা বহুকে সংহত করিয়া সমগ্রতা দান করে, সেই হিসাবেও ইহা কংক্রীট। ইউরোপীয় নন্দনতত্ত্বের একটা বড় সমস্যা বিষয়বস্তু (content) এবং রূপের বা

ফর্মের দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়। ক্রোচে এই সমস্যার এক সরল সমাধান দিয়াছেন। অস্পষ্ট, রূপহীন অনুভব ও সংবেদন না থাকিলে চৈতন্য কিসের প্রতীতি লাভ করিবে? কিন্তু ইহারা যখন রূপের অন্তর্গত হইল তখন ইহাদের আর কোন স্বাতন্ত্র্য রহিল না। সুতরাং form-ই সর্বময় প্রভু, কিন্তু বিষয়বস্তু না থাকিলে যে চৈতন্য form দান করে তাহা ক্রিয়াশীল হইবে না। বিষয়বস্তুর মধ্য দিয়াই রূপ রূপত্ব লাভ করে। তাই শিল্পে বিষয়বস্তু (content) ও রূপ (form) অভিন্ন।

অনুভূতি ও সংবেদন (sensation) প্রভৃতির রূপদানই শিল্প ; এই অর্থেই কবির ইন্‌টুইশনকে অভিব্যক্তি বলা যাইতে পারে। এই অভিব্যক্তি আর ব্যবহারিক জীবনের ভাবপ্রকাশ এক বস্তু নহে। প্রিয়জনের বিয়োগে অনেকেই আচ্ছন্ন, অভিভূত হন ; মাতা সন্তানের শোকে উন্মাদিনী হন, যে স্ত্রী স্বেচ্ছায় সহমরণে গিয়াছেন বাল্মীকি ক্রৌঞ্চনিধনে তাহা অপেক্ষা বেশি শোক পাইয়াছিলেন এমন কথা কেহ বলিবে না। পার্থক্য এই যে, কবি অনুভূতির দ্বারা আচ্ছন্ন হন না, তাঁহার চৈতন্য অনুভূতির উপর স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া ইহাকে রূপ দিতে পারেন। সেই রূপের মধ্যে অনুভূতি এমন ভাবে মিশিয়া মিলাইয়া যায় যে তাহাকে আর পৃথক্‌ করিয়া দেখা যায় না। রূপের অন্তরালে রূপের কোন বিষয়বস্তু আছে এমন মনে হয় না। কবি ম্যালার্মের শিল্পী বন্ধু দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার মনে খুব ভাল ভাল ভাবের সঞ্চার হয়, কিন্তু সেই সকল আইডিয়া তিনি ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন না। তদুত্তরে ম্যালার্মে লিখিয়াছিলেন, কাব্য শব্দের দ্বারা লিখিত হয়, ভাবের দ্বারা নয়। ম্যালার্মের উত্তর অর্ধসত্য। কাব্য শব্দের দ্বারাও লিখিত হয় না, ভাবের দ্বারাও লিখিত হয় না। ভাব যখন ভাষার মধ্যে মিশিয়া যাইয়া সংহত রূপ লাভ করে তখনই কাব্যের সৃষ্টি হয়।

ম্যালার্মের বন্ধু ছিলেন শিল্পী। তিনি ভাষার দৈন্যের জন্য আক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই আক্ষেপও অনর্থক, কারণ ভাষা হইল একই সঙ্গে শিল্পের দেহ ও প্রাণ। তাহা অর্থবহ শব্দও হইতে পারে, বা অন্য কিছুও হইতে পারে—অর্থহীন-শব্দ (সঙ্গীত), রংতুলি (চিত্রশিল্প), মৃত্তিকা ও পাথর (ভাস্কর্য) ইত্যাদি। অ্যারিষ্টটল ও তৎপরবর্তী লেখকেরা এইসব মালমশলাকে শিল্পসৃষ্টির বাহন বা উপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, আমাদের দেশের আলংকারিকেরা কাব্যের দেহ ও আত্মার মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন। কিন্তু ক্রোচের নন্দনতত্ত্বে শিল্পে উপায় ও উপেয়, দেহ ও আত্মার মধ্যে কোন পার্থক্যের স্থান নাই। অস্পষ্ট অনুভব ও ভাবনা না থাকিলে রূপের অভ্যাগমের কোন অবকাশ থাকে না আর অস্ফুট ভাবনা মূর্তি গ্রহণ করিয়াই চৈতন্যলোকে প্রবেশ করে। কাব্যের

দেহ ও আত্মা, ভাষা ও ভাব—এই যে সম্বন্ধকারক ও ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ সকল দেশ ও সকল কালে করা হইয়াছে, ক্রোচে ইহাকে নস্যাৎ করিয়া দিয়াছেন। নন্দনতত্ত্বের আলোচনায় ইহা তাঁহার প্রধান কৃতিত্ব। কাব্য কোন কিছুর প্রকাশ করে না, দীপশিখা ও আলোক একই বস্তু।

৪.

প্রতীতি কংক্রীট, প্রাণবান্ মূর্তি; অর্থাৎ ইহা রূপবিশিষ্ট, একক ব্যক্তিত্বসমন্বিত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সমগ্র। ইহার মধ্যে হয়ত নানা ভাব ও ভাবনা একত্রিত হইয়াছে, কিন্তু ঐক্যবোধের প্রেরণায় তাহাদের বিচ্ছিন্নতা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই নিবিড় সংসক্তি ও সর্বব্যাপী সমগ্রতার জন্য বিচার ও সমালোচনার সাহায্যে ইহার স্বরূপ নির্দেশ করা কাব্যের অনুবাদ করার মতোই কঠিন। রসপ্রতীতি যখন জাগ্রত হয় তখন পর্যন্ত বিচারবুদ্ধি সুপ্ত থাকে। এক মূর্ত প্রতীতির সঙ্গে আর এক মূর্ত প্রতীতির মধ্যে সম্বন্ধ নির্দেশ করিতে যাইয়াই বুদ্ধিবৃত্তি উন্মেষিত হয়; ইহার স্থান চৈতন্যলোকের দ্বিতীয় কক্ষ্যায়। এইবার ইহার লক্ষণ বিচার করা যাক্। যেহেতু ইহা বহু ব্যক্তির মধ্যে একটি লক্ষণ ভিত্তি করিয়া সম্পর্ক নির্দেশ করে সেইজন্য ইহা অ্যাবষ্ট্রাক্ট, অবচ্ছিন্ন, অমূর্ত আইডিয়া, ইহার কোন রূপ নাই। ইহা একটি মানসিক ধারণা বা কনসেপ্ট (concept)। এই কনসেপ্ট একটি সামান্য লক্ষণ; ইহা বহু ব্যক্তির সকলের মধ্যে আছে, আবার অন্য বহু ব্যক্তির মধ্যে নাই। যেমন, যদি বলি দেবদত্ত অমর নহে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে দেবদত্তের মধ্যে এমন একটি লক্ষণ আছে যাহা তাহাকে মরণশীল প্রাণিজগতের সামিল করে এবং দেবতাদের মতো অমর শ্রেণী হইতে তাহার পার্থক্য সূচিত করে। ইহার মধ্যে দেবদত্তের সমগ্র ব্যক্তিত্বকে পাওয়া যায় না, তাহার শ্রেণীগত লক্ষণের ধারণা করা যায়। এইজন্যই ইহা abstract universal, অবচ্ছিন্ন ও সর্বসাধারণপ্রযোজ্য সামান্য লক্ষণ, ব্যক্তিস্বরূপ নহে।

ইন্‌টুইশন বা প্রতীতি শুধু রূপ সৃষ্টি করে, সত্যাসত্য বিচার করে না, বাস্তব-অবাস্তবের ধার ধারে না। সেই বিচারের ভার বুদ্ধির উপর, যে বুদ্ধি বিশ্লেষণ করে, প্রমাণ করে, সাধারণ সূত্রের আবিষ্কার করে। ইন্‌টুইশন বা রূপসৃষ্টির মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির অনুপ্রবেশের কোন স্থান নাই, কিন্তু বহু ইন্‌টুইশনকে একত্র করিয়া, পরীক্ষা করিয়াই বুদ্ধিবৃত্তি সাধারণ সূত্র বাহির করে। ইহা সত্য যে প্লেটো হইতে আরম্ভ করিয়া বের্গসঁ পর্যন্ত বহু দার্শনিকের রচনায় কাব্যশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে তাঁহাদের মতবাদের সার্থকতার বিচার হইবে যুক্তিতর্কের মানদণ্ডে। কবিকল্পনার

প্রাচুর্য একটা উপরি পাওনা মাত্র, অনেক ক্ষেত্রে তর্ককে ভারাক্রান্ত ও সিদ্ধান্তকে ঝাপসা করে বলিয়া এই কবিয়ানা দার্শনিকের অপরাধ বলিয়াও গণ্য হয়। দর্শন ইন্‌টুইশনের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও দর্শনে কাব্যের অনুপ্রবেশ সচরাচর দৃষ্ট হয় না এবং ইহাকে সহজে বিচ্ছিন্ন করা যায়। কিন্তু কাব্যের মধ্যে দার্শনিক মতবাদ ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। লুক্রেসিউসের কাব্যকে এপিকিউরাসের দার্শনিক মতের ছন্দোময় রূপান্তর বলিয়া মনে হয়, দান্তের কাব্যে ক্যাথলিক তত্ত্বকথা, বিশেষ করিয়া সেণ্ট টমাস অ্যাকুইনাসের মতবাদ জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেশে বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, সীতারাম, দেবীচৌধুরানীতে প্রচারই মুখ্য, রবীন্দ্রনাথের গোরা, ঘরে বাইরে তর্কবহুল উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, এই সমস্ত গ্রন্থে দেখিতে হইবে তর্ক জায়গা পাইয়াছে, না জায়গা জুড়িয়াছে। কথাটা অস্পষ্ট এবং এইভাবে দেখিতে গেলে আসল প্রশ্নটা এড়াইয়া যাওয়া হইবে। হ্যামলেট, কিং লীয়র প্রভৃতি নাটকের জীবনজিজ্ঞাসা বাদ দিলে উহাদের মধ্যে হানাহানি, মারামারি ছাড়া আর কিছুই থাকিবে না, ইবসেন ও বার্ণার্ড শ'য়ের নাটকে সমস্যার আলোচনাই প্রাণ, তাহারা শুধুমাত্র জায়গা পাইয়াছে বলিলে এইসব রচনার মূল্যায়ন হইবে না। খুব খোলাখুলিভাবে না হইলেও, সমস্ত কাব্যসাহিত্যই জীবনবেদের দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং তাহাকে বাদ দিয়া অথবা ছোট করিয়া দেখিলে সাহিত্যের পরিচয়ই বিঘ্নিত হইবে। অথচ জীবনজিজ্ঞাসাকে প্রাধান্য দিলে সাহিত্য দর্শনেরই অঙ্গীভূত হইবে, তাহার স্বাতন্ত্র্য থাকিবে না; আবার ইহা দর্শনের মর্যাদাও পাইতে পা'ব না, কারণ সাহিত্য প্রমাণশাস্ত্র নহে।

এই সমস্যার ক্রোচে যে সমাধান দিয়াছেন তাহা ত্রুটিমুক্ত না হইলেও প্রণিধান-যোগ্য। তিনি মনে করেন, সাহিত্যে যে সকল দার্শনিক তথ্য থাকে তাহা প্রাথমিক অনুভব, সংবেদনের পর্যায়ে পরিণত হয়, তাহাদের দার্শনিক তাৎপর্য আচ্ছাদিত হইয়া যায় এবং তাহারা সৃষ্ট চরিত্রের অঙ্গ হইয়া যায়। সমগ্র গ্রন্থটির মধ্যেও একটি বিশেষ ভাব বা অনুভূতি রূপ লাভ করে এবং সেই অর্থে সমস্ত রকমের সাহিত্য—এবং প্রসারিত অর্থে সমস্ত শিল্পকর্মই এক একটি লিরিক। ক্রোচে মনে করেন, 'The whole is that which determines the quality of the parts'—সমগ্র বস্তুর দ্বারা অংশের গুণাগুণ নির্ধারিত হইবে। যেহেতু হ্যামলেট বা ডিভাইনা কমেডিয়া সাহিত্য অর্থাৎ রূপসৃষ্টি বা প্রতীতি, সেইজন্য ইহার ভিতরকার সব কিছুই—তত্ত্ব, ইতিহাস, অনুভূতি—এই বৈশিষ্ট্যের দ্বারা প্রভাবিত হইবে। শুধু প্রভাবিত বলিলে কম বলা হইবে, এইসব উপাদান রূপেরই অঙ্গ হইবে।

কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে কথাটা আরও স্পষ্ট করা যাইতে পারে। পৃথিবীতে

বহু সুন্দর বস্তু আছে, বহু কুৎসিত বস্তুও আছে। আমাদের মনে সৌন্দর্য ও কুশ্রীতার ধারণা বা কন্‌সেপ্টও আছে; এই কনসেপ্ট অমূর্ত, সাধারণ লক্ষণ, আবার সৌন্দর্য-বিশিষ্ট সুন্দর বস্তু এবং কুশ্রীতার প্রতিমূর্তি কুৎসিত বস্তুও আছে। আমরা এমন বস্তুরও ধারণা করিতে পারি, যাহার প্রতিরূপ বাস্তব জীবনে নাই। যেমন খাঁটি জ্যামিতিক সরল রেখা বাস্তবে সম্ভবে না, অথচ আমরা ত্রিভুজত্বের ধারণা করিয়া থাকি। শিল্পজগতে বাস্তব-অবাস্তব, সত্যাসত্যের প্রশ্ন অবান্তর, আবার শিল্প ও সাহিত্য অলীক কাল্পনিক সৃষ্টি এমন কথাও বলা চলিবে না। অলীক ও বাস্তব—তথা সুন্দর ও কুৎসিত—এই বিরোধই আর্টের জগতে নাই। ইহা শুধু রূপ সৃষ্টি করে, ইহাই তাহার একমাত্র পরিচয়। এই জগতে ম্যাকবেথ এবং ডাইনীবুড়ি ও ব্যাংকোর প্রেতাত্মা সমান সত্য এবং ইয়াগো ও ডেসডিমোনা সমান সুন্দর; ইয়াগো ডেসডিমোনা অপেক্ষা বেশি সুন্দর, কারণ বেশি জটিল ও বিস্তৃত।

জ্ঞানজগতে চৈতন্যের যে দুই কক্ষ্যা আছে, তাহার একটি প্রতীতি (ইন্‌টুইশন) বা একের উপলব্ধি, তাহা সৃষ্টি করে শিল্প, সঙ্গীত, সাহিত্য। আর দ্বিতীয় কক্ষ্যায় থাকে বুদ্ধি, যাহা এককে বহুর সঙ্গে যুক্ত করিয়া সাধারণ সূত্র রচনা করে। ইহা ছাড়া কোন তৃতীয় কক্ষ্যা নাই। তবে এই কক্ষ্যার মধ্য পথে রহিয়াছে ইতিহাস যেখানে উভয় বৃত্তিই ক্রিয়াশীল। ইতিহাস ব্যক্তির কাহিনী ও চিত্র—অশোক, আলেকজাণ্ডার, রেনেসাঁস, ফরাসী বিপ্লব ইত্যাদি। এইজন্য ইহা কংক্রীট, রূপময়। আমরা ইতিহাসের নিয়ম, সূত্র প্রভৃতি আবিষ্কার করি, কিন্তু সেইসব সূত্র একেবারেই আপেক্ষিক, তাহাদের কোন দার্শনিক মূল্য নাই। তবে এক দিক দিয়া ইতিহাস দর্শনের পর্যায়ে পড়ে। ইহার নাম (ইতি+হ+আস) হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে ইহা বাস্তবের কাহিনী, যাহা ঘটিয়াছে তাহার বিবরণ। ইহার মধ্যে যে সকল বিচ্ছিন্ন, স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যক্তির চিত্র পাওয়া যায় তাহারা সবাই এক সামান্য সত্য বা সর্বব্যাপী দার্শনিক সত্যের অন্তর্ভুক্ত—ইহারা ঘটমান জগতের অঙ্গ। এই সত্যাসত্য, বাস্তব-অবাস্তব বোধের সঙ্গে আর্টের সম্পর্ক নাই।*

---

* ক্রোচে এই মত ঈস্‌থেটিক গ্রন্থে প্রচার করিয়াছিলেন। পরে এই মতের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া ইতিহাসকে দর্শনের অঙ্গীভূত করেন। তাঁহার পরবর্তী মতে, প্রত্যেক judgement বা সিদ্ধান্তই ব্যক্তি-বিশেষ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত বলিয়া নির্দেশিত হয়; এইভাবে দেখিতে গেলে দর্শন ও ইতিহাস অভিন্ন হইয়া পড়ে। এই মতের বিস্তারিত আলোচনা এইখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম না। এই প্রবন্ধে ক্রোচের দর্শনের যে বিবরণ দিলাম তাহাও খুব সংক্ষেপিত, তবে আশা করি বিকৃত নয়। এই সকল প্রশ্নের বিশদ আলোচনার জন্য ক্রোচের লজিক-গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৫.

ক্রোচে ভাববাদী (idealist) দার্শনিক। সুতরাং তিনি বস্তুজগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে বস্তুজগৎ চৈতন্যেরই রচনা (construction) এবং এইখানে চৈতন্যের ব্যবহারিক বৃত্তি ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে। এইখানেও চৈতন্যের দুইটি—তৃতীয় ও চতুর্থ—কক্ষ্যা আছে। ব্যবহারিক জগতে চৈতন্য প্রথমে ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হয়; ইহার নাম দেওয়া যাইতে পারে ইকনমিক কর্ম। ইহার পরে আসে নৈতিক চেতনা যাহা বহুর স্বার্থচেতনার মধ্যে সমন্বয় করিয়া সার্বজনীন মঙ্গলের সন্ধান করে। ইহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ ইন্‌টুইশন বা প্রতীতির সঙ্গে বিচারবুদ্ধির সম্বন্ধের অনুরূপ। উভয়ত্র বিশেষ হইতে নির্বিশেষে, ব্যক্তি হইতে সাধারণ্যে আরোহণ করিতে হয়। ব্যক্তির স্বীয় স্বার্থজড়িত কর্মচেতনা হইতে সর্বার্থসাধিকা কর্মচেতনা বা নীতিবোধের উদ্ভব হয়। সকলের মধ্যে আমিও আছি, সুতরাং সকলের স্বার্থসংরক্ষণের মধ্যেই আমার ব্যক্তিগত স্বার্থ বিলীন হইয়া পরিপূর্ণতা লাভ করিবে। এই বোধের মধ্যেই চিত্তের পরিপূর্ণ স্ফূর্তি বা স্বাধীনতা। জ্ঞান না হইলে কর্মচেতনার উদ্ভব হইতে পারে না; জগৎকে জানার পরই তো তাহার পরিবর্তন সাধন করিবার প্রবৃত্তি জাগ্রত হইতে পারে। কিন্তু শুধু জানার মধ্যে কর্মপ্রবৃত্তি নাও থাকিতে পারে।

চৈতন্যের প্রথম কক্ষ্যায় থাকে শিল্পসৃষ্টির প্রবৃত্তি এবং শেষের কক্ষ্যায় থাকে নীতিবোধ। সুতরাং ইহাদের মধ্যে—মূলত জ্ঞানার্জনী ও কর্মৈষণার মধ্যে—দুস্তর ব্যবধান। সেইজন্যই শিল্পকর্ম সম্পূর্ণরূপে নীতিবোধের এক্তিয়ারের বাহিরে। শিল্প ও সাহিত্য হইতে আমরা আনন্দ পাইতে পারি, ইহা আমাদের মঙ্গলবুদ্ধিকে জাগ্রত করিতে পারে অথবা আমাদিগকে পাপের পথে অগ্রসর করিতে পারে। কিন্তু ইহা রসবোধের অনুষঙ্গ মাত্র, তাহার স্বরূপের সঙ্গে এই সকল ব্যাপারের কোন সম্পর্ক নাই। এই সকল আলোচনা রূপলোকে ব্যবহারিক জীবনের অনধিকার প্রবেশের পরিচয় দেয়।

ক্রোচের মতে, অন্য এক ভাবেও বাহিরের বস্তুজগৎ শিল্পালোচনায় অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে এবং ক্রোচেদর্শনের ইহাই সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত বিষয়। ক্রোচে মনে করেন শিল্পীর চেতনায় যখন কোন ভাব ও ভাবনা রূপ গ্রহণ করিল তখনই শিল্পকর্ম পরিসমাপ্ত হইল; সেই শিল্প বাহিরের কোন উপকরণ বা মালমশলা ছাড়াই কবির চিত্তে প্রতিভাসিত হয়। ইহার পর শিল্পী কোন কোন সৃষ্টিকে বাহিরের জগতে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিতে পারেন। এখানে ব্যবহারিক জগতের প্রেরণা আসিয়া পড়িল এবং বাস্তব জগতে যে উপকরণ গ্রহণযোগ্য হইবে, যাহা তাঁহার পক্ষে বেশি উপযোগী

হইবে এইরূপ উপকরণ গ্রহণ করিয়া চৈতন্যে যে বিশুদ্ধ রূপ জাগ্রত হইয়াছিল তাহাকে তিনি বাহিরে প্রকাশ করেন। যে কাব্য তিনি এখন রচনা করেন তাহা অংশত ইন্‌টুইশনের প্রতিরূপ, অংশত ব্যবহারিক জগতের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং ব্যবহারিক জগতের উপকরণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

ক্রোচের এই মত বিতর্কসংকুল এবং সহজবোধ্য নয়। কিন্তু মূল বক্তব্যের যে কতকগুলি উপসিদ্ধান্ত আছে তাহা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। অ্যারিষ্টটলের আমল হইতে প্রকাশের উপকরণকে আমরা প্রাধান্য দিয়াছি বলিয়া শিল্প-সমালোচনায় টেকনিকের চর্চা অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া আছে। কোন্ শিল্প কি ভাবপ্রকাশের উপযোগী, কোন্ শিল্পের বৈশিষ্ট্য কি, কোন্ শিল্পের শক্তির সীমা কোথায়—লেসিং প্রভৃতির সমালোচনায় এই সকল প্রশ্ন খুব বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। অনেক সময় টেকনিকের প্রতি অত্যধিক মনোযোগ দেওয়ার ফলে আমাদের রসবোধ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ক্রোচের নন্দনতত্ত্বের ফলশ্রুতি এই যে, টেকনিক শিল্পে তাহার যথাযোগ্য স্থান পাইয়াছে। তিনি মনে করেন যে, টেকনিক শিল্পের উপকরণাশ্রিত বহিঃপ্রকাশের ব্যাপার, ইহার মধ্যে বিশুদ্ধ শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে ব্যবহারিক বস্তুজগতের মিশ্রণ হইয়াছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে টেকনিক বিশুদ্ধ, অনন্যনির্ভর কবিপ্রতিভার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে; প্রভুর আসনে বসিয়া টেকনিক প্রতিভাকে নিয়ন্ত্রিত করিবে না। ক্রোচে যে একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিলে কথাটা আরও স্পষ্ট হইবে। ইউরোপীয় রঙ্গমঞ্চে প্রথমে বালকদের দ্বারা স্ত্রীভূমিকা অভিনীত হইত। 'ব্যাকরণ-বিভীষিকা' সত্ত্বেও ইহাদিগকে বলা যাইতে পারে 'বালক-অভিনেত্রী'। ক্রমে মেয়েরাই মেয়েদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে আরম্ভ করিল এবং ইহার ফলে নাটকের বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গিমায়ও খুব পরিবর্তন আসিয়া গেল। এই পরিবর্তন টেকনিকের ব্যাপার। ইহার সঙ্গে প্রতিভার সম্পর্ক গৌণ, পরোক্ষ। শেক্সপীয়রের নাটকের কথা স্মরণ করিলেই দেখা যাইবে প্রতিভা কেমন করিয়া টেকনিকের দ্বারা সীমিত না হইয়া তাহার উপর আধিপত্য বিস্তার করে। শেক্সপীয়রের আমলে মেয়েদের ভূমিকায় ছেলেরা নামিত; এই টেকনিকের শেক্সপীয়র যে সদ্ব্যবহার করিয়াছেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায় জুলিয়া, রোজালিণ্ড, ভায়ওলা, পোরশিয়া, ইমোজেন প্রভৃতি চরিত্রে এবং তাহাদের কাহিনীতে। কিন্তু এ. সি. ব্র্যাড্‌লী স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, শুধু যদি শেক্সপীয়রের নায়িকাদের নাম করা যায়—ক্যাথারিনা, বিয়াত্রিচি, হেলেনা, ইসাবেলা, ওফেলিয়া, ডেসডিমোনা, লেডি ম্যাক্‌বেথ, লীয়রের তিন কন্যা, পারডিটা, মিরাণ্ডা, ক্লিওপ্যাট্রা—তাহা হইলেই বোঝা যাইবে যে এই টেকনিক শেক্সপীয়রের প্রতিভার বাহন হইয়াছে,

তাহাকে ব্যাহত করিতে পারে নাই। ক্লিওপ্যাট্রার একটি উক্তির মধ্যেই শেক্সপীয়রের প্রতিভার এই বৈশিষ্ট্য মুদ্রিত হইয়াছে। সীজারের কাছে আত্মসমর্পণ করিলে তাহার যে চরম লাঞ্ছনা হইবে মৃত্যুপথযাত্রী ক্লিওপ্যাট্রা তাহার বর্ণনা দিয়াছে এইভাবে :

I shall see
some *squeaking* Cleopatra *boy* my greatness
I' the posture of a whore.

শিল্পের যে বহিঃপ্রকাশ হয় তাহার মধ্যে বাস্তবজীবনের উপাদান ও উপকরণ প্রবেশ করে এবং এই বহিঃপ্রকাশিত শিল্পের রীতিনীতি সম্পর্কে কতকগুলি নিয়ম ও সূত্র রচিত হইয়া থাকে। এই সকল সূত্র বা নিয়মের উপযোগিতা আছে, কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত বলিয়াই ইহারা দার্শনিক সূত্রের মতো চূড়ান্ত বা সর্বব্যাপী নয়; অভিজ্ঞতার পরিবর্তনের সঙ্গেই ইহাদের পরিধি সীমিত বা পরিবর্তিত হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ অ্যারিষ্টটলের Unities-এর কথা বলা যাইতে পারে। গ্রীক নাটকে স্থান ও কালকে সীমিত করার প্রয়োজন বা সার্থকতা ছিল। এই টেকনিককে সর্বব্যাপী করিতে যাইয়াই শিল্পী ও সমালোচকেরা নানা গোলযোগে পড়িয়াছেন। ক্রোচে এই জাতীয় টেকনিক বা আঙ্গিক-আশ্রিত নিয়মকানুনকে বলিয়াছেন pseudo-concepts বা মেকি সূত্র। টেকনিকের সংকীর্ণতা প্রমাণ করা ক্রোচের অন্যতম প্রধান অবদান।

এই সকল মেকি সূত্রের উপযোগিতা আছে, কিন্তু সে খুব সীমিত ক্ষেত্রে। অন্যান্য শিল্পের কথা বাদ দিয়া শুধু সাহিত্যের কথাই ধরা যাইতে পারে। উপায়, উপকরণ ও উদ্দেশ্যকে ভিত্তি করিয়া সাহিত্যের অনন্ত শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক শ্রেণী, উপশ্রেণী ও ইহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে এত সূত্র রচনা করা হইয়াছে, এত আইন জারি করা হইয়াছে যে তাহার কাছে নক্ষত্রপুঞ্জের অসংখ্যতাও হার মানিবে। পোলোনিয়াসের জবানীতে শেক্সপীয়র এই অর্থহীন, অনন্ত শ্রেণীবিভাগের উপর অবিস্মরণীয় বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়াছেন : 'tragedy, comedy, history, pastoral, pastoral-comical, historical-pastoral, tragical-historical, tragical-comical-historical-pastoral, scene individable, or poem unlimited...'। যে কোন সার্থক কাব্যই অনন্য ; নিজেই নিজের শ্রেণী এবং শ্রেণীর কোন সংজ্ঞাই খুব আলগাভাবেও সকল সাহিত্যকর্মের উপর প্রযোজ্য হইবে না। অ্যারিষ্টটল শ্রেণীবিভাগের উপর খুব জোর দিয়াছেন ; তাঁহার পোয়েটিক্স গ্রন্থের মূল বিষয় ট্র্যাজেডি। ট্র্যাজেডি দুঃখের গুরুগম্ভীর কাহিনী এবং তাহা বিয়োগান্ত হওয়া উচিত। অ্যারিষ্টটল ঈদিপাসের কাহিনীর ট্র্যাজিক তাৎপর্যের উপর খুব জোর দিয়াছেন এবং আমরা

নি:সন্দেহে মানিয়া লইতে পারি যে সফোক্লিসের ঈদিপাস নাটকদ্বয় বিষাদান্ত ও বিয়োগান্ত। কিন্তু তিনি ইউরিপিদিসের *Iphigenia in Tauris*-কেও ট্র্যাজেডি বলিয়াছেন, যদিও ইহা মিলনান্ত। কিন্তু ইহাকে কমেডি বলিয়া অ্যারিষ্টফেনিসের নাটকের সামিল করা কি সঙ্গত হইবে? বাংলাসাহিত্যে চন্দ্রগুপ্তকে কি বলিবেন? কমেডি? তাহা হইলে ইহা 'প্রায়শ্চিত্ত', 'ত্র্যহস্পর্শ' প্রভৃতির পর্যায়ে পড়িবে। আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যে *The Cherry Orchard, Mother Courage* ট্র্যাজেডি বলিয়া স্বীকৃত ও আদৃত হইয়াছে, কিন্তু শেখভ ও ব্রেখ্‌ট্‌ নিজ নিজ নাটককে কমেডি বলিয়াই মনে করিতেন।

বাস্তবিক পক্ষে, ক্রোচের মতে, ট্র্যাজিক, কমিক, উদাত্ত (sublime) প্রভৃতি মেকি ধারণা বা আধা-কন্‌সেপ্ট সম্পর্কে যত সন্তর্পণেই সংজ্ঞা রচনা করি না কেন, সেই সকল সংজ্ঞায় অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তি দোষ হইবেই। যত ব্যাপক সংজ্ঞাই করি না কেন কোন শ্রেষ্ঠ রচনাকেই তাহার দ্বারা উপলব্ধি করা যাইবে না এবং প্রত্যেক মৌলিক রচনার অভ্যাগমেই সেই সংজ্ঞার সংশোধন করিতে হইবে। ঈষৎ পরিহাসের সহিত ক্রোচে মন্তব্য করিয়াছেন, ট্র্যাজিক, কমিক প্রভৃতি হইল সেই সেই বস্তু, সংজ্ঞাকারীরা তাঁহাদের সংজ্ঞার দ্বারা যে-সকল বস্তুকে বুঝাইয়াছেন বা বুঝাইবেন। ইহার অর্থ এই যে, কংক্রীট শিল্পজগতে সংজ্ঞা অর্থহীন, কারণ রূপ সূত্র নহে।

চরিত্রের সংজ্ঞা সম্বন্ধেও সেই একই আপত্তি প্রযোজ্য। প্রত্যেক চরিত্রের মধ্যেই স্বীয় স্বীয় বৈশিষ্ট্যই প্রাধান্য পাইয়াছে, তাহাকে সূত্রের মধ্যে আনিতে চাহিলে, তাহার বৈশিষ্ট্য আচ্ছন্ন হইয়া যাইবে। অ্যারিষ্টটল নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, ট্র্যাজেডির নায়ক মোটামুটিভাবে ভাল মানুষ হইবে; রামচন্দ্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের দেশের আলংকারিকেরা মহাকাব্যের নায়ক ধীরোদাত্ত হইবে এইরূপ নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু ম্যাকবেথকে ভাল মানুষও বলা যায় না, ধীরোদাত্তও বলা যায় না, অ্যাকিলিসের মধ্যে উদাত্ততা থাকিলেও ধৈর্যগুণ আছে এমন কথা বলা যায় না। সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিত্র ডন্‌কুইক্সোটকে শ্রেণীবাচক কনসেপ্ট বা সূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কেহ বলেন, ডন্‌ কুইক্সোট বাস্তব সম্পর্কে অলীক ধারণার প্রতিরূপ, কেহ বলেন এই চরিত্রের মূলীভূত আইডিয়া গৌরবলাভের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু ক্রোচে বলেন, এই দুই আইডিয়ার প্রতিরূপ হিসাবে এমন অনেক লোকের কল্পনা করা যায় যাহারা ডন্‌ কুইক্সোট নয়, যাহাদের সঙ্গে ডন্‌ কুইক্সোটের কোন সাদৃশ্যই নাই। প্রকৃতপক্ষে, ডন্‌ কুইক্সোট একমাত্র ডন্‌ কুইক্সোট সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধি!

ফল কথা এই যে, কাব্য ও শিল্প ব্যক্তির রূপ সৃষ্টি করে, তাহার একমাত্র লক্ষণ individuality বা প্রাতিস্বিকতা, অনন্যত্ব। ইহার মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির অনুপ্রবেশ সম্ভব নয়, বাস্তবজগতের সঙ্গেও ইহার সম্পর্ক নাই। বুদ্ধির জগতের তর্ক বা সিদ্ধান্ত ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলে তাহাদের বৈশিষ্ট্য পরিত্যাগ করিয়া প্রাথমিক অনুভূতির মতো নিছক উপকরণ হিসাবেই প্রবেশ করিবে। বহির্জগতে প্রকাশের সময় বস্তুজগতের উপকরণ ও নিয়মশৃঙ্খলা ইহাকে খানিকটা আচ্ছন্ন করে, কিন্তু তাহার মধ্যে ইহার রূপসর্বস্ব অনন্যতা স্বে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিত।

৬.

ক্রোচের নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে আমাদের দেশের রসবাদ ও ধ্বনিবাদের সাদৃশ্য আছে এবং এই সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করিয়া অতুলচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার পরমাশ্চর্য গ্রন্থ 'কাব্য-জিজ্ঞাসা' রচনা করিয়াছেন। এই দুই মতবাদের মধ্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য দুইই আছে। এই সাদৃশ্য আর পার্থক্যের উল্লেখ করিয়া অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করিব।

ইহাদের মধ্যে প্রধান সাদৃশ্য সাহিত্য ও শিল্পের অন্যফলনিরপেক্ষতা ও রূপসর্বস্বতা। ক্রোচে যাহাকে বলিয়াছেন অভিব্যক্তি, আনন্দবর্ধন ও অভিনব গুপ্ত তাহারই নাম দিয়াছেন রসপ্রতীতি বা রসের আস্বাদ্যমানতা। উভয় মতবাদেই, কাব্য শাস্ত্র-ইতিহাসাদি হইতে পৃথক এবং ইহা অন্যফলনিরপেক্ষ। উভয় মতবাদেই, কবিপ্রতিভা চৈতন্যকে প্রত্যক্ষ করে, সুতরাং ইহা জ্ঞানাত্মিকা। অভিনব বলিয়াছেন, চৈতন্য যে সকল অবান্তর বস্তুতে আচ্ছন্ন থাকে, কবিপ্রতিভা তাহাদিগকে অপসারিত করিয়া চৈতন্যকে স্বস্বরূপে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করে। এইজন্যই রসোপলব্ধি ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর। ক্রোচে বলিয়াছেন, বুদ্ধি—যাহা শাস্ত্রাদি রচনা করে—এবং কর্মপ্রবৃত্তি—যাহা ব্যবহারিক জগতে ক্রিয়াশীল—ইহারা চৈতন্যকে অধিকার করিবার পূর্বে চৈতন্য যে বিশুদ্ধ রূপ সৃষ্টি করে বা দর্শন করে তাহাই অভিব্যক্তি বা আর্ট।

এই পৌর্বাপর্যের মধ্যেই এই দুই মতবাদের পার্থক্য সূচিত হইয়াছে। ক্রোচের মতে, রসপ্রতীতি থাকে চৈতন্যের প্রথম কক্ষ্যায়, প্রথমে চৈতন্য স্বীয় অনুভব, সংবেদন (sensation) প্রভৃতিকে স্বসংবিদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করে—এই প্রত্যক্ষীকরণের অপর নাম expression বা অভিব্যক্তি। ধ্বনিবাদীরা রসবিচার করিয়াছেন অর্থের মাধ্যমে। শব্দার্থের প্রথম কক্ষ্যায় অভিধা, অর্থাৎ শব্দের প্রাথমিক অর্থ, দ্বিতীয় কক্ষ্যায় থাকে তাৎপর্যবৃত্তি যাহা এক শব্দকে অন্য শব্দের সঙ্গে অন্বিত করে, তৃতীয় কক্ষ্যা হইল লক্ষণার অধিকার, সেখানে প্রাথমিক অর্থ বাধিত হওয়ায় অন্য এক অর্থের উদ্ভব হয়,

আর শেষ কক্ষ্যায় থাকে ব্যঞ্জনা যাহা রস ধ্বনিত করে। প্রথম তিনটিকে এক পর্যায়ে ফেলিয়া শব্দার্থের দুইটি শ্রেণী স্বীকার করা যাইতে পারে—অভিধা ও ব্যঞ্জনা। অভিধা শাস্ত্র-ইতিহাসাদি ও ব্যবহারিক জীবনের ভাষা, আর কাব্যের ভাষা ব্যঞ্জনা। অভিধাকে গৌণ করিয়াই ব্যঞ্জিত অর্থ আক্ষিপ্ত হয়, এই পরিভাষায় ক্রোচের মত হইবে যে, অভিধার অভ্যাগমের পূর্বেই ব্যঞ্জনার কার্য সমাপ্ত হইয়া যায় এবং ব্যঞ্জনাকে ভিত্তি করিয়া বুদ্ধি অভিধায় উপনীত হয়। আর ভারতীয় রসশাস্ত্রীরা বলেন, শাস্ত্র-ইতিহাসাদির অভিহিত অর্থের পরে কাব্যপ্রতীতির ব্যঙ্গ্য অর্থ প্রতিভাসিত হয়। ভারতীয় মতে ব্যঞ্জনার ভিত্তি অভিধা আর ক্রোচের মতে অভিধার ভিত্তি ব্যঞ্জনা।

অভিধা ও ব্যঞ্জনার মধ্যে কি সম্পর্ক, কেমন করিয়া অভিধা গৌণ হইয়া ব্যঙ্গ্য অর্থকে আক্ষিপ্ত করে তাহা ধ্বনিবাদীরা স্পষ্ট করেন নাই। আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন, অভিধা ব্যঞ্জনার ভিত্তিভূমি, ব্যঞ্জনালাভের উপায়; পদের অর্থের দ্বারা যেমন ব্যক্যের অর্থ পাওয়া যায়, দীপশিখার সাহায্যে যেমন আলোক পাওয়া যায়, তেমনি অভিধার মাধ্যমে ব্যঞ্জনায় উপনীত হওয়া যায়। ইহা উপমা সমাবেশ, যুক্তি নহে। শিষ্য অভিনব গুপ্ত এই সমস্যা এড়াইয়া গিয়াছেন। রসবাদের এই ত্রুটি মৌলিক। ভারতীয় অলংকার-শাস্ত্রের মূলে আছে রতি প্রভৃতি আট বা নয় ভাব, যাহারা রসত্বে নীত হয়। কিন্তু এই ভাবগুলি—রতি, হাস, উৎসাহ, ক্রোধ, জুগুপ্সা, ভয়, বিস্ময়, শোক, নির্বেদ—ইহারা কি প্রাথমিক অস্পষ্ট অনুভূতিমাত্র, না বুদ্ধিবৃত্তিসঞ্জাত আইডিয়াও বটে? ধ্বনিবাদীরা এই প্রশ্নের মধ্যে প্রবেশ করেন নাই বলিয়াই ব্যঞ্জনার মধ্যে অভিধার অংশ যাচাই করিতে পারেন নাই। এই দিক দিয়া ক্রোচে অনেক বেশি গভীর বিচারে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি প্রতীতি (ইন্‌টুইশন) ও বিচারবুদ্ধির মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য করিয়াছেন এবং প্রতীতির মধ্যে বিচারবুদ্ধির তর্ক ও সিদ্ধান্ত কেমন করিয়া মিশিয়া যায় তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

কিন্তু এই সূক্ষ্ম পার্থক্য করিতে যাইয়া ক্রোচে একটা সমস্যায় পড়িয়াছেন যাহার তিনি কোন সমাধান দিতে পারেন নাই। তাঁহার একটানা নিশ্ছিদ্র নন্দনতত্ত্বের ইহা প্রধান অপূর্ণতা। শিল্পের সৃষ্টি হয় শিল্পীর চেতনায়, একান্তব্যক্তিগত উপলব্ধিতে; অথচ এই যে প্রতীতি যাহার প্রধান বৈশিষ্ট্য রূপের অনন্যতা তাহার মধ্যে গৌড়জন আনন্দে পান করে সুধা নিরবধি। কেমন করিয়া ব্যক্তির প্রতীতি আপনার ব্যক্তিধর্ম রক্ষা করিয়াও নৈর্ব্যক্তিক সার্বভৌমতা লাভ করে ক্রোচে তাহার কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেন নাই। এই দিক দিয়া বিচার করিলে ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব সহজেই প্রমাণিত হয়। ভট্টনায়কের সাধারণীকৃতির উপর ভিত্তি করিয়া অভিনব গুপ্ত রসের যে দেশকাল-

অনালিঙ্গিত, সার্বভৌম, অ-লৌকিকত্বের ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহার তুলনা ইউরোপীয় নন্দনশাস্ত্রে কোথাও পাওয়া যায় না।

আনন্দবর্ধন-অভিনব গুপ্তের ও ক্রোচের আলোচনায় আর একটি সাদৃশ্য আছে যাহা উভয় মতবাদকে সমানভাবে দূষিত, সীমিত করিয়াছে। ধ্বনিবাদীরা মনে করেন যে শব্দ যখন অভিহিত অর্থকে গৌণ করিয়া অন্য একটি অর্থকে প্রতীয়মান করিল তখনই ধ্বনির কাজ শেষ হইল। দুইটি ধ্বনির মধ্যে বিষয়গত পার্থক্য থাকিতে পারে এবং সেই অনুসারে বস্তুধ্বনি, অলংকারধ্বনি বা রসধ্বনিতে তাহাদিগকে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা দুইটি ধ্বনিতে গুণগত পার্থক্যের নির্দেশ দিতে পারেন নাই। সেইজন্য ইঁহাদের মুখ্য কাজ হইয়াছে অগণিত ধ্বনিগণনা করা। এই অনন্ত বালুরাশির মধ্যে রসধারা নিঃশেষে শুকাইয়া গিয়াছে। ক্রোচেও একটি ইন্‌টুইশনের সঙ্গে আর একটি ইন্‌টুইশনের কোন গুণগত বৈষম্য দেখিতে পান নাই। সুতরাং তাঁহার কাছে একটি ছোট্ট লিরিকের দীর্ঘশ্বাস এবং ডিভাইনা কমেডিয়া ও কিং লীয়রের বিশ্ববোধ—ইহাদের মধ্যে প্রভেদ শুধু আয়তনের। ধ্বনিবাদীদের কাব্যবিচার গণনায় পর্যবসিত হইয়াছে আর ক্রোচে শুধু আয়তন নির্ধারণ ও পরিমাপ করিয়াছেন। উভয়ত্র এই জাতীয় বিশ্লেষণকে পণ্ডিতের পণ্ডশ্রম বলিয়া মনে হয়।

৭.

ক্রোচে আইডিয়ালিষ্ট বা ভাব 'দী দার্শনিক। তিনি চৈতন্যকেই একমাত্র সত্য বলিয়া মনে করেন এবং চৈতন্যের সর্বব্যাপিতা ও অচলকর্তৃত্বে বিশ্বাস করেন। কিন্তু তাঁহার দর্শনের মূল কথা হইল চৈতন্যলোকের বিভিন্ন অংশের সীমানির্দেশ, যাহাতে একে অপরের কক্ষ্যায় অনধিকার প্রবেশ করিতে না পারে। পূর্বেই বলিয়াছি, কেহ কেহ এই দর্শনের নাম দিয়াছেন the philosophy of distincts বা স্বতন্ত্রতাবাদ।

চৈতন্যের বিভিন্ন অংশের সীমারেখা নির্দেশই ক্রোচের নন্দনতত্ত্বের প্রধান কৃতিত্ব, কিন্তু ইহাই তাহার মতবাদকে সীমিত, সংকীর্ণ করিয়া দিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, কাব্যের মধ্যে দার্শনিক কথা অনেক থাকে বটে, কিন্তু তাহাদের দার্শনিকত্ব একেবারে মুছিয়া যায়। সার্থক কাব্যে দার্শনিক তত্ত্ব নিজের বৈশিষ্ট্যকে আচ্ছন্ন করিয়া রূপসৃষ্টির উপাদানরূপে দেখা দেয়। সেই অবস্থায় দর্শনের দার্শনিকত্ব লুপ্ত হইয়া যায়, কারণ সমগ্রের দ্বারাই অংশের গুণাগুণ নির্ণীত হয়। কিন্তু তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন, অংশ ও সমগ্র অন্যোন্যাশ্রিত, সমগ্রের দ্বারা যেমন অংশ নিয়ন্ত্রিত হয়, অংশের দ্বারাও তেমনি সমগ্র নিয়ন্ত্রিত হয়, কারণ অংশের বাহিরে সমগ্রের কোন অস্তিত্ব নাই। ক্রোচে মনে

করেন, শিল্প বিষয়বস্তুনিরপেক্ষ, রূপসর্বস্ব সৃষ্টি। সুতরাং দুইটি সৃষ্টির মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য হইতে পারে না, কারণ একই বিষয়ের উপর দুই সৃজনীপ্রতিভা নিয়োজিত হইলেই গুণগত তারতম্য হইতে পারিত, একটি রূপকল্প অপর একটি রূপকল্প হইতে তীব্রতর হইতে পারিত। কিন্তু তাহা হইলে, শিল্প দর্শনের অঙ্গ হইয়া পড়িত, কারণ দর্শনই অ্যাবষ্ট্রাক্ট গুণ ও দোষের বিচার করে (scientia qualitatum)। এইভাবে অগ্রসর হইয়া ক্রোচে এক স্ববিরোধী সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি এই বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন যে, শিল্পের বৈশিষ্ট্য form বা রূপে, বিষয়বস্তু সম্পর্কে সে উদাসীন। তারপর তিনি এই মতও প্রকাশ করিয়াছেন যে দুইটি শিল্পকর্মের প্রভেদ করা যাইবে শুধু ইন্‌টুইশনের ক্ষেত্রের বিস্তৃতির দ্বারা অর্থাৎ বিষয়বস্তুর জটিলতা ও আয়তনের পরিমাপের দ্বারা। এইভাবে বিষয়বস্তু একবার বর্জিত হইয়া আবার প্রাধান্য পাইয়াছে।

একই বিষয়বস্তুর সম্পর্কে যে একাধিক ইন্‌টুইশন রচিত হইতে পারে না, ইহা সত্য নহে। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী লইয়া বহু নাটক উপন্যাস রচিত হইয়াছে। শুধু এক প্রতিহিংসাগ্রহণ বিষয়কে আশ্রয় করিয়া এলিজাবেথের যুগে বহু নাটক লিখিত হইয়াছে। সত্য বটে কোন এক বিষয়ের একটি নাটকের সঙ্গে আর একটি নাটকের বহু পার্থক্য আছে, একই বিষয়ের দুইটি চিত্রে আসমান-জমিন প্রভেদ থাকে। এই প্রভেদ শুধু রূপের প্রভেদ নয়, বিষয়বস্তু, দার্শনিক চিন্তা ও রূপসৃষ্টির প্রভেদ। সবগুলি উপাদান মিলিয়া যে সমগ্র সৃষ্টি আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় তাহাই প্রতীতি বা ইন্‌টুইশন। ইহা রূপময়, রূপসর্বস্ব, কিন্তু নিরাশ্রয়, নিরালম্ব নহে। ইহা দার্শনিক বুদ্ধি ও অন্যান্য উপাদানের অপেক্ষা রাখিয়াই তাহাদের অসংখ্য বন্ধন মাঝেই মুক্তির আস্বাদ লাভ করে। এই অপেক্ষিত অনপেক্ষাই শিল্প ও সাহিত্যের প্রাণ। প্রসঙ্গান্তরে অভিনব গুপ্ত রসব্যাখ্যায় পানক রসের উপমা দিয়াছেন। সুস্বাদু পানীয়ের মধ্যে গুড়মরিচাদি নানা উপাদান থাকে, রসিক ব্যক্তি যখন পানীয়ের আস্বাদ করেন, তখন তিনি বিভিন্ন উপকরণের আস্বাদ পান, আবার সমগ্র পানীয়ের আস্বাদও পান।

কবির জীবনচরিত, কবির উপরে তাঁহার প্রতিবেশের প্রভাব—ব্যবহারিক জীবনের এইসব প্রসঙ্গ সম্পর্কেও অনুরূপ মন্তব্য প্রযোজ্য। সত্য বটে, কবির ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে তাঁহার কাব্যজীবনের সোজাসুজি কোন সম্পর্ক নাই, কবিরে পাব না তাহার জীবনচরিতে। কিন্তু বৈষ্ণবকাব্যে রাধার আদর্শায়িত, দেশকাল-অনালিঙ্গিত মূর্তির পরিপূর্ণ উপলব্ধি পাঁওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করিয়াছিলেন :

সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণবকবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহতাপিত।

দান্তের জীবনী তাঁহার কাব্যে প্রায় প্রত্যক্ষভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে আর শেক্সপীয়রের জীবনী যতটুকু জানি তাহার সঙ্গে তাঁহার রচনার প্রায় কোন সম্পর্কই নাই। দান্তের বাস্তবজীবনের বস্তু কাব্যের রূপকে প্রভাবিত করিয়াছে, কিন্তু যেখানে ইহা প্রায় সোজাসুজিভাবে প্রকাশ পাইয়াছে সেইখানেও ব্যবহারিক জীবনের সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করিয়া রূপলোকে অন্তরিত হইয়াই সে প্রকাশ পাইয়াছে। অপর পক্ষে শেক্সপীয়রের প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্র আপন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর হইলেও এবং তাঁহার ব্যবহারিক জীবনের ঘটনা ও ব্যক্তিত্ব তাঁহার রচনায় প্রত্যক্ষভাবে প্রতিফলিত না হইলেও সেই রচনার মধ্যে ভাবশরীরী কবিসত্তার পরিচয় পাওয়া যায়, সেই সত্তা ব্যবহারিক জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন নয়, যদিও ইহাদের সংযোগসেতু আমাদের কাছে খুব স্পষ্ট নয়।

ক্রোচে পুরাপুরি আইডিয়ালিষ্ট। তাই নন্দনতত্ত্বে তিনি প্রকাশের উপকরণকে একেবারে গৌণ করিয়া দেখিয়াছেন ; তাঁহার মতে শিল্পের পরিপূর্ণ রূপই চৈতন্যের মধ্যে প্রতিভাত হয়। গ্রীক্ কিংবদন্তীতে আছে যে দেবরাজ জিউসের শিরোদেশ হইতে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়াই এথেনা আবির্ভূত হইয়াছিলেন, আমাদের কিংবদন্তীতে আছে যে পরিপূর্ণযৌবনা উর্বশী সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন। শিল্পীর সৃষ্টি কিন্তু এত সরল নহে। বিশিষ্ট উপকরণ—শব্দ, অর্থ, রং, মৃত্তিকা, পাথর প্রভৃতি—অবলম্বন করিয়াই সে রূপ গ্রহণ করে। এই উপকরণ প্রয়োগের মধ্য দিয়া ধাপে ধাপে শিল্পরূপ গড়িয়া উঠে, একটি উপমা আর একটি উপমা আনয়ন করে, একটি চরিত্রের প্রভাবে আর একটি চরিত্র বিকশিত বা আচ্ছাদিত হয়, একটি সুর আর একটি সুর জাগাইয়া তোলে। নিজের মতের সমর্থনে ক্রোচে মাইকেল এঞ্জেলোর একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, 'শিল্পী হাত দিয়া চিত্র আঁকেন না, মস্তিষ্কের দ্বারা আঁকেন।' কিন্তু এই শিল্পীর সম্পর্কেই আর একটি উক্তিও প্রচলিত আছে যে তিনি পাথরের মধ্যেই মূর্তি দেখিতে পাইতেন এবং তিনি শুধু মূর্তিগুলি বাহির করিয়া আনিতেন। শিল্পীর উপকরণনির্ভরতাকে শিল্পপ্রতিভা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিয়াছেন বলিয়া ক্রোচে শিল্পের স্বরূপের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা খণ্ডিত বলিয়া মনে হয়।

বস্তুজগৎকে তুচ্ছ করিয়াছেন বলিয়া এবং শিল্পের রূপকে দার্শনিক বুদ্ধির বন্ধন হইতে

সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিতে চাহিয়াছেন বলিয়া ক্রোচের নন্দনতত্ত্বকে অভ্রান্ত ও সম্পূর্ণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু অন্য কোন নন্দনতাত্ত্বিক শিল্পের অনন্যতা, অনপেক্ষিতত্ব ও রূপসর্বস্বতার এমন যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে পারেন নাই এবং তিনি রসপ্রতীতিকে শ্রেণীবিভাগের ও টেকনিকের দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়াছেন। এই কৃতিত্ব তাঁহাকে নন্দনতত্ত্বে অমরত্ব দান করিবে।

লেখক-পরিচিতি

১. শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, এম. এ., পি. আর. এস., বাংলা সমালোচনাসাহিত্যে বিশেষ পরিচিত। তাঁহার গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র'।

২. ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, ইংরাজি সাহিত্যের প্রখ্যাত অধ্যাপক, ভারতীয় ও য়ুরোপীয় সাহিত্যতত্ত্বে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যসম্পন্ন, বাংলা সমালোচনাসাহিত্যে সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব।

৩. ডক্টর জগন্নাথ চক্রবর্তী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি সাহিত্যের রীডার, আধুনিক বাংলা কবিতায় একটি পরিচিত নাম। তাঁহার গবেষণামূলক ইংরাজি গ্রন্থের নাম : 'The Idea of Revenge in Shakespeare'।

৪ ডক্টর ভবতোষ দত্ত, সরকারী কলেজের (বর্তমানে কোচবিহার গভর্ণমেণ্ট কলেজে আছেন) বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক, বাংলা সাহিত্যসমালোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য 'ঈশ্বর গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব' (সম্পাদিত গ্রন্থ) 'চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র', 'কাব্যবাণী' ইত্যাদি।

৫. শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়, বিশ্বভারতীর বাংলা সাহিত্যের রীডার। তাঁহার সদ্য-প্রকাশিত গ্রন্থ 'সাহিত্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ' সুবেদিতা ও মননশীলতার সমন্বয়।

৬. ডক্টর রণেন্দ্রনাথ দেব, আগরতলা মহারাজা বীরবিক্রম কলেজের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক। 'বাংলা উপন্যাসের নব পর্যায়', 'বৈষ্ণব সাহিত্যের তিন দিক' এঁর রচিত দুখানি গ্রন্থ।

৭. ডক্টর ভবতোষ চট্টোপাধ্যায়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক। তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে আছে 'The Poetry of W. B. Yeats,' এবং 'John Keats : His Mind and Work'।

৮. শ্রীগোপাল হালদার, 'একদা', 'বাংলা সংস্কৃতির রূপান্তর' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক, ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার হিসাবে বাংলা সাহিত্যে সবিশেষ পরিচিত।